শ্রীবঙ্কু বিহারী ধর

সাধক, ভক্ত, উপাসক, সমাজ-
সংস্কারক প্রভৃতির জীবনী।

জীবন-চিত্র

(সাধক, ভক্ত, উপাসক, সমাজ-সংস্কারক
প্রভৃতির জীবনী)

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-সম্পাদিত
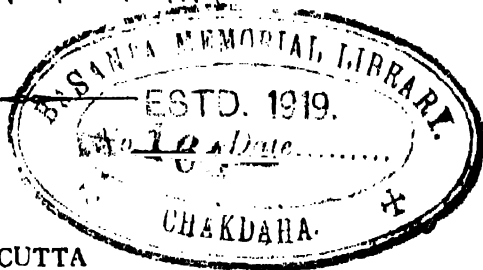
CALCUTTA
The Bengal Medical Library
201, CORNWALLIS STREET.
1913

 [মূল্য ১।০ আনা।

Calcutta

PUBLISHED BY BUNKU BEHARY DHUR

FROM THE "BOSUDHA AGENCY"

22, Fakir Chand Chackraburtty's Lane.

Printed by Abdul Goffur

"AT THE NEW BRITANNIA PRESS."

78, Amherst Street.

ILLUSTRATED BY SRIJUT PREO GOPAL DASS.

1913.

ভূমিকা

ভারত চিরদিন ধর্ম্মশাসনে সংযত। "ধর্ম্মময়", "ধর্ম্মধৃক্", "ধর্ম্ম শক্তি"—ভারতের এই তিনটী বিশেষণ, আমাদের গৌরবের জিনিষ।

ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন—ভারতে অনেকবার ধর্ম্ম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। যখনি এই অভিশপ্ত জাতি পরস্পর আত্মঘাতী হইবার উপক্রম করিয়াছে, আর্ত্তের করুণ ক্রন্দনে-ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত প্রলয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, বিধাতার বরে তখনি এক এক জন মহাপুরুষ ভারতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন! তাঁহাদের জন্ম মুহূর্ত্ত—ভারতে নিখিল জড় ও চেতনের ভাগ্যে অমানিশি শেষে অরুণকিরণালোকে শুভ জগতের সূচনা করিয়াছে। ভারত অবতার বাদীর দেশ, ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের অবতার—অসংখ্য, কেহ যুক্তির অবতার বুদ্ধ, কেহ ভক্তির অবতার চৈতন্য। ভারতবাসীকে দুঃখ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য—কেহ জ্ঞানের মার্গ, কেহ বৈরাগ্যের মার্গ, কেহ বা কর্ম্মের মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহাত্মার মহতী শিক্ষার ফলে, ভারতে—বৈরাগ্য কর্ম্মের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলের উপর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা—আর্য্যাবর্ত্তের নর নারী যুগে যুগে ইহার পরিচয় পাইয়াছে।

কিন্তু, ভারতে এখন সে ধর্ম্ম নাই, সে মানুষও নাই! যে ধর্ম্ম ভারতবাসীর সাধনার ধন, অন্তরের সামগ্রী, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের আশ্রয় ছিল, সে ধর্ম্ম আমাদের কাছে এখন "সখের জিনিষ"! ধর্ম্ম এখন—সভামণ্ডপে—বাগ্মীর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়; ধর্ম্ম এখন—অসনে বসনে পণ্যবীথিকায়; ধর্ম্ম নাই কেবল ধর্ম্মের স্বস্থানে—জীবনে, মর্ম্মে, প্রাণের অভ্যন্তরে!

এই আপদ্ধর্ম্মের বিষম যুগে—আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকাকে মনুষ্যত্বে পরিপুষ্ট করিতে হইলে আবার সেই আদর্শের প্রয়োজন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ধার্ম্মিকের মহাশিক্ষাময় চরিত কাহিনী আলোচনায় মনের সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা-বিদূরিত হয়। সেই ভরসায়—"জীবন-চিত্র" প্রকাশিত হইল।

আপন মহিমায় আপনি সমুন্নত, আপন স্বাবলম্বনে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া—যাঁহাদের পুণ্য জীবন সাধনার কনক কিরণে কমলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাঁহারা এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের আদর্শ ও নেতা, চরিত্র গরিমায় যাঁহারা আবহমানকাল ভগবৎ জ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন; যাঁহাদের বলীয়ান্ বিসর্জ্জন—জগৎবাসীকে অনুপ্রাণিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের অনন্য সাধারণ জীবন গাথা—এই ক্ষুদ্র জীবন চিত্রে একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের বৈচিত্র রক্ষার জন্য আমি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন

করিয়াছি। "জীবন চিত্রের" সমস্ত জীবনীই—উপন্যাস ছলে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ভিন্ন জীবনী রচিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার অনুরাগ, তিনি সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের চরিত কথা সাগ্রহে আমায় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

আশা করি এই সকল মহাপ্রাণের মহাদর্শ—ভারতবাসী নর নারীর জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে —এই কলুষময়ী কলিযুগে, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অতুল ব্রতশিক্ষা, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের অসীম কার্য্যপটুতা, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের লোকাতীত ইন্দ্রিয় জয়, স্বামী বিবেকানন্দের বিচিত্র ত্যাগ স্বীকার—আমাদের মত সংসারী জীবকে জীবনের কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিবে।

মাতৃভাষার সেবা যজ্ঞে—আমার অন্যতম উত্তর সাধক, সাহিত্যরথী অক্ষয় চন্দ্রের প্রিয় শিষ্য, ভূতপূর্ব্ব "বহুদর্শী" পত্রের সম্পাদক, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভকাব্যকণ্ঠবিশারদ—"জীবন-চিত্রের" অনেকগুলি আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং কাঁচরা পাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায় এম্ এ মহাশয়—"জীবন চিত্রের" সঙ্কলনে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। উপসংহারে—মাতৃভাষার এই তিন সাধকের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আলোচিত চরিতাবলীর প্রায় সমস্ত মহাপুরুষেরই হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে "জীবন-চিত্র" পাঠকগণের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইলে, আমি আমার সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য মহাত্মাদিগের জীবনী সঙ্কলন করিতে প্রয়াস পাইব।

অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা
বসুধা কার্য্যালয়
২২, ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন,
২০শে আশ্বিন, ১৩২০ সাল

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর
সম্পাদক

আলোচিত চরিতাবলীর সূচী

———

চিত্র সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

বুদ্ধদেব

জীবন-চিত্র

ধর্ম্মাবতার বুদ্ধদেব

(১)

মহাভারতের মহাযুদ্ধের অবসানে, ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হইল। আর্য্যবংশের গৌরব-রবি তখন অস্তাচলগামী, ক্ষত্রিয় বীরগণ কুরুক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আর্য্যবীর বিপন্নের আর্ত্তস্বর শুনিয়া বীরদম্ভে আর অগ্রসর হইল না! বিশ্ব বিজয়ী সৈন্যবৃন্দের জয়োল্লাস বিপক্ষের প্রাণে আর আতঙ্কের উদ্রেক করে না! চিতা নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের দীপ্ত গৌরব সমস্তই নিভিয়া গেল, নিবিড় অন্ধকারের মাঝে নিদারুণ অবসন্নতা আসিয়া দেখা দিল। বলদৃপ্ত আর্য্য সমাজ আপনার প্রভাব হারাইয়া বহুশতাব্দি ধরিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু এখনও আর্য্যাবর্ত্তের এখানে সেখানে দু'একটী ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইতেছিল। এইরূপ এক ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে ঐতিহাস প্রসিদ্ধ বিদেহ বংশীয় মহারাজ শিশু নাগের চতুর্থতম বংশধর "ভাতীয়" পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে, কপিলবস্তু নগরে, ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণের মতে, খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৫৫৮ অব্দে, বুদ্ধদেব ধরাতলে অবতীর্ণ হন।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, ক্ষত্রিয় শক্তিশূন্য আর্য্যসমাজ একরকম বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা থাকিলেও দেশ তখন এক রকম

অরাজক। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ তখন যজ্ঞের পুণ্যময় উদ্দেশ্য ভুলিয়া বৈদিক যজ্ঞ ক্ষেত্রকে "কসাইখানা" করিয়া তুলিয়াছিলেন! হত প্রাণীর স্বর্গ ঘোষণা করিয়া, হিংসাময়ী ধরণীর ধূলিকণা পশুরক্তে সিক্ত করিয়া, ব্রাহ্মণ তখন নূতন গঠনে নব ব্রহ্মাণ্ড গঠন করিতেছিলেন। ছিন্নকণ্ঠ অসহায় পশুর কঠোর আর্ত্তনাদে ভূলোক দ্যুলোক সপ্তলোক ভেদ করিয়া, গোলোক পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। নিরীহ প্রাণীর কাতর ক্রন্দনে দেবতার আসন টলিল, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগোপযোগী অবতার বুদ্ধদেব সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয় কুলে অবতীর্ণ হইলেন।

(২)

কপিলবস্তু নগরের শাসন কর্ত্তার নাম "শুদ্ধোদন", রাজা বড় পুণ্যাত্মা ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। অসীম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়াও এই কমলার বরপুত্রের প্রাণে একটুও শান্তি ছিল না। এ অশান্তির কারণ, রাজার সন্তান হয় নাই।

রাণীর নাম "মায়াদেবী", রাজা মহিষীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। মহিষী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন—এক দিব্য শ্বেতহস্তী যেন দন্তদ্বারা তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছে! স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার ভয় হইল, স্বপ্নের ফল জানিবার জন্য তখনি জ্যোতির্ব্বিদগণকে আহ্বান করা হইল। তাঁহারা গণনা করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! এ স্বপ্ন আপনার ভাবী শুভ সূচক, আপনি অচিরেই এক সার্ব্বভৌম পুত্ররত্ন লাভ করিবেন।"

জ্যোতিষীর কথায় রাজার চিন্তাদূর হইল।

স্বপ্ন সফল হইল। অল্পদিনের মধ্যেই রাণী গর্ভবতী হইলেন। রাজার আর আনন্দ ধরে না। নিরানন্দ নির্জীব রাজপুরী, হর্ষ পুলকে প্রাণময়ী হইয়া উঠিল। পৃথিবীর এক পুণ্য মুহূর্ত্তে, পৌষমাসে, পুষ্যাযুক্ত পৌর্ণমাসী তিথিতে, মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলেন। কিন্তু হায়! রাজার দুর্ভা-

ক্রমে—প্রসবান্তেই প্রসূতির প্রাণ বিয়োগ হইল। জন্মোৎসবের মঙ্গল শঙ্খধ্বনির সঙ্গে, শোকের ভীষণ কোলাহল মিশ্রিত হইল। রাজ্ঞীর অকাল মৃত্যুতে রাজা কাতব হইয়া পড়িলেন। কর্ত্তব্য দীক্ষিতা স্নেহময়ী ধাত্রী, সদ্যোজাত শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল।

পিতার কাছে "মা-মরা" ছেলের আদরটা কিছু বেশী মাত্রায় হইয়া থাকে। রাজা নব কুমারকে পাইয়া মহিষীর শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। বিমাতা গৌতমীর যত্নে, জ্যোতির্ম্ময় শিশু দিন দিন শশি-কলার মত বাড়িতে লাগিল

যথা সময়ে, হিমালয় বাসা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ অসিত, "সর্ব্বার্থ সিদ্ধি" নামে শিশুর নাম করণ করিলেন। যাইবার সময় এই দৈবজ্ঞ রাজাকে বলিয়া গেলেন,—"রাজন্! কুমারকে সাবধানে রাখিবেন, এই শিশুর অঙ্গে চতুষষ্ঠী লক্ষণ বর্ত্তমান, ইহার জন্ম—কোনও মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এ শিশু যৌবনে সন্ন্যাসী হইবে, জ্যোতির্ম্ময় রাজ মুকুটের প্রলোভনে ভুলিবে না। কিন্তু যদি ইহাকে সংসারী করিতে পারেন. এ শিশু ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট হইবে।" দৈবজ্ঞের কথায় রাজার চিন্তা বাড়িল।

পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। 'বিশ্বামিত্র' নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধার্থের বিদ্যারম্ভ হইল। গুরু বলিলেন, বল "অ", সিদ্ধার্থের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—"অনিত্যঃ সর্ব্ব সংসার স্কন্ধঃ।"

গুরু বলিলেন—বল "আ" ; সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন, "আত্মপর হিতঃ কার্য্যঃ।" পঞ্চম বর্ষীয় বালকের মুখে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বচন শুনিয়া গুরু তো অবাক্! তিনি এই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বালককে নূতন করিয়া আর কি 'বর্ণ-মালা' শিখাইবেন ? চৌষট্টি লিপিই শিশুর কণ্ঠস্থ। সিদ্ধার্থ গুরুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কত মাং ভো। উপাধ্যায়। লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি ?" সুতরাং ছাত্রের কাছে গুরুকে হার মানিতে

হইল। গুরুকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রাজকুমার রাজ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন

(৩)

ক্রমে সিদ্ধার্থের যৌবনকাল উপস্থিত হইল। রাজকুমারের সেই দীপ্তি গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্য বিকশিত হইয়া উঠিল। রাজা দেখিলেন—সিদ্ধার্থের সাংসারিক কোনও কার্য্যেই অনুরাগ নাই, রাজ-কার্য্য অপেক্ষা সিদ্ধার্থ ধর্ম্মকার্য্যই অধিক ভালবাসেন, প্রজাপালনের চেয়ে সাধু-সেবাতেই তাঁহার আনন্দ। রাজা পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্কল্প করিলেন—শীঘ্রই সিদ্ধার্থের বিবাহ দিতে হইবে। এ ঔদাসীন্য মহাব্যাধির মহৌষধ একমাত্র রমণীর প্রেম। রাজা পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন।

সিদ্ধার্থের যোগ্য পাত্রী মিলিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। রাজাজ্ঞায় কত রূপসী, অতুলনীয় রূপের ডালি সাজাইয়া, রাজকুমারকে উপহার দিতে আসিল। এই সকল বালিকার সঙ্গে, সিদ্ধার্থকে স্বামীরূপে পাই-বার জন্য দণ্ডপাণির কন্যা গোপাও আসিয়াছিল। গোপা অনিন্দ্য সুন্দরী, তাহার রমণীয় কলেবরে অলোকসামান্য কমনীয়তা ছিল। সেই স্বভাব সরলা কুসুমকোমলা গোপাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থের মন মুগ্ধ হইল। সিদ্ধার্থের শক্তিসামর্থ্যে সমুজ্জ্বল সুকুমার মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া, গোপার নির্ম্মল নারী-হৃদয়ও—পূর্ণচন্দ্র দর্শনে সিন্ধুর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রণয়ের পূর্ব্বরাগেই "দুঁহু হৃদি এক ভৈঁ গেল।" বিকশিত যৌবনে, গোপার সেই দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টি— সিদ্ধার্থকে প্রেম-পাশে বাঁধিয়া ফেলিল। সিদ্ধার্থ গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন।

রাজা রত্নাগার শূন্য করিয়া লতাবিতান শোভী প্রমোদ বনে, নব-দম্পতীর বাসের জন্য বিহার ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অনাসক্ত সিদ্ধার্থকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য শত শত সুন্দরী বিলাসিনী

যুবতী কনক চম্পক দাম গৌরী গোপার সঙ্গে রাজকুমারের সেবায় নিযুক্ত হইল। সেই মধুরানিল-বীজিত কুসুমিত উপবনে, নৃত্য বিশারদা তরুণী-কুলের চরণ মঞ্জিরের মঞ্জু নিঃস্বনে মুখরিত, মর্ম্মর-রচিত সুধা ধবল বিহার ভবনে, দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন মান অভিমানে, রমণীর সোহাগ আদরে —সিদ্ধার্থের জীবন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। কখনো কুসুম সুষুমা কুল বকুল কুঞ্জে বসিয়া, কখনো বসন্তের ছায়ালোক বিচিত্র গোধুলির বেলায় কমল-হাসিনী সরসীর সঙ্গে স্বপ্নালস সমীরণের ক্রীড়া দেখিয়া, কখনওবা অপ্সরী সদৃশা গায়িকাকুলের সুতন্ত্রী মধুর সঙ্গীত শুনিয়া, সিদ্ধার্থ নিত্য নূতন প্রেমলীলা অভিনয় করিতে লাগিলেন। রাজা শুদ্ধোধন আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু রসনাপ্রিয় মধুর রসেও পরিতৃপ্তি দোষ আছে। অধিক মিষ্ট খাইলে "মুখ মরিয়া" যায়। "একঘেয়ে' জীবন অনেক সময়ই বিরক্তি-কর। বিলাস-তৃপ্ত সিদ্ধার্থের মনে নগরভ্রমণের বাসনা জাগিল। গৃহ-কোণবাসী পুত্রের নগর-ভ্রমণের আকুলতা দেখিয়া, রাজা সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্থির হইল পরদিন কুমার নগরভ্রমণে বহির্গত হইবেন। যুবরাজ দর্শনের ভবিষ্যৎ আশায় নগরবাসী নরনারী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহদ্বার পল্লব-কুসুমহারে শোভিত হইল। জলধারাসিক্ত রাজ-পথে "দীপবৃক্ষ" প্রোথিত হইল। হর্ম্ম্যাবলীর শীর্ষদেশে পীতবর্ণের পতাকা উড়িল। ভাস্কর নৈপুণ্যের আদর্শ তোরণ স্তম্ভে—রম্ভাতরু ও জলপূর্ণ ঘট স্থাপিত হইল। নগরবাসীগণ নগরসজ্জার ত্রুটী করিল না।

উষালোক প্রদীপ্ত শোভনসুন্দর প্রভাতে, সারথি ছন্দকের সঙ্গে, সিদ্ধার্থ নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কপিলবস্তু সেদিন দ্বিতীয় অলকা-পুরী। সিদ্ধার্থ যে যে পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, দেখিলেন—সর্ব্বত্রই নয়নরঞ্জন সুন্দর দৃশ্য, সর্ব্বত্রই সুখস্বাচ্ছন্দের নির্ম্মল চিত্র বিচিত্রিত। বধূ

নাট্যশালা হইতে উত্থিত নারীকণ্ঠের বন্দনাগীতি সিদ্ধার্থকে সম্বর্দ্ধনা করিল। প্রজাগণের প্রফুল্ল মুখ—রাজকুমারের কাছে নন্দনের ছবি আঁকিয়া দিল। বড় আশায়, বড় আনন্দে, সিদ্ধার্থ তাঁহার ভ্রমণ শেষ করিলেন।

অপরাহ্ন উত্তীর্ণ প্রায় দেখিয়া কুমারের আদেশে ছন্দক গৃহাভিমুখে রথের গতি ফিরাইল। ঠিক্ সেই সময়ে, স্তব্ধ সান্ধ্য প্রকৃতির ক্রোড়ে, সংসার তাড়নায় মর্ম্মাহত এক জরাজীর্ণ কুৎসিৎ মূর্ত্তি সিদ্ধার্থের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই দন্তহীন, লোলচর্ম্ম পলিত কেশ পরলোকের যাত্রী, করধৃত দণ্ডের উপর দেহভার অতিকষ্টে রক্ষা করিয়া, একমুষ্টি উচ্ছিষ্টের আশায় দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া হতাশপ্রাণে অবসন্ন দেহে রাজকুমারের কাছে ভিক্ষার আশায় আসিয়াছিল। বৃদ্ধের সেই বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থ ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সারথি! এ ব্যক্তি কে?"

ছন্দক বলিল,—"প্রভো! এ একজন বৃদ্ধ

সিদ্ধার্থ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক! ইহার এ দশা কেন?

ছন্দক বলিল—"জরা রাক্ষসী ইহার এ দশা করিয়াছে, এ হতভাগ্য বার্দ্ধক্যে চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে, তাহাই ভিক্ষা ইহার উপজীবিকা।'

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "জরা ইহাকে কেন আক্রমণ করিল?"

ছন্দক কহিল,—"শুধু ইহাকে কেন, প্রাণীমাত্রকেই জরা আক্রমণ করিয়া থাকে।"

সিদ্ধার্থ কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকেও কি তবে জরা আক্রমণ করিবে? জরার কবলে পড়িয়া আমার আনন্দময়ী গোপাও কি এইরূপ বিরূপা হইবে?"

ছন্দক উত্তর করিল—"হাঁ প্রভো! জরার আক্রমণ হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই।"

মানব দেহের পরিণাম ভাবিয়া সিদ্ধার্থ শিহরিয়া উঠিলেন! বৃদ্ধ ভিক্ষা পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল; সেকথা সিদ্ধার্থ

শুনিতেও পাইলেন না ; তিনি তখন একমনে মানবের ভবিষ্যৎ ভাবিতে-ছিলেন।

অল্পদূর গিয়াই সিদ্ধার্থ আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। সে একজন যুবা, কিন্তু ব্যাধি যন্ত্রণায় তাহার রক্তহীন শ্যামবর্ণ মুখ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কি ভীষণ মূর্ত্তি, অক্ষি কোটরগত, অস্থি চর্ম্মসার দেহ নীলবর্ণের শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, হস্তপদ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল, ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসে পঞ্জরতটে মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতেছিল, হতভাগ্যের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া মর্ম্ম শোণিতের মত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিয়া, সিদ্ধার্থের প্রাণ সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। তিনি ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছন্দক ! এ কে ? দেখিতেছি যুবা, কিন্তু ইহার এমন দুর্দ্দশা কেন ?"

ছন্দক বলিল, "কুমার ! এ ব্যক্তি রোগী, দারুণ ব্যাধি ইহাকে যৌবনেই বৃদ্ধ সাজাইয়াছে। ব্যাধি—জীবদেহের সকল সৌন্দর্য্যই অপহরণ করে।"

সিদ্ধার্থ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে ব্যাধি যন্ত্রণায় মানবদেহ এমন বিকৃত হইয়া যায়, ছন্দক ! সে ব্যাধি কি আমায়ও আক্রমণ করিতে পারে ?"

ছন্দক বলিল, "দেহ মাত্রই রোগের আশ্রয়স্থান, রোগ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে।"

আজন্ম সুখী সিদ্ধার্থ ব্যাধির বিকট আদর্শ দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল—জরার আক্রমণে, ব্যাধির তাড়নায়, মানব যখন এমন শ্রীহীন হয়, তখন সংসারে সুখ কোথায় ? চিন্তাকুল চিত্তে সিদ্ধার্থ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সহসা একদিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। সিদ্ধার্থ দেখিলেন—বস্ত্রাবৃত কোন পদার্থ স্কন্ধে করিয়া চারি ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দিকেই আসিতেছে। নিকটে আসিলে, সিদ্ধার্থ ছন্দককে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছন্দক! ইহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ও কি পদার্থ লইয়া যাইতেছে?"

ছন্দক উত্তর করিল—"প্রভো ইহারা শবদেহ স্কন্ধে লইয়া যাই-তেছে। মৃতব্যক্তি ইহাদের আত্মীয়, তাই তাহার শোকে ইহারা কাঁদিতেছে।

সিদ্ধার্থ বলিলেন,—"শব দেহ কি? ছন্দক কহিল,—"প্রাণ শূন্য জীব দেহকে শব বলে। শবের চৈতন্য থাকে না, কামনাও থাকে না। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে—তাই উহার আত্মীয়গণ উহাকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিতে লইয়া যাইতেছে।"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই মৃত্যু কি সকলেরই হয়?"

ছন্দক বলিল,—"হাঁ প্রভু! দেহী মাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য। মৃত্যুকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।"

সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন,—"মানব জীবন যদি এমন ক্ষণভঙ্গুর, তবে এ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন কেন? কেন জীব দুই দিনের জন্য আসিয়া এমন নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়?"

সিদ্ধার্থের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই স্বভাব সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখ, প্রলয়-সহচর অন্ধকার আসিয়া গ্রাস করিল! এমন সময় সিদ্ধার্থ দেখিতে পাইলেন—পথি পার্শ্বে—এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। সিদ্ধার্থ সেই দেবতুল্য রূপ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক! ইনি কে?"

ছন্দক বলিল—"প্রভো! ইনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী ব্রহ্মানিষ্ঠ সন্ন্যাসী। সংসার অসার জ্ঞানে—ইনি গৃহ ছাড়িয়া এই পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার রূপগর্ব্ব নাই,—মস্তকে সুদীর্ঘ জটা, অঙ্গে ভস্ম বিভূষিত, পরিধানে গৈরিক বসন। ইহার বিলাস নাই, বাসনা নাই, ইনি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল কণাতেই পরিতৃপ্ত। প্রলোভন জয় করিয়া ইনি

মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছেন।" সিদ্ধার্থের ভক্তি হইল, তিনি সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া ছন্দককে বলিলেন,—"ছন্দক! এতদিনে আমার জীবনের পথ দেখিতে পাইলাম! মানব জীবনের উদ্দেশ্য—আত্মহিত ও পরহিত সাধন করা, হায়!—মানুষ কেন সন্ন্যাসী হয় না—

সিদ্ধার্থ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বাস্তবের উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার কামনাময় ইন্দ্রধনু জন্মের মত মুছিয়া গেল! সিদ্ধার্থ অতিকষ্টে বিহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। পরিপূর্ণ যৌবন ভার লইয়া প্রেমময়ী গোপা—তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সিদ্ধার্থ সেই উৎকণ্ঠিতা তরুণীর প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না; নীরবে গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর ভাব দেখিয়া, যুবতীর সেই বুভুক্ষিত ক্ষুদ্র বুকখানিতে, [illegible] অভিমানের উদয় হইল। বিহার ভবনে সে নিশিতে আর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ফুটিল না; গোপা জানিত না, নগর-ভ্রমণে গিয়া, জরাব্যাধি মৃত্যু সঙ্কুল সংসারের জীবন্ত চিত্র দেখিয়া, তাহার স্বামীর কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দম্পতীর উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হৃদয়ের মধ্যস্থলে, স্বর্গমর্ত্তের মধ্যে রহস্যময় ছায়াপথের মত—কি একটা নূতন জিনিষ সহসা আত্ম প্রকাশ করিয়াছে!

(৪)

সিদ্ধার্থ সর্ব্বদাই অন্য মনস্ক, তাঁহার মন শূন্যতায় ভরিয়া গিয়াছিল, তিনি জীবন পথে অগ্রসর হইবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। এই সময়ে —গোপা এক পুত্ররত্ন প্রসব করিল। সিদ্ধার্থ বুঝিলেন বন্ধনের উপর সুদৃঢ় বন্ধন পড়িতেছে। আর সংসারে থাকা উচিৎ নয়।

গভীর নিশীথে—পুরবাসীগণ যখন সকলেই নিদ্রাগত—সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় একবার গোপাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। সেই শতস্মৃতি জড়িত শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া

সিদ্ধার্থ দেখিলেন—কারু কার্য্য খচিত গজদন্তের পালঙ্কে—তাঁহারি স্পর্শ-পূত কোমল শয্যায় গোপা নিদ্রিতা, পার্শ্বে প্রফুল্ল কহ্লার কুসুমের মত তাঁহারি ঔরসজাত ক্ষুদ্র শিশুটী শুইয়া রহিয়াছে! প্রজ্বলিত দীপালোকে—সিদ্ধার্থ প্রাণ ভরিয়া সেই "সুষমার কোলে সুষমা" দেখিতে লাগিলেন, সেই গভীর হৃদয়ব্যাপী প্রেম—মুহূর্ত্তের তরে একবার সজাগ হইয়া উঠিল! তখনি বিবেক আসিয়া বলিয়া দিল—"প্রেমের পিপাসা—মরীচিকার নিষ্ঠুর ছলনায় বিড়ম্বিত!" অপরাধীর মত নতমুখে সিদ্ধার্থ একবার ভাবিলেন, তারপর হৃদয়ের সমস্ত বল একত্র করিয়া, সেই নিদ্রালস নব যুবতী পত্নী, অভিনব আনন্দময় ঔরসজাত পুত্র, অতুলনীয় রাজ্য সুখ, ধূলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিলেন।

(৫)

রাত্রি শেষে—এক ভীষণ কুস্বপ্ন দেখিয়া, গোপা জাগিয়া উঠিল, গোপার আর্ত্তনাদে সহচরীগণও শয্যাত্যাগ করিল। গোপা বলিল—"একবার আর্য্যপুত্রকে ডাকিয়া আন"। প্রতি কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল—সিদ্ধার্থকে পাওয়া গেল না। তখনি রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তখনও প্রভাত হয় নাই। নিদ্রাতুর নয়নে ব্যাকুল পুরবাসীগণ চারিদিকে রাজ পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, গ্রাম বাসীরাও ছুটিয়া আসিল। রাজ বাড়ীতে হাহাকার উঠিল। রাজা বুঝিলেন—সিদ্ধার্থকে আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবনের সার্থক সাধন—প্রলোভনকে জন্মের মত জয় করিয়াছে,—হৃদয়ের শোণিত ধারা ঢালিলেও আর সে ফিরিয়া আসিবে না।

(৬)

এদিকে সিদ্ধার্থ অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া বৈশালী নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি জগতে চিরশান্তির উৎস অনুসন্ধান করিতেছিলেন

যৌবনে—বার্দ্ধক্যের ভয়, রূপে—ব্যাধি ভয়, দেহে যম ভয়, মৃত্যুতে পুনর্জ্জন্মের ভয় ; মানব জীবন ইন্দ্রিয় বহ্নির ইন্ধন. জগতে শান্তি কোথায় ? কিন্তু এই অনিত্য সংসারে নিত্য পদার্থ কি কিছুই নাই ; দেহপণ করিলে কি প্রকৃত শান্তি পাইব না ?—সিদ্ধার্থ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রথমে শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। সিদ্ধার্থ—বেদজ্ঞ উদর্ক ও অলর্কের কাছে বেদ শিক্ষা করিলেন, অড়ার পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু কৈ ? তাঁহার পিপাসা তো মিটিল না, আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি হইল না। অতৃপ্ত হৃদয়ে, সিদ্ধার্থ রাজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজগৃহের সন্নিহিত কোনও তপোবনে রুদ্রক ঋষির আশ্রম ছিল। সিদ্ধার্থ রুদ্রকের শিষ্য হইলেন। সেখানে যোগ শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়া উরুবিল্ব গ্রামে গিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়—কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চ সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। পঞ্চ শিষ্য সহ সিদ্ধার্থ গয়াধামে উপস্থিত হইলেন।

পবিত্র গয়াধামে এক বিশাল বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধার্থ মহাধ্যানে নিমগ্ন। শিষ্যগণ বীরাসনিস্থ গুরুদেবের সেই ঋজু আয়ত স্পন্দ রহিত দেহ রক্ষা করিতেছিল। এই ভাবে ষষ্ঠবর্ষ অতীত হইল, তবুও তাঁহার চৈতন্য হইল না। দূর দূরান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী সেই সমাধিমগ্ন মহাপুরুষকে দেখিতে আসিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল কি অপূর্ব্ব তাপস মূর্ত্তি! ফুল্ল রাজীব রক্ত পাণি যুগল অঙ্কোপরি উত্তান ভাবে স্থাপিত, ভ্রূভঙ্গ রহিত নিশ্চল, চক্ষু নাসাগ্রে নিবিষ্ট ; সে দেহে জীবনের চিহ্ন ও ছিল না। সে মূর্ত্তি যেন বৃষ্টি ক্ষোভ রহিত জলধর কিম্বা তরঙ্গ ভঙ্গহীন মহাসাগর।

সিদ্ধার্থের এই সমাধি অবস্থার সাদৃশ্য কুমারসম্ভবে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগমগ্ন মহাপুরুষ দেখিলে, মদন তাঁহাকে বেগ দিতে ছাড়ে না। মার (মদন) সিদ্ধার্থের তপোবিঘ্ন করিবার জন্য মায়াকন্যাগণের সঙ্গে

পরামর্শ করিল। হাব, ভাব, প্রলোভন, সম্মোহন, বশীকরণ একে একে সমস্ত অস্ত্রই পরিত্যাগ করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সে অপূর্ব্ব সংগ্রামে মারের সকল শক্তি সিদ্ধার্থের মহাশক্তির কাছে অপদস্থ হইল। সিদ্ধার্থের উপর লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি শতগুণে বাড়িল।

ছয় বৎসর পরে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ হইল। অনাহারে তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে একদিন নদীতীরে বেড়াইতে গিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। সেই সময় সুজাতা নাম্নী কোনও দয়াবতী মহিলা সিদ্ধার্থের শুশ্রূষা করেন; সুজাতাপ্রদত্ত পায়স ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধার্থ সুস্থ হ'ন।

একমাত্র মনের বলে রাজকুমারের সেই সুখলালিত কোমল অঙ্গে সকল তপঃক্লেশই অনায়াসে সহিয়াছিল। অযাচিত জল ও চন্দ্ররশ্মি পান করিয়া সিদ্ধার্থ আবার সমাধিমগ্ন হইলেন। এইবার তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইল। তাঁহার সমস্ত বাসনা নির্ব্বাণ লাভ করিল, সিদ্ধার্থ মুক্তির পথ দেখিতে পাইলেন। আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া, বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার ষষ্ঠী সংখ্যক শিষ্য জুটিল, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ—শিষ্যসহ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে—দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভারতবাসী কঠোর শাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল,—ঠিক সেই সময় তাহাদের শ্রবণবিবরে সিদ্ধার্থের অমূল্য উপদেশ প্রবেশ করিল। সিদ্ধার্থের নব ধর্ম্ম—বেদপন্থার অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া দিয়া জগৎবাসী নরনারীকে মুক্তির প্রলোভনে আপনার কোলে তুলিয়া লইল। বুদ্ধদেব সকলকেই বুঝাইলেন—"ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, প্রাণশূন্য। প্রাতঃস্নান করিয়া, মন্ত্র পড়িয়া, বেদী সাজাইয়া, পশু বলি দিয়া, মানুষের ধর্ম্মযাজনা হয় না। ধর্ম্ম—আর্থোৎকর্ষসাধনে, ধর্ম্ম—দয়াবৃত্তির পরিচালনে, সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সংবাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবনধারণ, সৎ

চেষ্টা, সংস্মৃতি, সম্যক সমাধি, এই অষ্টবিধ উপায়েই মানব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে।"

তখন ভারতের নগরে নগরে, গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইল—"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ নবীন উৎসাহে আর্য্যধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মীগণ দেশে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—""বেদ অভ্রান্ত নয়, অনাদিও নয়। দেবদেবীর উপাসনায় মুক্তিলাভ হয় না। ঈশ্বর স্বয়ং কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। ধর্ম্ম—পরোপকারে, ধর্ম্ম—অহিংসায়।"

এই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যহ শত সহস্র নরনারী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই বুদ্ধদেবের শরণাগত হইল। প্রবল পরাক্রম ভূপতিগণকেও বুদ্ধদেব স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধ হইলেন, প্রজারা রাজদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। বুদ্ধশিষ্যগণ সমস্ত জগৎকে শূন্য পদার্থে পরিণত করিলেন। ভারতে জাতিবিচার তিরোহিত হইল।

এইবার বুদ্ধদেবের পিতৃদর্শন করিবার ইচ্ছা হইল। বহুকাল পরে, বুদ্ধদেব শৈশব স্বপ্ন জড়িত জন্মভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিদ্ধার্থের আগমন সংবাদ পাইয়া নগরে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল।

সন্ন্যাসীবেশে বুদ্ধদেব পুরিপ্রবেশ করিলেন। পুত্রমুখ দর্শনে শুদ্ধোদনের পূর্ব্বশোক উথলিয়া উঠিল। গোপা ছিন্নমুখ লতিকার ন্যায় পতির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। সিদ্ধার্থ—সহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"গোপা! আর কাঁদিও না, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আমার জীবনের মহাব্রতে তুমি কি সহায় হইবে না?"

স্বামীর আজ্ঞায় গোপা সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। কোমল শিরীষ কুসুমে পত্তত্রীর পদ সংস্পৃষ্ট হইল। গোপা—নিজহস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ

কলাপে জটা রচনা করিয়া, বিশীর্ণ বাহুপ্রকোষ্ঠে অক্ষসূত্র বাঁধিলেন। তৃণময় কাঞ্চী, রত্ন মেখলার স্থান অধিকার করিল। গোপা বসন ছাড়িয়া বল্কল ধারণ করিলেন।

সিদ্ধার্থের সপ্তমবর্ষীয় পুত্রও পিতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এই সময় ভগ্নস্বাস্থ্য শুদ্ধোদন প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরবাসিনী রমণীগণ সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিল। এই সকল রমণী লইয়া বুদ্ধদেব স্ত্রী ভিক্ষুণীর দল গঠিত করিলেন। গোপা এই নারীদলের নেত্রী হইলেন।

পঞ্চ-চত্বারিংশ বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এইবার তিনি বুঝিলেন—তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। সিদ্ধার্থ কুশীনগরে গমন করিয়া সমস্ত শিষ্যকে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎসগণ! আমার আসন্ন কাল উপস্থিত। আমার মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ও নিয়ম যেন তোমাদের নেতা হয়।

এ জগতে ইহাই তাঁহার শেষ উপদেশ। কুশী নগরেই, সেই আদর্শ ব্রহ্মচারী, মানবের ক্ষুদ্র অহমিকা মনুষ্যত্বে পরিপুষ্ট করিয়া, ভক্তগণের অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

বুদ্ধদেব ভারতের গৌরব, ভারতের শিক্ষক। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী এখনও ভারতের নগরে, কাব্যে, পুরাণে, ইতিহাসে, তাম্রফলকে, শিলা লিপিতে, বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য

[শঙ্করের জীবনী, সময় নিরূপণ, তদীয় ধর্ম্মমত ও উপদেশ]

সে অনেক দিনের কথা। বেদ পন্থার বিরোধী উদার সাম্য "বৌদ্ধ ধর্ম্ম"—তখন বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

সিদ্ধার্থ গৌতম তাঁহার মহাসাধনার শীলধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, তাই জ্ঞানজ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তির মূল শিথিল হইয়াছিল, এতদিনে সেই সুদারুণ কঠোরতার ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল! সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা বেশ্যা, "বধূ"—সম্মান পাইয়া অবগুণ্ঠণবতী অন্তঃপুরচারিণী সাজিয়া ব্রাহ্মণীর মত সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইলেন! সামান্য প্রজা হইতে মহারাজা পর্য্যন্ত, সকলেই বিলাসে মগ্ন! রাজা মন্ত্রীর উপর রাজ কার্য্যের ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে অন্তঃপুরের কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। অপমানের ভয়ে, মনঃপীড়ায়, আত্মগোপনের ছলে, অনেকেই "মাথা মুড়াইয়া" শ্রমণ সাজিতে লাগিল। মধুমাসে মধুসখার প্রতাপে, দক্ষিণ পবনে, বকুল সৌরভে, কুলবধূর বহুযত্নে পোষিত মান শিথিল হইয়া পড়িল; কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ আলস্যপরতন্ত্র হইয়া তরুণী ও বারুণীর সেবায় আত্ম-সমর্পণ করিল! ঘরে ঘরে নৃত্যগীত আর "মদনোৎসব"। স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী, প্রাসাদের প্রমোদবনে—রক্তাশোক

তরুমূলে পুষ্প-চন্দন দানে কুসুমায়ুধের পূজা করিতে শিখিলেন।* বৈরাগ্যের প্রভাবে নরনারীর মনোবৃত্তি অনেকটা চাপা ছিল, চরিত্রের সে দৃঢ়তা বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া গেল। সংস্কৃত নাটক আদিরস প্রধান হইয়া উঠিল। বৌদ্ধপন্থার "সংযম শিক্ষা" যথেচ্ছাচারে পরিণত হইল। প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতায়—স্বপুচরিতার্থ প্রবৃত্তিকে সকলেই উপাসনা করিতে লাগিল। মানুষ, অন্তরে বাহিরে এতদূর দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিল, যে কাহারো কুল রহিল না, শীল রহিল না; বৌদ্ধ কাপালিকের নির্ভীক কপটাচারে দেশ কাঁপিতে লাগিল! প্রতিগৃহের প্রাঙ্গণ হইতে সরলা কুলনারীর মর্ম্মভেদী অভিশাপ আর নিরীহ গৃহস্থের বুক-ফাটা হাহা-কার উত্থিত হইয়া নাস্তিকতারূপ মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানিত না। প্রথমে এই ঘটনা লইয়াই ব্রাহ্মণ-সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পর, যখন ব্রাহ্মণেরা শুনিলেন—যে শূদ্রকে তাঁহারা শাস্ত্রে অনধিকারী জ্ঞান করিতেন—সেই শূদ্র-সমাজে বৌদ্ধগণ অবলীলাক্রমে পবিত্র শাস্ত্র প্রচার করিতে বসিল, তখন তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। সযত্ন-রচিত দুর্গম-শাস্ত্র দুর্গ মধ্যে শূদ্র-সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণ সমাজ মর্ম্মাহত হইল। ভারতব্যাপী সমাজ বিপ্লবের ইহাই প্রথম সূত্রপাত।

ঘোরতর পরিশ্রমের পর, প্রাণী মাত্রেই যেমন কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া লয়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে, কিছুদিন মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, আর্য্য সমাজও তেমনি নবশক্তি সঞ্চয় করিল। কুমারিল ভট্ট প্রমুখ নৈয়ায়িক, দার্শনিক, মীমাংসক পণ্ডিতগণের প্রবল উদ্যমে, হিন্দুধর্ম্ম আবার নূতন বেশে সাজিয়া, বহু বৌদ্ধচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া মাথা তুলিবার উপক্রম করিল।

---

* "রত্নাবলী" ও "মৃচ্ছকটিক"—সে সময়ের সমাজ চিত্র।

ভারতবাসী তখন বিষম বিব্রত। একদিকে বিদেশীর ভারত প্রবেশের উদ্যোগ, অন্যদিকে বিধর্ম্মীর প্রবল উৎপীড়ন! কিন্তু বিদেশীর আক্রমণ অপেক্ষা, বিধর্ম্মীর আক্রমণই তখন অধিকতর আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কে রাজ্যপালনের ভার দিয়া, নিজের হস্তে ধর্ম্মপালনের ভার লইয়াছিলেন। এইবার সেই ভার-গ্রহণের যোগ্যতা দেখাইবার শুভ অবসর উপস্থিত। পঞ্চনদবাসী ক্ষত্রিয়-গণ—অস্ত্রধারণ করিয়া বিদেশীর লুব্ধ দৃষ্টি হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এইবার মগধ, কান্যকুব্জ প্রভৃতি নগরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র হস্তে লইয়া বিধর্ম্মী বৌদ্ধ মত খণ্ডনে প্রস্তুত হইতে লাগিলে।

ভারত বিপ্লবের এই কেন্দ্রস্থলে—জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় সন্ধিক্ষেত্রে—এক দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বিপন্ন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য—ঠিক্ এই সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিলেন।

অবতার অর্থে যদি যুগোপযোগী চরম উন্নতির অবতারণ হয়, তবে শঙ্করাচার্য্য শঙ্করের অবতার! এমন অদ্ভুত জীবনী, এমন আত্মোৎসর্গের চরম আদর্শ, এমন অমানুষিক প্রতিভা বুঝি আর কোনও দেশে কেহ কখনও দেখে নাই।

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের কেহ কেহও এই মতাবলম্বী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শঙ্করের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটীই প্রধান—

> "নিধিনাগে ভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
> কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্ক বহ্ন্যাব্দ শিবতামগাৎ॥"

এই "নিধিনাগে ভবহ্ন্যব্দে" অর্থে ৩৮৮৯ কল্যব্দ বুঝায়। সুতরাং ইহা ৭৮৮ খৃঃ অব্দই বটে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত "সারদামঠে"

আচার্য্যপরম্পরায় যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনের ঘটনাবলী সমস্তই লেখা আছে। ঐ তালিকার মতে—"যুধিষ্ঠির-শকে ২৬৩১ বৈশাখ শুক্ল পঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।" এই যুধিষ্ঠির শক-কল্যব্দেরই নামান্তর মাত্র, কেবল ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্য। অতএব শঙ্কর ২৬৩১ কল্যব্দে অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন জীবন্ত প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেন যে তাহাদের আনুমানিক প্রমাণের বলে শঙ্করের আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

(২)

সে দিন ভূত চতুর্দ্দশী। বারিকল্লোল মুখরা নর্ম্মদার পুণ্য পুলিনে, এক প্রগাঢ় জনতাময় শিবমন্দিরে, অনেক রমণী একত্রিত হইয়াছিল।

সকলেই শিবপূজা করিয়া জন্মসার্থক করিতে আসিয়াছিল, নারীগণ শঙ্করের চরণে আপনাপন অভীষ্ট কামনা করিতেছিল। পুরোহিত ভক্তের শ্রদ্ধার উপহার দেবপদে নিবেদন করিতেছিলেন। সোপানোপরি দাঁড়াইয়া এক অসামান্য সুন্দরী—অটল আগ্রহে পূজা দেখিতেছিলেন।

ক্রমে পূজা শেষ হইল, সমাগত রমণীগণ শঙ্করের কাছে মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া একে একে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই অসামান্য সুন্দরী তখনও দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিগো! সকলেই চলিয়া গেল, তুমি যে গেলে না? তোমার কি পূজা হয় নাই?" পুরোহিতের কথায় রমণীর চমক ভাঙ্গিল, রমণী বস্ত্রপ্রান্ত হইতে কতকগুলি বিল্বপত্র বাহির করিয়া শিবের চরণে উপহার দিলেন। পুরোহিত বলিলেন,—"তোমার যদি কিছু কামনা থাকে, এই বেলা ঠাকুরকে বল। আমি এখনই মন্দিরের দ্বারবন্ধ করিয়া চলিয়া যাইব।" রমণী বলিলেন,—"আমি আর কি চাহিব প্রভো! আমি শিবের মত সন্তান চাই,—ঠাকুর কি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?

ঠিক সেই সময় মন্দিরাধিষ্ঠিত পাষাণময় লিঙ্গমূর্ত্তি কাঁপিয়া উঠিল। পুরোহিত সবিস্ময়ে দেখিলেন,—বিগ্রহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া সেই সাক্ষাৎ কোমলতা ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমা রমণীর চারু অঙ্গে যেন তড়িৎপ্রবাহে বহিয়া গেল! রমণী ভূতাবিষ্টের মত ভয়চকিত দ্রুতপদে মন্দিরের সোপান অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা অনেক পূর্ব্বেই বাটী চলিয়া গিয়াছিল। রমণী একাকিনীই বাটী চলিলেন। তখন ধূসরাঞ্চলা সন্ধ্যা সুন্দরী, উজ্জ্বল তারকার টীপ্ পরিয়া ধীরে ধীরে ধরাতলে নামিতেছিলেন। রমণী আর বিলম্ব করিলেন না, সাহসে ভর করিয়া চলিলেন। সেই তরুচ্ছায়া ঘন জনমানবশূন্য নিস্তব্ধ অস্পষ্ট গ্রাম্যপথে—তাঁহাকে ভরসা দিবার আর কেহই ছিল না।

(৩)

রমণীর নাম—বিশিষ্টাদেবী। তাঁহার বাটী কেরল প্রদেশের চিদম্বর গ্রামে। বাটীতে রমণী একাকিনীই থাকিতেন, দ্বিতীয় অভিভাবক কেহই ছিল না। স্বামী আছেন, কিন্তু জ্ঞাতি বিসম্বাদে বিব্রত হইয়া মনের দুঃখে তিনি বিদেশবাসী।

শঙ্কর বিশিষ্টার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিশিষ্টার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। স্বামী বাটীতে নাই, বিশিষ্টাকে সন্তান সম্ভাবিতা বুঝিয়া প্রতিবেশিনীগণ কাণাঘুষা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্পষ্টতঃই সেই উন্মুক্ত নীলাম্বরের ন্যায় নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপণ করিয়া বিশিষ্টাকে ঘৃণা করিতে লাগিল।

পত্নীর গর্ভসংবাদ শ্রবণে, ব্রাহ্মণ হৃষ্টমনে বাটী আসিলেন। 'পঞ্চামৃত' 'দোহদ'—নিয়মকর্ম্ম সমস্তই হইল। প্রতিবেশিনীগণের অসহ্য বিদ্রূপ ব্যঙ্গের মধ্যে, মিথ্যা কলঙ্কে মর্ম্মব্যথিতা বিশিষ্টা, পুণ্যাহ বৈশাখের শুভ

শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে এক সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। সন্তান পাইয়া স্বামী স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। যথাবিধি জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইল। সূতিকাগৃহেই সেই ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানিতে কি এক শাশ্বত ধ্যান ধারণার অন্তর্মুখী ভাব—অপার্থিব সৌন্দর্য্যে সগৌরবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন - এই শিশু হইতেই একদিন তাঁহার বংশের গৌরবভাতি ভবিষ্যতের প্রসন্ন আকাশে —বিপুল উল্লাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। শঙ্করের প্রসাদে পুত্রের জন্ম, ব্রাহ্মণ "শঙ্কর" নামেই নবকুমারের নামকরণ করিলেন।

যথাসময়ে শঙ্করের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইল, ব্রাহ্মণ দেখিলেন—পুত্রের পরমায়ু অষ্টমবর্ষ পর্য্যন্ত! বাত্যাবিতাড়িত বেতসের ন্যায় দম্পতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। জ্যোতিষীগণ—গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করিলেন।

মহাপুরুষগণের বাল্যলীলা প্রায়ই অলৌকিক ঘটনাময়ী হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য অতি শৈশবেই অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। একবৎসর বয়সে তাঁহার বর্ণ পরিচয় হয়, দুই বৎসর বয়সে মাতৃমুখে পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিয়া, পুরাণ পাঠে তাঁহার আগ্রহ জন্মে। তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়া শঙ্কর পিতার কাছে শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন। এই তৃতীয় বৎসর বয়সের সময়েই শঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়।

(৪)

পতিবিয়োগে বিশিষ্টাদেবী বড়ই বিপদে পড়িলেন। আশ্রয় তরুহীন লতিকার মত তাঁহার জীবন শঙ্কটসঙ্কুল হইয়া পড়িল। প্রতিবেশীদের সকল ছেলের চেয়ে শঙ্কর মেধাবী, অনেকেরই তাহাতে হিংসা হইল। পরশ্রীকাতর জ্ঞাতি শত্রুগণ সুযোগ বুঝিয়া বিধবার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। শঙ্করের মুখ চাহিয়া অনাথা সকল উৎপীড়ন সহ্য করিতে লাগিলেন।

বিশিষ্টা জানিতেন—তিনি রমণী, সহিষ্ণুতাই রমণীর ধর্ম্ম। রমণী জননীর জাতি, জগতে তাই রমণীর কর্ত্তব্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

এদিকে পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া শঙ্করের জ্ঞান পিপাসা আরও প্রবলভাব ধারণ করিল। বালক বেদপাঠের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু যজ্ঞসূত্র ধারণ না করিলে তো বেদপাঠে অধিকার জন্মিবে না। শঙ্কর বিশিষ্টাকে মনের কথা জানাইলেন। বিশিষ্টা শঙ্করের উপনয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যেখানে যত আত্মীয় ছিল, অভাগিনী একে একে সকলেরই শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু হায়! কেহই অনাথার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। সকলেই বলিল,—"তুমি সমাজপতিতা, তোমায় সাহায্য করিয়া কে পতিত হইবে?" সমগ্র কেরলপ্রদেশে—অসংখ্য ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহারও প্রাণ অনাথার দুঃখে করুণার্দ্র হইল না।

এই সময় শঙ্কর একদিন শৈশব সহচরগণের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। এক বিশাল প্রান্তরে, মৃত্তিকাস্তূপের উপর শুষ্ক পত্র সঞ্চয় করিয়া বালকগণ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল। অগ্নির উত্তাপে সহসা সেই মৃত্তিকার স্তূপ হইতে এক মহাসর্প বহির্গত হইল। দংশনের ভয়ে বালকগণ পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় শঙ্কর ক্ষিপ্রহস্তে সেই ঊর্দ্ধফণ বিষধরকে ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বালকগণ আবার খেলায় মাতিল।

একজন পথিক দূরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। শঙ্করের সাহস দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, শঙ্করকে একটু তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন,—"বালক! এমন কাজ কখনও করিও না সাপটা যদি কামড়াইত তখন কি করিতে?"

শঙ্কর উত্তর দিলেন,—"সাপ কামড়াইলে আমি অবশ্যই মরিতাম, কিন্তু আমার এই সঙ্গীগণ সকলেই ত পরিত্রাণ পাইত। আপনার প্রাণ দিলে যদি অপরের প্রাণরক্ষা হয় সে কাজ করা কি ভাল নয়?"

বালকের মুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া পথিক অবাক্ হইলেন, শঙ্করের পরিচয়ও লইলেন। খেলা সাঙ্গ হইলে বালকগণ বাটী ফিরিল। পথিক শঙ্করের সঙ্গে বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্টাকে বলিলেন,—"মা! আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি তোমার শঙ্করের কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র পরাইয়া দিব। আমি একাই হোতা, আচার্য্য ও তন্ত্রধারক হইব।" বিধবার প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। তিনি ভক্তিভরে আগন্তুকের পদধূলি লইলেন।

কল্যাব্দের ২৬৩৬ শকে, চৈত্র মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে শঙ্করের উপনয়ন হইল। পথিক নিজে সমাজপতিত হইয়াও শঙ্করের বেদাধ্যয়নের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

সেই সময় গোবিন্দ স্বামী নামক একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন, শঙ্কর সেই মহাপ্রাণ গোবিন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শঙ্করের একাগ্রগামী শরের মত স্মরণশক্তি দেখিয়া, গোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন— এই ক্ষুদ্রবীজই অচিরে শাখাপত্র-বহুল বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইবে।

আচার্য্যের অনুমান ব্যর্থ হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই বেদ রহস্যের মর্ম্ম বুঝিয়া শঙ্কর ব্রহ্মাদ্বৈত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শঙ্করের ধারণা জন্মিল—সংসারাপেক্ষা সন্ন্যাসধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাকে সংসারবাসী নরনারীর মুক্তিপথ দেখাইয়া দিতে হইবে।

এই সময় আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। একদিন শঙ্কর জননীর সঙ্গে নর্ম্মদায় স্নান করিতে গেলেন, কিন্তু জলে নামিবামাত্র এক ভীষণমূর্ত্তি কুম্ভীর আসিয়া শঙ্করকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিশিষ্টার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। ঘাটে তখন অনেক লোক স্নান করিতেছিল, শঙ্করকে উদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। উন্মাদিনী বিশিষ্টা—আপনিই জলে ঝাঁপ দিলেন, কুম্ভীর তখন শঙ্করকে গভীর জলে লইয়া গিয়াছিল। শঙ্কর মাতাকে বলিলেন,—"মা! কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? আজ

আমার নিশ্চয় মৃত্যু। আমার পরমায়ু ৮ বৎসর মাত্র, আজ সেই অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।"

বিশিষ্টা উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিয়া বলিল,—"কে আছ, আমার শঙ্করকে রক্ষা কর, আমার প্রাণ লইয়া আমার শঙ্করকে রক্ষা কর,—" কুম্ভীরের মুখে যাইতে কেহই অগ্রসর হইল না। শঙ্করকে জলমগ্নপ্রায় দেখিয়া বিশিষ্টা আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ভগবান্! আর কি কোনও উপায় নাই?" নদীপুলিন হইতে সহসা কে যেন বলিয়া উঠিল—"উপায় আছে। যদি তুমি শঙ্করকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুমতি দিতে পার, শঙ্কর কুম্ভীরগ্রাস হইতে মুক্তি পাইবে।" বিশিষ্টা বলিলেন,—"শঙ্কর "সন্ন্যাসী হউক, তবু তো সে আমার বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাই আমার সান্ত্বনা। শঙ্কর সন্ন্যাসী হউক—আমি অনুমতি দিতেছি।"

তখনই সেই তটপ্লাবিনী নর্ম্মদার চঞ্চল বক্ষ আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা তরঙ্গের স্রোত আসিয়া শঙ্করকে কূলে তুলিয়া দিল। বিশিষ্টা হারানিধিকে কোলে লইয়া গৃহে আসিলেন।

২৬৩৯ কল্যাব্দ কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশী তিথিতে মাতৃপদরেণু লইয়া, আচার্য্যের অনুমতিক্রমে শঙ্কর কাশীযাত্রা করিলেন। বিশিষ্টা বারণ করিলেন না—কেবল মর্ম্ম শোণিতের মত দুই বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু অভাগিনী মাতৃহৃদয়ের নিদারুণ বেদনা জানাইল। পুণ্যভূমি জন্মভূমির শান্তি-শীতল ক্রোড় হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে আপনার আসন পাতিয়া লইবার জন্য—শঙ্কর যে অবসরের অন্বেষণ করিতেছিলেন, এতদিনে তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইল। বালক শঙ্কর একাকী—সেই বৌদ্ধ-প্লাবিত ভারত-বর্ষে, দেশব্যাপী বদ্ধমূল কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, আপনার কর্ম্মক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বিশ্বেশ্বরের লীলাভূমি বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়া শঙ্কর প্রথমেই মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করিলেন, স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার

মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। এই সময় এক বীভৎসমূর্ত্তি ঘৃণিত চণ্ডাল তাঁহার পথরোধ করিল। চণ্ডালের সঙ্গে চারিটী কুকুর, পাছে চণ্ডাল ও কুকুরস্পর্শে অশুচি হইতে হয়, এই ভয়ে শঙ্কর চণ্ডালকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু চণ্ডাল পথ ছাড়িল না। নীচ ব্যক্তির স্পর্দ্ধা দেখিয়া শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসীর সেই বিশাল চক্ষুর্দ্বয় মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্ত প্রভায় জ্বলিয়া উঠিল। তখন চণ্ডাল আচার্য্যকে বলিল,—"তুমি না তত্ত্বজ্ঞানী? তুমি আমায় অপবিত্র ভাবিতেছ; ব্রহ্মবস্তুর আবার ভেদ-জ্ঞান কি?" একি! নীচ চণ্ডালের মুখে বেদনির্ণীত তত্ত্বকথা! ষড়দর্শনের বিপুল আয়তনের মধ্যে শঙ্কর যে উপদেশ পান নাই, একটীমাত্র মুখের কথায় এক মূর্খ সেই মহা সমস্যার পূরণ করিয়া দিল! শঙ্কর আর থাকিতে পারিলেন না, ভাবমুগ্ধহৃদয়ে—আপনার সমস্ত বিদ্যাভিমান, জ্ঞানগরিমা, ধর্ম্মাহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া, সেই চণ্ডালবেশী লোকপাবনী মূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন! শঙ্করের ভেদজ্ঞান ঘুচিয়া গেল। চণ্ডাল শিবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শঙ্করকে আলিঙ্গন করিলেন। চণ্ডাল-সহচর কুক্কুর চতুষ্টয়ও চতুর্ব্বেদে পরিণত হইল। ভগবান্ শঙ্করের উপদেশে, আচার্য্য শঙ্কর—অদ্বৈত মত প্রচারে উদ্যোগী হইলেন।

শঙ্কর দেখিলেন, কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে হিন্দুধর্ম্ম বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুর "কর্ম্মফল-বাদ" "অদৃষ্টবাদ" ও "জন্মান্তর-বাদ" আত্মসাৎ করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুর "ক্রিয়াকাণ্ড" "বেদ" ও "পরমাত্ম তত্ত্ব" উপেক্ষায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কর এ রহস্য বুঝিয়া লইলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন,—তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান গুণ, উহা সহজবোধ্য, হিন্দুধর্ম্মের মত জটিল ও আপাততঃ বৈষম্য সমর্থক নহে। এই গুণেই ভারত বৌদ্ধধর্ম্মের চিত্তাকর্ষী ঔদার্য্য ভুলিয়াছিল। শঙ্কর দেখিলেন,—স্বার্থপরতার কপট ব্যাখ্যায় শাস্ত্রমর্ম্ম আচ্ছন্ন, কেহই তাহা বুঝিতে

পারিতেছে না। বৌদ্ধ শ্রমণগণ যে সকল দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, ক্রিয়াকাণ্ড-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সহজে তাহা খণ্ডন করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণের অনন্ত রত্নপ্রসূ প্রতিভা তখন একেবারেই অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারত হইতে তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও পরমার্থ চিন্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবুও হিন্দুধর্ম্মের এত অধিক প্রভাব যে কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর ধরিয়া বিবাদসংঘর্ষ সহ্য করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের তুমুল তরঙ্গ সংঘাতেও তাহা ভারত হইতে একেবারেই তিরোহিত হয় নাই।

যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের গগনস্পর্শী বিজয় নিশান সগর্ব্বে উড়িতেছিল, শঙ্কর সেই পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। সে কর্ত্তব্য—"উচ্ছেদসাধন, বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন"—কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আরও একটী গুরুতর কাজ তাঁহাকে করিতে হইবে, দার্শনিক মীমাংসক, নৈয়ায়িক, তার্কিক, নাস্তিক সকলকেই স্বমতে আনিতে হইবে। শঙ্করের এই মহাব্রতে কাবেরী তটস্থিত চোল দেশবাসী সনন্দন হস্তামলক, প্রতর্দ্দন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহায় ও সহচর হইলেন। তখন বারাণসী প্রতিধ্বনিত করিয়া—"তত্ত্বমসি" মহামন্ত্র উচ্চারিত হইল। শঙ্করের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

এই সময় শঙ্করের জননীর মৃত্যু হয়। সংসারের যেটুকু শেষবন্ধন ছিল, সেটুকু ছিন্ন হইল। শঙ্কর সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া, ধর্ম্মপ্রচারে আত্মসমর্পণ করিলেন। শঙ্করের শিষ্যগণ গুরুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, কাণ্যকুব্জ—প্রয়াগ বারাণসী সমস্ত প্রদেশে অদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগিলেন। লোক "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়া শঙ্করের পূজা করিতে লাগিল। অনেক রাজাও শঙ্করকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

অনেকেই বলেন—শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইয়াও শৈব মতের প্রচারক ছিলেন। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া, বাধ্য হইয়াও তাঁহাকে এ পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে তখন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, শঙ্কর সেই "ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তিকে" যোগমগ্ন শিবমূর্ত্তিতে পরিণত করিলেন। বৌদ্ধবিহারে শিবমন্দির স্থাপিত হইল। শঙ্কর বুদ্ধপত্নী ভিক্ষুণী গোপার সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি—গৌরীরূপে শিবমূর্ত্তির বামভাগে বসাইয়া দিলেন, লোকে বুদ্ধ ও গোপাকে ভুলিয়া হরপার্ব্বতীর জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমাকে প্রাণের ভক্তি দিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিখিল।

এই সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কুমারিল ভট্ট নামক এক মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত, অধর্ম্মাচার ও অনাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইনিই প্রথমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। শঙ্করের নিকটে, এই মীমাংসক কুমারিল ভট্ট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী রাজা প্রজা সকলেই অদ্বৈতবাদী হইয়া পড়িলেন। নৃপতিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

মাহেষ্মতি পুরে মণ্ডন মিশ্র নামক আর এক মহাপণ্ডিত ছিলেন। মণ্ডন মিশ্র কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক, তাঁহার বিশ্বাস ছিল—কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ মহাপাপ, কর্ম্ম হইতেই জীবের মুক্তি হয়। শঙ্কর দেখিলেন মণ্ডন মিশ্রকে বশীভূত করিতে না পারিলে "অদ্বৈত মত প্রচার" সম্পূর্ণ হয় না। মণ্ডন মিশ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিতেন। মণ্ডন মিশ্র সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ না করিলে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না।

শঙ্কর সশিষ্যে মণ্ডনমিশ্রের উদ্দেশে মাহেষ্মতী পুর যাত্রা করিলেন।

সেদিন মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ। ঘটনাচক্রে শঙ্করও মাহেষ্মতিপুরে উপস্থিত হইলেন। মিশ্র বড় পাকা লোক, পাছে পিতৃকর্ম্মের কোনও বিঘ্ন সংঘটন হয়, সেই ভয়ে তিনি বাটীর দ্বারবন্ধ করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে

ছিলেন। শঙ্করও ছাড়িবার পাত্র নহেন, মিশ্রের মনোভাব বুঝিয়া শঙ্কর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মিশ্র ঠাকুরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব অমঙ্গলসূচক, সুতরাং এই মুণ্ডিতশিরঃ সন্ন্যাসীর অতর্কিত আগমনে উগ্রস্বভাব মিশ্র বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। উভয়ে রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মিশ্র বলিলেন,—"কর্ম্মকাণ্ডই মুক্তির পথ", শঙ্কর বলিলেন,—"জ্ঞানকাণ্ডই উৎকৃষ্ট"। এই তর্কযুদ্ধে শঙ্কর মিশ্রের বিদুষী পত্নী উভয় ভারতী দেবীকে মধ্যস্থ মানিলেন। স্থির হইল যদি মিশ্র পরাজিত হ'ন—তাঁহাকে সন্ন্যাস ছাড়িয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে।

বিচারে মিশ্রের পরাজয় হইল। অনুতপ্ত মিশ্র জ্ঞানকাণ্ডের প্রশংসা করিয়া শঙ্করকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। শঙ্করের জয়ধ্বনিতে মাহেষ্মতী পুর প্রতিধ্বনিত হইল। মিশ্র দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী সাজিলেন। স্বামী গৃহ পরিত্যাগ করিতেছেন, মিশ্রের সাধ্বী পত্নীর তাহা সহ্য হইল না। তিনি শঙ্করকে বলিলেন,—"স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমার স্বামী পরাজিত হইলেও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ এখনও অপরাজিত; আমায় বিচারে পরাজিত করিতে না পারিলে, তুমি আমার স্বামীকে লইয়া যাইতে পারিবে না।" শঙ্করও সতীর কথা ঠেলিতে পারিলেন না।

দিগ্বিজয় শঙ্কর আজ বড় বিপন্ন, সন্ন্যাসী হইয়া আজ তাঁহাকে রমণীর সঙ্গে বিচার করিতে হইবে! অন্য কেহ হইলে, সন্ন্যাসীর "স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন নিষিদ্ধ" বলিয়া মিশ্রপত্নীকে নিরস্ত করিতে পারিতেন। শঙ্কর তাহা পারিলেন না। যিনি বিশ্বপূজ্য ব্রাহ্মণ হইয়া চণ্ডালের চরণে আকুলতায় অশ্রু ঢালিয়া আপনার ভেদবুদ্ধি ও আমিত্বের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের অসঙ্কীর্ণ হৃদয়ে কি স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান স্থান পায়? শঙ্কর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই-খানেই শঙ্করের শঙ্করত্ব, মহতের মহত্ত্ব।

মিশ্র-পত্নী প্রশ্ন করিলেন,—"কামকলা কয় প্রকার? তাহাদের আধারই বা কি?" সন্ন্যাসীর প্রতি সংসারিণীর কি অপূর্ব্ব প্রশ্ন! এইরূপ পূর্ব্ব-পথের সৃষ্টি না করিলে কি বিশ্বজয়ী শঙ্করকে পরাজিত করা যায়? শঙ্কর ব্যাকুল হইয়া এক মাসের সময় চাহিলেন, বলিলেন—"গৃহধর্ম্মে আমি অনধিকারী,—দেবি! আমি রতি শাস্ত্রের রহস্য জানিয়া আসিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

শঙ্কর—যোগবলে অমরক নৃপতির মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন; শিষ্য-গণ পর্ব্বতগুহায় তাঁহার পরিত্যক্ত দেশ সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিল। রাজদেহ ধারণ করিয়া, শঙ্কর রতি-রহস্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ-সংসারের বিলাস-সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াও—শঙ্কর কেমন উদাসীন! সুন্দরীর সুকোমল স্পর্শে—সে শরীরে তো শিহরণ উপস্থিত হয় না। তরুণীর ঈষচ্চঞ্চল কটাক্ষে শঙ্কর তো ব্যথিত হয় না! রাজমহিষীগণ রাজার এইরূপ ব্যবহারে দুঃখিত, পুরবাসিগণও বিরক্ত।

এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও গুরুদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। শঙ্করের শিষ্যগণ উদ্বিগ্ন হইলেন। নিভৃতে রক্ষিত শঙ্করের শবদেহও বিকৃত হইয়া আসিতেছিল। শিষ্যগণ পরামর্শ করিয়া অমরক রাজার ভবনে উপস্থিত হইল, দেখিল,—সেই নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী রমণীকুলে পরিবৃত হইয়া মদনোদ্দীপক সঙ্গীত শুনিতেছেন। শিষ্যগণ দূর হইতেই তখন সেই রাজরূপী আচার্য্যকে মোহ-মুদ্গরের শ্লোক শুনাইল। সে স্বর শঙ্কর চিনিতে পারিলেন। ইঙ্গিতে শিষ্যগণকে বুঝাইলেন, "চল—আমিও যাইতেছি।" সহসা রাজদেহ রমণীগণের অলক্তরাগ-রঞ্জিত নূপুর শিঞ্জিত চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। রাজভবনে আবার হাহাকার উঠিল।

উভয় ভারতী দেবী প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া স্বামীকে আর গৃহে রাখিতে পারিলেন না।

শঙ্করের অমানুষিক শক্তি দেখিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত জনশ্রুতি নানা দেশের লোকের মুখে পল্লবিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা জননীর স্নানের সুবিধার জন্য তিনি নর্ম্মদা নদীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার ব্যাসদেবও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বদেশের সর্ব্ব শ্রেণীর পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্থ করিয়া তিনি কাশ্মীরের "সারদা-পীঠে" উপবেশন করিয়াছিলেন। এমন উচ্চ-সম্মান লাভ করিয়াও শঙ্কর গর্ব্বিত হ'ন নাই। সারদাপীঠে বসিয়া শঙ্কর বলিয়াছিলেন—"এত দিনে মায়ের কোলে স্থান পাইলাম।"

শঙ্করের ধর্ম্মমত বেদান্তের উপর স্থাপিত। এখনও বদরিকাশ্রমে, পুরুষোত্তমে, দ্বারকায়—শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠ বর্ত্তমান আছে। অনেকে বলেন,—শঙ্কর নূতন কিছু বলেন নাই। এ কথা সত্য হইলেও, অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদের কার্য্যের যেটুকু অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর যেখানে যাইতেন, লোকে তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিত। শঙ্কর রাজহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না, কৃষকের গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন। শঙ্করের আবির্ভাব কালে ভারতে অসংখ্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম ছিল, সেই সকল আশ্রমে কেবল ব্যভিচার ও অনাচারের অনুষ্ঠান হইত। আশ্রমের অধিকারীগণ কাপালিক, বাজীকরণ, স্তম্ভন, বশীকরণ, রসায়ন, মারণ, উচ্চাটন, সম্মোহন এই সকল তান্ত্রিক বিদ্যার সাহায্যে তাহারা লোকচক্ষুর সম্মুখে শত শত ইন্দ্রজাল রচনা করিত। উষ্ণ সুরার সহিত সদ্য নিহত শিশুর উত্তপ্ত শোণিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা পান করিয়া কাপালিকগণ কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য শরীরে পাশব বল সঞ্চয় করিত। শঙ্করই এই বিরাট অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন।

শঙ্করকে কেহ নিজগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি বলিতেন,—আমায় যদি খাওয়াইতে চাও, আপনারা খাও, আর অভুক্তকে ডাকিয়া খাওয়াও, তাহা হইলে আমার পরিতোষরূপে আহার করা হইবে।”

শঙ্কর ভিক্ষাযাত্রায় বহির্গত হইলে শিষ্যগণ বলিয়াছিল,—“আপনি “যাইবেন না, আমরাই আপনার আহার্য্য আনিতেছি।” শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিতেন—“আমার চলৎশক্তি আছে, আমি অনায়াসেই দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে পারিব। কিন্তু যাহারা গতিশক্তি-হীন, তাহারা যেন তোমাদের প্রসাদে বঞ্চিত না হয়।”

শঙ্করকে কেহ আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করিলে, তিনি বলিতেন,—“আমায় অত যত্ন কর কেন? আমি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল প্রান্তরে পাক করিয়া ভোজন করি, রাত্রে বৃক্ষমূলে:নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই। যদি কোনও বিপন্ন তোমাদের দ্বারস্থ হয়, তাহাকে তোমরা আস্তা দিও।”

পাঠক! দেখুন—ধর্ম্ম তত্ত্বের—নীতি তত্ত্বের যাহা কিছু উচ্চ প্রশস্ত, ও জ্ঞান গর্ভ—তাহাই আমরা শঙ্করের মুখে শুনিতে পাই।

হায়! আজ আর সে শঙ্কর জীবিত নাই, বহুদিন হইল কেদারনাথ তীর্থে—তনুত্যাগ করিয়া তিনি লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলী এখনো আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কি দৃঢ়তায়, কি সাহসে, কি পাণ্ডিত্যে, কি সর্ব্বত্যাগী পণে, আর্য্য শক্তির নব অভ্যুত্থানের দিনে—শঙ্করাচার্য্য, নায়ক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত মহাপুরুষ।

শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু। শঙ্করের জন্ম সময়ে - রবি মেষে, মঙ্গল মকরে, এবং শনি তুলারাশিতে ছিলেন।

শঙ্করের ধর্ম্মমত

১। শঙ্কর ব্রহ্মশক্তি স্বীকার করিতেন, শক্তিকে উড়াইয়া দেন নাই।

২। শঙ্কর পরিণাম বাদ ও বিবর্ত্তবাদ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জয়দেব গোস্বামী

(১)

বঙ্গদেশে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক—পণ্ডিতবর জয়দেব গোস্বামী। সমাজ ও সময় লইয়া কবি, জয়দেব বাঙ্গালীর প্রথম কবি। বঙ্গের স্বাধীনতার সায়াহ্নে, অধঃপতিত বাঙ্গালীর অলস জীবনে, কৃষ্ণ প্রেমের পূত ধারা ঢালিয়া—বিলাসিনীর অভিসার গাহিতে জয়দেবের জন্ম। জয়দেবের কাব্য—সংক্ষুব্ধ আত্মার নিরাশ নিশ্বাস। কিন্তু এ সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনাইতে চাই। নহিলে, আপনারা জয়দেবকে ঠিক্ চিনিতে পারিবেন না।

বেদের 'পরমাত্মা'—বৌদ্ধযুগে 'আদিবুদ্ধ' হইয়া পড়েন! বৌদ্ধগণ বেদের "প্রজাপতি সৃষ্টির" উপাখ্যান গুলিও ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন, তাহা হইতেই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হয়।

তাহার পর শঙ্করাচার্য্যের অবির্ভাব কাল। তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিলে, ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। লোকের আবার পুরাতন ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিল। এই "পুরাতন" কথার অপভ্রংশ 'পুরাণ' হইতেই 'পুরাণ' নামের উৎপত্তি। ভারতে পৌরাণিক যুগ আরম্ভ হইল। আর্য্যগণ 'পুরাণ' শাস্ত্র রচনা করিতে লাগিলেন। "বুদ্ধ" "ধর্ম্ম" ও "সংঙ্ঘ" সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা এবং লয় কর্ত্তা সাজিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনে এক, একে তিন; এই ত্রিমূর্ত্তির

আধার "আদিবুদ্ধ" বেদের পরমাত্মার সঙ্গে, সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের পাকা হাতে রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত হইয়া এক হইলেন! বেদের সেই পুরাতন "বিষ্ণু" নামেই তাঁহার নামকরণ হইল। কিন্তু বৈদিক বিষ্ণু আর পৌরাণিক বিষ্ণু—নামে এক হইলেও, উভয়ের বিস্তর প্রভেদ রহিয়া গেল। বৈদিক বিষ্ণু "নিরাকারত্ব" ছাড়িয়া, পুরাণে সাকার হইলেন। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতি দমন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, মানবের মঙ্গল মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি মানব কে 'পিতা' এবং মানবীকে 'মাতা' বলিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। মানব ধর্ম্মী বিষ্ণুর প্রণয়িনী বা সঙ্গিনীও জুটিয়া গেল!

বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে—"বুদ্ধদেব এক জন্মেই "বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অশেষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। শেষ জন্মে—সিদ্ধার্থ গৌতম রূপে তিনি "নির্ব্বাণের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।" বুদ্ধের এই জাতক উপাখ্যান অবলম্বনে, হিন্দুরা বিষ্ণুকেও মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারে পরিণত করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ ও গোপার সন্ন্যাস মূর্ত্তিকে "হরপার্ব্বতী নামে" জাহির করিয়াছিলেন। অনেকের চক্ষে সন্ন্যাসীর কঠোর শ্রীহীন মূর্ত্তি ভাল লাগিল না। পৌরাণিকগণ —'বুদ্ধ গোপার' ঐশ্বর্য্যশালী সংসার-মূর্ত্তিকে "লক্ষ্মী নারায়ণে" পরিণত করিলেন। বুদ্ধ পাছে সন্ন্যাসী হইয়া যান—এই আশঙ্কায় অসংখ্য তরুণী রূপসী, লতার ন্যায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, শিরীষ সুকোমল বাহুর প্রেম-পুলকিত-গায় আলিঙ্গন পাশে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, বিষ্ণুর "রাসলীলা" রচিত হইল। বুদ্ধ, গোপার সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন; 'গোপা' অর্থে 'গোয়ালার মেয়ে বুঝায়—পুরাণে গোপা ব্রজ গোপিনী হইলেন;—গোপা ও বুদ্ধের বিহার শ্রীকৃষ্ণের 'গোপিনী-বিহার' বলিয়া প্রচারিত হইল।

এই সময় এক রসজ্ঞ পণ্ডিত "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" লিখিয়া নারায়ণের

প্রধান শক্তি লক্ষ্মীকে রাধারূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বামে বসাইয়া দিলেন। এইরূপে বঙ্গে প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থাপিত হইল।

শঙ্করের সময়েও অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, ব্যভিচারের কলুষ-স্রোতে 'গা' ভাসাইয়া দিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া, তাহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। শঙ্করের 'অদ্বৈতবাদ' 'কামিনী কাঞ্চন-বিরোধী কঠোর সন্ন্যাস'—অনেকেরই ভাল লাগে নাই। বৈষ্ণবগণ যখন 'দ্বৈতবাদ' প্রচার করিলেন, তখন অনেকেই উদার ধর্ম্মমত বলিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। যে সকল অন্ত্যজ জাতি বৈদিক দ্বিজাতির শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যাহা-দিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন—এই মর্ম্মান্তিক উপেক্ষায় মর্ম্মাহত হইয়া, বৌদ্ধ শ্রমণগণের উদার আহ্বানে যাহারা একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা সকলেই দলে ভিড়িয়া 'বৈষ্ণব' হইয়া গেল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-নীতির কঠোর শাসনে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ প্রকাশ্যে একত্র থাকিতে পারিত না। থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত,—তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—বাধাবন্ধন বিহীন,—বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর একত্র বাস—ধর্ম্মনীতির প্রতিকূল নহে। রমণীর প্রলো-ভনের একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণ আছে, রমণীকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর কর্ম্মঠ উপাদান সংসারের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে নারী যেমন পুরুষের সহচরী, ধর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনি সহধর্ম্মিণী। যে ধর্ম্মে প্রেম-প্রতিমা নারীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিলেও ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত হয় না, সে ধর্ম্মের প্রতি কাহার না সহানুভূতি জন্মে? সাম্য মন্ত্রপূত উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মে নরনারী সম্মিলনের পরিণামের নাম "সহজ ভজন", এমন 'সহজ ভজন' পন্থা—রক্তমাংসের দেহে বিশেষ কার্য্যকরী। তাই লোকনিন্দার হাত এড়াইবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ দলে দলে বৈষ্ণব হইতে লাগিল। বুদ্ধ তো একটীমাত্র মুক্তি—"নির্ব্বাণ" দিতে

পারিতেন, বিষ্ণু—সারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, সান্নিধ্য—এই চারি প্রকার মুক্তি দিতে পারেন! বিষ্ণুর চেয়ে বড় কে? বুদ্ধদেবের উপদেশ—"অহিংসাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম", বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুলমন্ত্র—"জীবে দয়া"। বৌদ্ধগণের উপজীবিকা—ভিক্ষা, বৈষ্ণবগণেরও তাই। বৌদ্ধধর্ম্মে, বৈষ্ণবধর্ম্মে—জাতিভেদ নাই। দুইটীই শান্তির ধর্ম্ম;—বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর বাড়িল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হইল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। দক্ষিণাপথের তুল্যদেশে মধ্বাচার্য্য একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত—বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে বীরভূম জেলায় জয়দেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিলেন।

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের" রাধাকৃষ্ণ চরিত্র লইয়া জয়দেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। আজিও যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতের সকল প্রদেশে আদরের সহিত গৃহীত হইয়া আসিতেছে—পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামীই তাহার প্রচারক।

অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে (কেঁদুলি) পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম—বামাদেবী। জয়দেবের পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। শৈশবেই জয়দেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন; 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ' পাঠ করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে আসক্ত হন। রাধাকৃষ্ণের পূজা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। সংসারের কোন বিষয়েই তাঁহার অনুরাগ ছিল না। পুত্রের ঔদাসীন্য দেখিয়া বামাদেবী জয়দেবের বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। জয়দেবের রূপ ছিল, বিদ্যা ছিল, পাত্রীর অভাব হইল না। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পরমাসুন্দরী বালিকা কন্যাটীকে সঙ্গে করিয়া জয়দেবের বাটীতে আসিলেন। জয়দেব দেখিলেন—বালিকা রূপবতী বটে, দারিদ্রজনিত প্রচ্ছন্ন বিষাদের ভাব—তাহার

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুর লীলা "শ্রীকৃষ্ণের রাস-খেলা।"

জীবন-চিত্র

সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে কি এক রকম স্নিগ্ধ কোমলতার সঞ্চার করিয়াছিল; কৈশোরের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াও বালিকা উষ্ণ-পবন-স্পৃষ্টা মাধবী লতার ন্যায় শ্লথ শোভাময়ী! জয়দেবের প্রাণ সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। কিন্তু তিনি শরণাগত ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে স্পষ্টই বলিলেন—বিবাহের পুণ্য বন্ধন তাঁহার মত উদাসীনের জন্য নহে। যে সংসারী—কামিনী তাহারই সঙ্গিণী, জয়দেব সংসারী হইতে অনিচ্ছুক। ব্রাহ্মণ অন্য কাহাকেও কন্যা সমর্পণ করুন।

ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্নমনে প্রত্যাখ্যাতা অশ্রুমুখী আত্মজাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িল।

জয়দেবও ভাবিলেন, সংসারে থাকিলে হয় তো তাঁহাকে কামিনী কাঞ্চনের মায়ায় পড়িতে হইবে। সকলের অজ্ঞাতসারে, কন্থা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া জয়দেব গৃহত্যাগ করিলেন।

(২)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে—জগন্নাথ দেব বুদ্ধেরই বিগ্রহ, হিন্দুরা তাঁহার দারুমূর্ত্তিকে "নারায়ণ" বলিয়া আপনার করিয়া লইয়াছিল। জগন্নাথ বড় জাগ্রত দেবতা, তদীয় বিগ্রহ দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। লোকে ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াও জগন্নাথ দর্শনে ছুটিত, হয়তো দস্যুর নির্ম্মম হস্তেই সাধকের মহামুক্তিলাভ ঘটিত। জয়দেব স্বদেশে থাকিয়াই জগন্নাথের মাহাত্ম্য শুনিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া, বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত জয়দেব পুরুষোত্তমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অকপট ভক্ত জানিয়া পাণ্ডারা শ্রীমন্দিরেই আশ্রয় দান করিল।

সে'দিন কি একটা উৎসব ছিল। গম্ভীরনাদী বারিধি-কূলে, কৌমুদী প্রফুল্লা রজনীতে, পুষ্প-সুরভি সুবাসিত আলোকোজ্জ্বল নাট্যমন্দিরে,

লোকারণ্যের মধ্যে বসিয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তন্বঙ্গী গান গাহিতেছিল। সুন্দরী—দেবদাসী। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে প্রভুর সেবার জন্য শ্রীমন্দিরে অনেকগুলি যুবতী থাকিত। লোকে তাহাদিগকে দেবদাসী বলিত। দেবদাসীরা চিরকুমারী থাকিত, তাহাদের বিবাহ হইত না। দেব-প্রসাদ-লব্ধ বৃত্তি হইতে তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

দেবদাসী বড় মধুর গাহিতেছিল। বুঝি তাহার কণ্ঠস্বরে—বৃষ্টি-ক্ষোভ রহিত জলধরেরর মত গম্ভীর দারুময় ভগবানের ধবনীতেও শোণি-তের স্পন্দনে তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন অনুমিত হইতেছিল। গায়িকা অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাহাকে দেখিয়া দর্শকগণের মনে হইতেছিল—বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন সেই তরুণীর সুগঠিত অঙ্গে একসঙ্গে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর সেই অলক্ত রাগরঞ্জিত চরণযুগলের স্পর্শসুখ অনুভব করিবার জন্য, হাস্যময়ী ধরিত্রী দেবী যেন সাগ্রহে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। যুবতীর পুণ্য তনুর উচ্ছ্বসিত লাবণ্য, যেন সেই যামিনীবল্লভ চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্র কিরণের মত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়-মল প্লাবিত করিয়া, নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সুন্দরীর বেশভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না। পরিধানে বাসন্তী বর্ণের একখানি শাড়ী, কবরীতে একগাছি ফুলের মালা জড়ানো, কর প্রকোষ্ঠে, কণ্ঠে, মৃণালতন্তু জড়িত কুসুম স্তবক। এই ফুলের সাজে, পুষ্পিতা ব্রততীর মত তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শ্রোতৃবর্গ সকলেই গায়িকার 'তারিফ' করিতেছিলেন। কেহ তাহার পরিধেয় শাড়ীখানির, কেহ সেই চূর্ণকুন্তল শোভী শৈবাল বেষ্টিত প্রফুল্ল পদ্মের মত সুন্দর মুখখানির, কেহবা সেই মৃণালনিন্দিত সুগোল হাত দু'খানির প্রশংসা করিতেছিলেন! সুরের শ্রোতা বড় বেশী ছিল না।

মর্ম্মরখচিত দেব-মন্দিরের সোপানে বসিয়া, রসিক জয়দেব—সেই সচ্ছন্দ পিকের সানন্দ ঝঙ্কার শুনিতেছিলেন; আর এক একবার সেই

আনন্দের জনয়িত্রী গায়িকার স্বেদসিক্ত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি, সস্পৃহ লোচনে সকলের চক্ষুকে প্রতারণা করিয়া দেখিতেছিলেন। গোস্বামীর হৃদয় কঠোর বৈরাগ্য মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার এককোণে 'ওয়েসিসের' মত একটু প্রেমের ছায়া লুক্কায়িত ছিল। দূর-শ্রুত সিন্ধু-কল্লোলের ন্যায়, প্রেমবন্যার সাড়া পাইয়া আজ সেই আসক্তি-হীন নীরস হৃদয়—দুরুদুরু স্পন্দনে সহসা কাঁপিয়া উঠিল। জয়দেব আত্মহারা হইয়া, গায়িকার বীনানিন্দিত মোহন কণ্ঠের স্তুতিসূচক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। রমণী তাহা শুনিতে পাইল। একবার মুখ তুলিয়া, পূর্ণোন্মুক্ত নয়নে স্তাবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, দেখিল—এক জ্যোতির্ময় দেহ যুবা পুরুষ, তাহার গানে তন্ময় হইয়া তাহারই পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, কিন্তু সে চাহনীতে উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের ঘৃণিত উত্তে-জনা নাই। তথাপি মলয়ান্দোলিতা চন্দন-লতার ন্যায় তরুণী একবার শিহরিয়া উঠিল, কিশলয় কোমল করতল বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া যুবতী সে হৃদয়াবেগ তখনি সম্বরণ করিল। যুবতী আর গান গাহিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বরে যেন রোদনের ঝঙ্কার আসিতেছিল। লোকে মনে করিল গায়িকা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রধান পাণ্ডা তাহাকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন। অলসমন্থরগমনা সুন্দরী, সঞ্চারিণী পল্লবিতা লতার ন্যায় আনত দেহে ধীরে ধীরে রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিল। যাইবার সময়, সোপানোপরি উপবিষ্ট জয়দেবের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, জয়দেব বুঝিলেন—সেই করুণ চাহনীতে, যুবতীর হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অস্ফুট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরব ভাষায় ব্যক্ত হইতেছিল।

(৩)

পরদিন প্রথম সূর্য্যরশ্মির অরুণ-আলোকে, জয়দেব ও গায়িকার পরিচয় হইল। গায়িকার নাম পদ্মাবতী। জয়দেব জানিতে পারিলেন—

পদ্মাবতী সেই ব্রাহ্মণের দুহিতা; প্রথম যৌবনে বিবাহের আনন্দময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া—এই উজ্জ্বল স্বর্ণমুষ্টিকে তিনি ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ধূসরমলিন শশি লেখা—আজ পূর্ণ শশির প্রভা ধারণ করিয়াছে। জয়দেবের অনুতাপ হইল—এতদিন মায়াময় মানব-জীবনটা কেবল নিরর্থক স্বপ্নেই কাটিয়া গিয়াছে! দেবদাসী পদ্মাবতী তাঁহার ঝঞ্ঝাহত প্রাণের জড়ত্বকে অপসারিত করিয়া দিল। প্রভুর অনুকম্পায় জয়দেব আজ বিশ্বরাজ্যে মাথা গুঁজিবার একটু স্থায়ী আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন। পদ্মাবতীকে উপেক্ষা করিয়া একদিন তিনি যে ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহাকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়া আজ সেই মহাভ্রম সংশোধন করিলেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম হৃদয়হীন অপ্রেমিকের ধর্ম্ম নহে। গোস্বামী বুঝিতে পারিলেন—অনির্দ্দিষ্ট পথে অসহায় ভ্রমণের চেয়ে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম-চর্য্যা করা অনেক ভাল। মিলনের মহা সাধনায়—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলাভ হয়। তাহার নামই "সহজ সাধন"।

পদ্মাবতীর সরল হৃদয় এখনও শৈশবের মত নিষ্পাপ ছিল, পূর্ণ যৌবনেও তাহা কলুষিত হয় নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি জয়দেবকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

সেই দিন, সেই নির্জ্জন সাগর সৈকতে, মুক্তালোক প্রচুর চন্দ্রাতপ তলে দাঁড়াইয়া, বিশ্ব প্রেমিক জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী করিয়া, ভবিষ্যতের আশাপূর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে জীবনের পুণ্যময় অবসরে, চিরসন্ন্যাসী ও চিরকুমারী—স্বহৃদয় বিনিময় করিলেন! তখন মন্দির কুট্টিমে আরতির মঙ্গল শঙ্খ বাজিতেছিল।

(৪)

প্রেমের মৃদু-হিল্লোলে, প্রাণেশ্বরের হর্ষ আকুল কোমল করের রোমাঞ্চ

স্পর্শ অনুভব করিয়া, পদ্মাবতীর কুমারী ব্রত ভঙ্গ হইল। এজন্য পাছে উৎকলবাসীগণের হস্তে প্রেয়সীকে লাঞ্ছনা সহিতে হয়, সেই ভয়ে জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে উড়িষ্যা ত্যাগ করিলেন।

জয়দেব পূর্ব্ব হইতেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, পদ্মাবতী পতির পদধূলায় শ্যামল যৌবন ঢাকিয়া রাখিয়া ভিখারিণী সাজিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। হরি গুণ গানে, অমৃতময় ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া পাদপ কুটিরের পর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া, দম্পতীর জীবন বড় সুখে কাটিতে লাগিল।

নারী হৃদয়ের সমস্ত টুকু দিয়া, পদ্মাবতী স্বামীর সেবা করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মাবতী জয়দেবের জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। পদ্মাবতীকে দেখিলে জয়দেবের মনে হইত—কাদম্বিনী ঘন চিকুর ছায়ায় এ পূর্ণচাঁদ কোথা হইতে উদিত হইল? জয়দেব মহাপণ্ডিত ছিলেন। জীবনের গভীর অকাঙ্ক্ষা ও যৌবনের অসীম উচ্ছ্বাস একত্র হইয়া তাঁহার হৃদয়ে কবিতা শক্তি জাগিয়া উঠিল।

জয়দেব রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র, মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় কোথায় পাইবেন? পদ্মাবতীর পরামর্শে, অর্থ সংগ্রহের জন্য জয়দেব দেশান্তর যাত্রা করিলেন। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল। রাধামাধবের সেবাযত্নের আর ত্রুটী হইবে না ভাবিয়া জয়দেবের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি দেশে ফিরিলেন।

পথিমধ্যে একদল দস্যু জয়দেবকে আক্রমণ করিল। তাহারা অর্থের সন্ধান পাইয়াছিল। সমস্ত অর্থ অপহরণ করিয়া দস্যুদল প্রস্থান করিল। পিশাচদের নির্দ্দয় প্রহারে জয়দেব অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকেন, কতকগুলি কৃষক সে যাত্রায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। জয়দেব বহুকষ্টে দেশে ফিরিয়া আসেন।

আমাদের দেশে "মুষ্টি ভিক্ষার" প্রথা বৌদ্ধেরাই প্রচলিত করিয়া-

ছিলেন। মুষ্টি ভিক্ষায় রাধামাধবের সেবা চলিতে লাগিল। পতি-পরায়ণা প্রেমময়ী পত্নী পাইয়া জয়দেবের কবিত্ব শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইল। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়া পদাবলী রচনা করিতেন, পদ্মাবতী সেই পদাবলীতে সুর সংযোগ করিয়া, আপনার স্বভাব-মধুর মোহন কণ্ঠে সেই গান দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে রাধা-মাধবের সেবা ও উভয়ের ভরণ পোষণ একরকম চলিয়া যাইত। কিন্তু মুষ্টি ভিক্ষার সাহায্যে গার্হ্যস্থধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য 'অতিথিসৎকার'—তাঁহাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। ভিক্ষালব্ধ সামান্য তণ্ডুল একজন আগন্তুকের পক্ষেও প্রচুর হইত না।

অল্পদিন পরেই স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া আবার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

(৫)

পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া জয়দেব বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে, গমন করিলেন। তখন গৌড়ের স্বর্ণ সিংহাসনে, বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা—লক্ষ্মণ সেন, বারিপতনক্ষীণ মলিন মেঘের বুকে দামিনীর শেষ বিকাশের মত—শোভা পাইতেছিলেন।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালীর উপযুক্ত রাজাই ছিলেন। বাঙ্গালীর মত বিলাসী, বাঙ্গালীর মত অদৃষ্টবাদী, বাঙ্গালীর মত কাব্যপ্রিয়—রাজা লক্ষ্মণ সেন, কঠোর কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শায়াহ্নে, কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শুধু রাজ্যশাসন করিতেন না, রাজ্য পালনও করিতেন।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার সভায় রসিক, ভাবুক ও কবির আদর ছিল। গোবর্দ্ধন, শরণ, উমাপতি ও কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী—এই চারিজন কবি রাজার প্রথম জীবনের রুদ্রলীলায় কাব্যরসের অমিয় সিঞ্চনে নন্দনে

শান্তি বহিয়া আনিতেন। বৃদ্ধ রাজার সেই স্ফটিকময় রত্নরাজি-সমাকুল সভামণ্ডপে, বসন্তের মলয় বহিত। কুসুমের সৌরভ ছুটিত, নবযুবতী কিঙ্করী, বলয়াঙ্কিত বাহুবল্লরী ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া রাজাকে চামর ঢুলাইত, মদনের প্রকৃতিরূপ ছত্রধারী, রাজশিরে রত্নচ্ছত্র ধারণ করিত।

জয়দেব পদ্মাবতীকে লইয়া রাজ-সভায় প্রবেশ করিলেন।

চারিজন কবির সম্মুখে জয়দেব মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। রাজা গুণজ্ঞছিলেন, বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার সভা-কবিগণের মধ্যে কেহই জয়দেবের মত ভাষা সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী নহেন। কাহারো রচনায় এমন মলয়ের মধুর হিল্লোল নাই।

এই বার পদ্মাবতীর পরীক্ষা, রাজসভায় অনেকগুলি কোকিল কণ্ঠী গায়িকা ছিল, তাহাদের পুরোবর্ত্তিনী হইয়া পদ্মাবতী গান আরম্ভ করি-লেন। কেন্দু বিল্ব কবির কোমল কান্ত-পদাবলী, যখন দিব্য রাগিণীর "পূর্ব্বরাগ"-আলাপে, মূর্চ্ছনায় গমকে, রঙ্গে ভঙ্গে, দর্শকগণের অনন্যাসক্ত আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে পূর্ণ মাধুর্য্যের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল, তখন সেই জনতা-বহুল রাজ সভা, অমৃত নিস্যন্দিনী স্বরধারায় অভিষিক্ত হইয়া, তরঙ্গ বিহীন জলধির মত স্থির ও শান্তভাব ধারণ করিল! রাজ সভার শ্রেষ্ঠ গায়িকা নটবধূ— "বিদ্যুৎ প্রভা"র * অরুণরাগ লোহিত মুখ খানি, শিশির মথিত পদ্মিনীর ন্যায় লজ্জায় মলিন হইয়া গেল। পদ্মাবতীর প্রসংশায় রাজ সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গায়িকার কণ্ঠ যেমন মধুর, কবির শব্দ বিন্যাস তেমনি অপূর্ব্ব; যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ!! গায়িকার সঙ্গে সঙ্গে গীত রচয়িতাও সমাদৃত হইলেন। রাজা এই বৈষ্ণব দম্পতীকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

* "সেক শুভোদয়া" দেখুন।

(৬)

রাজাশ্রয়ে নিরুদ্বেগে, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়া জয়দেব—বৈষ্ণবের অমূল্য ধন "গীত গোবিন্দ" রচনা করিলেন।

পদ্মাবতী জয়দেবকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সখী মুখে স্বামীর অলীক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, পদ্মাবতীর মূর্চ্ছা হইয়াছিল, মৃতসঞ্জীবনী হরিনাম সুধায় জয়দেব সেই মৃত কল্পা পত্নীর চৈতন্য সঞ্চার করেন। পত্নীর ভালবাসার গভীরত্ব বুঝাইবার জন্য, জয়দেব আপনাকে "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচিত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই দাম্পত্য জীবনের প্রগাঢ় ভালবাসায়—"গীত গোবিন্দের" জন্ম। গীত গোবিন্দ—জয়দেব ও পদ্মাবতীর আত্ম-কাহিনী। আত্মজীবনের মিলন-বিরহ লইয়া, গীত গোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাই কৃষ্ণপ্রেমের বিশ্বব্যাপী ব্যাকুলতার মাঝখানে, গীত গোবিন্দে আমরা মদন-বিকারের পরিচয় পাই। অপাপবিদ্ধ, উদাসীন কবি রমণী-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় ধর্ম্মের মধ্যেও কেমন একটা নগ্ন-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন! গীত গোবিন্দ—আদি রসাত্মক প্রেমের নিখুঁত ফটো! তাহার প্রত্যেক গীতটীতে—শৃঙ্গার তত্ত্বের উদ্বেগ-ভরা অনুরাগ, প্রত্যেক অক্ষরে—মন্মথময় ইন্দ্রিয়ের চির বুভুক্ষা! গীত গোবিন্দের ভাষা—যেন মর্ম্মর পাষাণের উপর দীপ্ত-প্রভ-মণিমাণিক্য,—এক একটী করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া বসানো! মেঘের মেদুরচ্ছায়ালোকে, বাঞ্ছিতের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া, প্রেমময়ী পত্নীর অধর কম্পন দেখিতে জয়দেব গীত গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন।

গীত গোবিন্দের প্রাণ—মনোবৃত্তির উচ্ছ্বাসময় প্রেম, তাই গীতগোবিন্দ আপামর সাধারণের এত মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছে। গীত গোবিন্দ— রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্ত্তন করিয়া, বঙ্গদেশকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে। জয়দেবের এ ঋণ—বাঙ্গালী বৈষ্ণব কখনও শোধ দিতে পারিবেন না!

গীত গোবিন্দ রচনা সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে। "প্রিয়ে চারু-শীলে" প্রমুখ গানটী রচনার সময় জয়দেব একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। মানিনীর মানের মাত্রা গুরুতর হইলে, নায়ক চরণে ধরিয়া "চণ্ডী"কে শান্ত করেন। কিন্তু জগদীষ্ট কৃষ্ণ কি সামান্য নায়কের মত রাধার চরণ ধরিবেন? জয়দেবের ইহা সঙ্গত বোধ হইল না। "স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া জয়দেব ইতস্তত: করিতেছিলেন। বুঝি সেই বৈশাখের পূর্ণিমার মত সমুজ্জ্বল প্রতিভায়, সে'দিন ভাষার অনাটন পড়িয়া গিয়াছিল।

বেলা হইল দেখিয়া পদ্মাবতী স্বামীকে স্নান করিতে অনুরোধ করি-লেন। জয়দেব প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। জয়দেবের বাসস্থান হইতে গঙ্গা প্রায় অষ্টাদশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এতদূর হইলেও জয়দেব প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে—কোনও কারণ বশত: জয়দেব একদিন গঙ্গায় যাইতে পারেন নাই, ক্ষুব্ধ ভক্তের তৃপ্তির জন্য সেদিন গঙ্গাদেবী স্বয়ং কেন্দুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। *

জয়দেব গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই—জয়-দেবের ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেবের রূপ ধারণ করিয়া জয়দেবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর গীত গোবিন্দের পুঁথিখানি খুলিয়া কি লিখিলেন। পদ্মাবতী পতির জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ভোজন করিলেন। শেষে পদ্মাবতীকে তাম্বুল রচনায় ব্যাপৃত দেখিয়া, শ্রীহরিও ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া ভোজন করিতেছেন, এমন সময়

* অজয় নদের সহিত ভাগীরথীর যোগ আছে, হয় তো সে সময়ে গঙ্গার স্রোত অজয়ের বারি স্রোতে মিশিয়া জয়দেবের কুটির প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়াছিল। জয়দেবের কোন ভক্ত তাহা দেখিয়া এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সিক্ত বেশে প্রকৃত জয়দেব উপস্থিত। জয়দেবকে দেখিয়া পদ্মাবতীও যেমন বিস্মিত হইলেন, আপনার পূর্ব্বে পত্নীকে আহার করিতে দেখিয়া জয়দেবও ততদূর বিস্মিত হইলেন। জয়দেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মাবতী বলিলেন—"ইহার পূর্ব্বে তুমি আসিয়া পুঁথিতে কি লিখিলে, তাহার পর আহার করিলে, পান না লইয়াই চলিয়া গেলে। আমি তোমার প্রসাদ ভোজন করিতেছি।" জয়দেব অধিকতর বিস্মিত হইয়া পত্নীকে বলিলেন,—"তিনি এই তো আসিতেছেন, ইহার পূর্ব্বে আসেন নাই, আহারও করেন নাই।" পদ্মাবতী পতির কথায় অবিশ্বাস করিলেন না; বাস্তবিক অষ্টাদশ ক্রোশ পথ হইতে সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন একেবারেই অসম্ভব! কিন্তু এ কি রহস্য! পদ্মাবতী স্বচক্ষে স্বামীকে আহার করিতে দেখিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহাকে পুঁথি লিখিতেও দেখিয়াছেন! এ দুর্ভেদ্য রহস্য কে ভেদ করিবে? তখন জয়দেবের মনে হইল—আগন্তুককে পদ্মাবতী লিখিতে দেখিয়াছেন, অতএব পুঁথি খুলিয়াই দেখা যাউক। পদ্মাবতীও তাহাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

পুঁথি খুলিয়া জয়দেব যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি রচনা অসমাপ্ত রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। জয়দেব দেখিলেন—সেই অসম্পূর্ণ রচনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে! তাঁহারই ইষ্টদেব তাঁহারই রূপ ধরিয়া, মানিনীর পদতলে পতিত হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"দেহি পদ পল্লব মুদারং"।

নীলাকাশে নক্ষত্র ধবল ছায়াপথের মত সেই পবিত্র করের পুণ্যাক্ষরে জয়দেবের শৃঙ্গার প্রাণ গীত গোবিন্দের মর্ম্মে মর্ম্মে—অতৃপ্ত বাসনার আকুল উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে! চির বাঞ্ছিতের চরণে জয়দেবের প্রাণের আহ্বান প্রেমের সাগর সঙ্গমে মিশিয়া গিয়াছে!

জয়দেবের সাধনা সিদ্ধ হইল। তিনি পদ্মাবতীর চরণতলে পতিত

হইয়া বলিলেন—"তোমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি প্রভুকে দেখিয়াছ, প্রভুর প্রসাদ ভোজন করিয়াছ ;—আমি হতভাগ্য—প্রভুকে দেখিয়া হৃদয়ের অনন্ত জ্বালা জুড়াইতে পারিলাম না"। জয়দেব কাঁদিয়া ফেলিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া, আত্মহারা কবি আপনার ভক্তিমূল-প্রেমব্রত উদ্‌যাপন করিলেন !

* * * *

এখনও কেন্দুবিল্ব তীর্থে জয়দেবের স্মৃতি রক্ষার জন্য বৈষ্ণবগণ একটী মেলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে—যাত্রীগণ, জয়দেবের সেই জীর্ণ পর্ণকুটিরে বৈকুণ্ঠের অনাবিল শোভা দেখিয়া মৃত্যুমলিন মানবজীবন পবিত্র করেন।

প্রেম রসিক চণ্ডীদাস

(১)

পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ভক্ত ও ঈশ্বরকে লইয়া, পতী পত্নীর মধুর প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া "রাধা কৃষ্ণের" রূপক প্রচার করেন। কিন্তু সে রূপকের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেমের উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা সাধারণের ছিল না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেম পূর্ণ কবিত্ব পূর্ণ ধর্ম্ম, সংসারের আত্মম্ভরী পোদ্দারগণ তাহা চিনিতে পারিল না। দেশে তখন পঞ্চ "ম" কারের উপাসনা চলিতেছে, পাঠানগণ তখন বঙ্গের বিধাতা পুরুষ; বাঙ্গালার তখন বড়ই দুর্দ্দিন। অসি চর্ম্মের রুদ্র স্বভাব রাজ বিপ্লবে, বাঙ্গালীর জাতীয় ও ধর্ম্মজীবন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ হীন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম প্রক্রিয়ায়, দুঃখিতের প্রাণে শান্তি মিলিত না, দুঃখিত জাতির এই অভাবের উচ্ছ্বাসেই— দুর্দ্দিনের কবি চণ্ডীদাসের জন্ম। জয়দেবের কিছু পরেই, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্বোধনের ভাব লইয়া প্রেমিক চণ্ডীদাস মর্ত্তের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে দুর্গাদাস বাগচী নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নান্নুর গ্রাম সিউড়ী হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। দুর্গাদাস বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। নলরাজা নামক জনৈক নরপতি নান্নুর গ্রামে বিশালক্ষী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, দুর্গাদাস এই দেবীর সেবাইত ছিলেন। দুর্গাদাসের বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিলে মনে হয়, তিনি দরিদ্র ছিলেন না। বাঁকুড়া জেলার ছাৎনা গ্রামে দুর্গাদাসের বিবাহ হইয়াছিল। এই পত্নীর গর্ভে অনুমান ১৩২৫শকে

ছাৎনা গ্রামে শ্বশুরালয়ে দুর্গাদাসের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সেই পুত্রই বাঙ্গলার কবি চূড়ামণি, সাধক বর "চণ্ডীদাস"।

দুর্গাদাস গোঁড়া শাক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শঙ্কর-বক্ষ-বাসিনী বিশালক্ষ্মী (বাশুলি) দেবীর পূজা করিতেন। মদ্য মাংস বিবিধ উপচারে দেবীর অর্চ্চনা হইত, এখনও নান্নুর গ্রামে দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু পূজার আর সেরূপ আড়ম্বর নাই। আগে দেবীর সম্মুখে প্রত্যহ অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ বলি হইত, এখন মহাপূজার নবমীতে ছাগ বলি হয়, কদাচিৎ মহিষ বা মেষ বলিও হইয়া থাকে। দেবীর যে দুর্ব্বার রক্ত পিপাসা রক্তবীজের শোণিত সিন্ধুতে নিবারিত হয় নাই, এখন দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, ছাগ শিশুর গণ্ডুষ পরিমিত রক্তে রাক্ষসীর রক্ত পিপাসা শান্তির ব্যবস্থা! মাতা হইয়া সন্তানের রক্ত পান না করিলে দেবীর দেবীত্ব বজায় থাকিবে কেন? এরূপ দেব মহিমা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আমরা রক্তের মত রাঙ্গা জবাফুল দিয়া দেবীর পূজা করিতে ভালবাসি। সাধকের ভক্তি থাকিলে, মা বোধ হয় ইহাতেই পরিতৃপ্ত হন।

দেবীর প্রসাদে জন্ম বলিয়া দুর্গাদাস পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখিলেন।

চণ্ডীদাস যখন বালক, তখন দুর্গাদাস সেই বালকের স্কন্ধে বংশ গৌরবের গুরুভার অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত হইলেন। পতি পরায়ণা পত্নীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের ভাগ্যে বিদ্যালাভ ঘটিল না। অধিকন্তু বামাচারীগণের সহবাসে অল্প বয়সেই তিনি মদ্যপান করিতে শিখিলেন। লোকে সোহাগ করিয়া তাঁহাকে "চ'ণ্ডে মাতাল" বলিয়া ডাকিত। এই ভাবে চণ্ডীদাসের সুকুমার শৈশব অতীত হইয়া গেল।

নান্নুর গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণগণ দয়া করিয়া পিতৃ মাতৃহীন অনাথ চণ্ডীদাসের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া দিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পূজারি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

শাক্তের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া চণ্ডীদাসের শক্তির প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। তিনি স্বর্গীয় পিতার অনুকরণে দেবীর পূজা শিখিয়াছিলেন। প্রত্যহ নিয়মিত বিশালাক্ষীদেবীর পূজা করিতেন, ভোগ রাঁধিতেন, অতিথি অভ্যাগতকে ভোজন করাইয়া নিজে প্রসাদ পাইতেন।

অনেকে বিবাহ করিবার জন্য চণ্ডীদাসকে অনুরোধ করিল, কিন্তু চণ্ডীদাস বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল চিরদিন কুমার থাকিয়া শক্তি মন্ত্রের উপাসনা করিবেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভণিতায় তাঁহার "বড়ু" উপাধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই "বড়ু" শব্দের অর্থ—"কুমার", ইহার আর একটী অর্থ আছে—পূজারি।

(২)

এই সময় নান্নুর গ্রামে রামমণি নাম্নী এক রজক রমণী বাস করিত। রামমণি যুবতী, তিন কুলে তাহার কেহ ছিল না। রামমণি জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করে নাই, সে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির মার্জ্জনা করিত। রজক-কন্যা হইলেও রামমণির স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল; ভক্তিমতী ও শুদ্ধচারিণী বলিয়া চণ্ডীদাস তাহাকে স্নেহ করিতেন।

দেশে তখন তান্ত্রিক মতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, বৈষ্ণব ধর্ম্ম তখন লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। জয়দেবের প্রেম ধর্ম্ম নূতন বলিয়া, শাক্তগণের সঙ্গে বৈষ্ণবগণের বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল। নূতন ধর্ম্মের নূতন উচ্ছ্বাসে, নূতন দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ—জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী গাহিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করিতেন, বামাচারী তান্ত্রিকগণ—এই সকল নিরীহ বৈষ্ণবকে উৎপীড়ন করিয়া নৃমুণ্ডমালিনীর জয় ঘোষণা করিত। চণ্ডীদাস বৈষ্ণবের দুর্দ্দশা দেখিতেন, তাঁহার প্রেম প্রবণ করুণ হৃদয় পর-দুঃখে গলিয়া যাইত। তিনি সেই লাঞ্ছিত বৈষ্ণব ভিক্ষুককে কাছে বসাইয়া আশ্বাস দিতেন, তাহাদিগের গান শুনিয়া তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া

সম্মানের সহিত বিদায় দিতেন। এইরূপে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাঁহার সাহচর্য্য ঘটিতে লাগিল। শাক্ত চণ্ডীদাস ক্রমে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি শক্তির সেবাইত, পাছে বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ দেখাইলে শাক্তগণের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়—এই আশঙ্কায় চণ্ডীদাস ইতস্তত: করিতেছিলেন। শাক্তগণ কুপিত হইলে তাঁহাকে বিষম বিপন্ন হইতে হইবে, অন্নের সংস্থান জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে, বিশেষত: পিতৃধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। অনেক ভাবিয়া চণ্ডীদাস বামাচার ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

একদিন চণ্ডীদাস স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন—একটী প্রফুল্ল পদ্ম-কোরক স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। চণ্ডীদাস সযত্নে ফুলটী সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মন্দিরে আসিয়া ঐ ফুলটী চন্দন মিশ্রিত করিয়া বিশালাক্ষীদেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। রাত্রিকালে দেবী চণ্ডীদাসকে স্বপ্ন দিলেন—"ভক্ত চণ্ডীদাস! আজ তুই যে ফুলটী আমার পদে অর্পণ করিয়াছিস্—তাহা বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণু আমার গুরুর গুরু—আমি সে ফুলটী মস্তকে ধারণ করিয়াছি।" পরদিন প্রত্যূষে—চণ্ডীদাস মন্দিরে গিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই সেই চন্দন লিপ্ত পদ্ম কোরক বিশালাক্ষীর মস্তকে উজ্জ্বল পদ্মরাগের মত শোভা পাইতেছে! চণ্ডীদাসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। চণ্ডীদাস বুঝিলেন—আমার মায়ের চেয়ে তবে তো বিষ্ণুই বড়। সেই দিন হইতেই চণ্ডীদাস বিষ্ণুভক্ত হইলেন। তিনি বিশালাক্ষীর মধ্যে—কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আর ভেদ জ্ঞান রহিল না, ভক্তের সরল হৃদয় কালী কালা এক হইয়া, প্রয়াগের মত গঙ্গা যমুনায় মিশিয়া গেল। চণ্ডীদাস দেবীর পূজা করিতেন, কিন্তু যূপবদ্ধ ছাগ শিশুর মৃত্যুগন্ধি আর্ত্তনাদে—তাঁহার নয়ন যুগলে নির্ঝরিণীর সৃষ্টি হইত। তিনি বলি দেখিতে পারিতেন না। শাক্তগণ, বামাচারী

চণ্ডীদাসের এই অপরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, চণ্ডীদাসের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। চণ্ডীদাসও বুঝিলেন—শাক্তগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, সুতরাং তাঁহার জীবনে অশান্তির কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, এই শাক্ত রোষ শীঘ্রই তাঁহার ভাগ্যাকাশে বজ্রানলের রেখা টানিয়া, রন্ধ্রগত শণি গ্রহের ন্যায় তাঁহার সকল সুখ নিষ্ঠুর হস্তে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

শাক্তগণকে প্রতারণা করিবার জন্য চণ্ডীদাস এক অপূর্ব্ব কৌশলের সৃষ্টি করিলেন। সে কৌশল অপাপবিদ্ধ ভক্তের কৌশল। সে কৌশল কবিজনোচিত কৌশল। চণ্ডীদাস স্বয়ং তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

শাল তোড়া গ্রাম, অতি পীঠস্থান, নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা সহচরী, বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাশুলী, প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে, নিদ ভাঙ্গিল, পিরীতি হইল সুরু॥

বাঁকুড়া জেলার শাল তোড়া গ্রামে "নিত্যা" নাম্নী বনদেবী ছিলেন, ঐ বনদেবীর "বাঁশুলী" নাম্নী এক ডাকিনী সঙ্গিনী ছিল। নিত্যাদেবী বড় "ঝুমুর" শুনিতে ভালবাসিতেন। একদিন দেবীর ইচ্ছা হইল রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার গান শুনিবেন। বোধ হয় দেবীর ঝুমুরে অরুচি হইয়াছিল। দেবী সহচরী বাশুলীকে মনের অভিপ্রায় জানাইলেন। বাশুলী বলিল—"বৃন্দাবন লীলা শুনাইবে কে? তেমন মধুরকণ্ঠ গায়ক, তেমন অকপট ভক্ত কবি—কাহাকেও তো দেখিতে পাই না মা!" দেবী আদেশ করিলেন—"লীলারসজ্ঞ ভক্তের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তুমি এখনি যাও—আমি বৃন্দাবন-লীলা অবশ্যই শুনিব।" বাশুলী আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না; সে অবিলম্বে শাল তোড়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বাশুলী অনেক দেশ ঘুরিল, কিন্তু মনের মত কাহাকেও পাইল না। অবশেষে—নান্নুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। চণ্ডীদাসের দেবমূর্ত্তি দেখিয়া বাশুলী বুঝিল—"এই ব্যক্তিই লীলা মাধুর্য্য প্রচারের যোগ্যপাত্র। কিন্তু এ ব্যক্তি দেখিতেছি—শক্তি প্রতিমার পূজারি, শাক্তের মুখে বৈষ্ণব তত্ত্ব ভাল করিয়া পরিস্ফুট হইবে না। অতএব চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব মতের সহজ সাধনায় দীক্ষিত করা যাউক্।

সারা দিবসের পরিশ্রমের পর চণ্ডীদাস তখন নিদ্রা দিতেছিলেন। বাশুলী ডাকিনী নিদ্রিত চণ্ডীদাসের পৃষ্ঠে সজোরে এক চাপড় বসাইয়া দিল। দারুণ চপেটাঘাতে শিহরিয়া উঠিয়া চণ্ডীদাস শয্যার উপর-উঠিয়া বসিলেন। সুপ্তোত্থিত চণ্ডীদাসকে ডাকিনী আত্ম পরিচয় প্রদান করিল, দেবীর আদেশও জানাইল। চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা প্রচারে সন্মত হইলেন, বলিলেন—"লীলা প্রচারের পূর্ব্বে আমাকে বৈষ্ণব তত্ত্বের গূঢ় রহস্য জানিতে হইবে। বৈষ্ণব মন্ত্রে কে আমায় দীক্ষিত করিবে?" ডাকিনী উত্তর দিল—"রামমণি"।

উত্তর শুনিয়া চণ্ডীদাস আশ্চর্য্য হইলেন। রজক-কন্যা রামমণি ব্রাহ্মণের দীক্ষা গুরু হইবে? ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসের উপদেষ্টা—রামমণি? মন্ত্র লইতে গেলে রামমণির সঙ্গে একত্র থাকিতে হইবে, তাহা হইলে লোকেই বা কি বলিবে? কাতর কণ্ঠে চণ্ডীদাস ডাকিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে—
কোন্ বরণ হব?"

ডাকিনী হাসিয়া উত্তর দিল—

"শুনহ দ্বিজ!
কহিব তোমারে সাধন বীজ।"

ডাকিনী চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম শুনাইল। তার পর রামমণির সহিত প্রবর্ত্ত হইয়া "সহজ ভজন" সাধনের উপদেশ দিয়া, শূন্যে মিশিয়া অন্তর্হত হইল।

(৩)

সেই রাত্রেই চণ্ডীদাস রামমণির কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামমণি তখন মন্দির কুট্টিমে শয়ন করিয়াছিল। শুক্ল পঞ্চমীর খণ্ড চন্দ্র-রশ্মি রামমণির সুন্দর মুখ খানির উপর পড়িয়া তাহার উৎফুল্ল যৌবন-শ্রীকে আলোক রঞ্জিত করিতেছিল। শুক্ল জ্যোৎস্নায়, শুক্ল বসনা সুন্দরীকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণ প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার মধুর সৌরভ মাখিয়া, অলস সমীরণ যুবতীর চূর্ণ কুন্তল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, অনন্ত নীলাম্বর হইতে সসীম বসুন্ধরার শেষ প্রান্তটী পর্য্যন্ত—সর্ব্বত্র অখণ্ড শান্তি বিরাজিত! তখন, সেই শান্তিময়ী প্রকৃতির বুকে শায়িতা, সাক্ষাৎ শান্তির প্রতিমা সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া শান্তি প্রয়াসী চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন—

"শুন রজকিনী রামী!
ও দু'টী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।"

রামীকে রাধারূপে কল্পনা করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণ লীলার আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। চণ্ডীদাস বাহ্যজ্ঞান শূন্য—তন্ময়!

চণ্ডীদাসের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে শাক্তগণ হাড়ে হাড়ে চটিল। ধোপানীর প্রতি ব্রাহ্মণ সন্তানের অনুরাগ—সমাজ ক্ষমা করিতে চাহিল না। ব্রাহ্মণেরা পরামর্শ করিলেন—চণ্ডীদাস যখন রামীর প্রতি আসক্ত, তখন সে পতিত, এরূপ চরিত্র হীন ব্রাহ্মণের দ্বারা কেমন করিয়া দেবীর পূজা হইবে? লোকে চণ্ডীদাস ও রামমণির অপবাদ রটনা করিতে লাগিল।

সাধারণের চক্ষে ঘৃণীত হইয়া ভক্ত চণ্ডীদাস পুরোহিতের অধিকার চ্যুত হইলেন। রামী মন্দির হইতে তাড়িতা হইল।

এইরূপ অতর্কিত বিপদে বিপন্ন হইয়া অশ্রুমুখী রামমণি চণ্ডীদাসকে বলিল—

"কি কহিব বঁধুহে! কহিতে না জুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায়॥
অনামুখ মিন্সে গুলার কিবা বুকের পাটা।
দেবী পূজা বন্ধ করে কুলে দেয় বাটা॥
ঢাক বাজিয়ে সহজ বাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে!
চ'ক্ষে না দেখিয়া মিছা কলঙ্ক রটায় হে॥

প্রেমিকার আক্ষেপ শুনিয়া চণ্ডীদাস কহিলেন—

"রূপিলে বিষের গাছ হৃদয় মাঝারে।
গরলে জারল অঙ্গ দোষ দিবে কারে?
ইন্দ্র আদি করি, সুর নর দানব,
তিন পুর জিনিল দশ মাথে।
বিশ বাহু পর বিজয় ধনুর্ধর,
নৃপতি নিশাচর নাথে॥
সোহি লঙ্কাপতি, দৈবে হরল মতি,
বিপদ সময় যব ভেলা।
রতন মুকুট পর বনচর বানর—
চরণ ঘাত কত দেলা!!"

যখন রাবণেরই এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তখন আর অন্য পরে কা কথা? আমাদের "শ্যাম কলঙ্কী" অপবাদই ভাল!"

এই কথাতেই রামমণি প্রবোধ পাইল। তখন উভয়ে মিলিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে নির্জ্জন মাঠের মাঝে পর্ণ কুটির রচনা করিয়া, চণ্ডীদাস সহজ সাধনায় মত্ত হইলেন।

(৪)

অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত ঘটে। উভয়ের অন্ন সংস্থানের আশায় ভিক্ষা করিবার জন্য রামমণি গ্রামান্তরে চলিয়া গেল, বলিয়া গেল—তাহার ফিরিয়া আসিতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। চণ্ডীদাস কুটিরে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীরা সকলে গিয়াও তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল।

অনশনে থাকিয়া চণ্ডীদাস পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। চণ্ডীদাস পিপাসায় অস্থির হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে কাতর ভাবে মুহুর্ম্মুহুঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ দূর হইতে সে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। দু'একজন নিকটে আসিয়া উকি মারিয়া চণ্ডীদাসের শোচনীয় অবস্থা দেখিল, কিন্তু কেহই সেই আসন্ন মরণ ব্রাহ্মণের ক্ষুধার্ত্ত মুখে একবিন্দু "পিপাসায় জল" দিল না। পিশাচেরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া—হতভাগ্য ব্রাহ্মণের যম যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল! কাহারও দয়া হইল না, এমনি সমাজপতির কঠোর শাসন যে, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্ভ্রম অখ্যাত রাখিবার জন্য, জন্মদাতা স্নেহময় পিতা, একাদশীর দিনে বাল-বিধবার শুষ্ক প্রাণে জলবিন্দু প্রদানে অগ্রসর হ'ন না, সেই হিন্দু কি চণ্ডীদাসের অন্তিমকালে উদার করুণার মুক্তহস্ত প্রসারিত করিতে পারে? তাহ'লে যে শাস্ত্রের মর্য্যাদা থাকিবে না!!

এইভাবে দুই দিন কাটিল। তৃতীয় দিবসের প্রভাতে চণ্ডীদাসের কুটির নিস্তব্ধ হইল। কোনও সাড়া শব্দ না পাইয়া দু'একজন প্রতিবেশী দেখিতে আসিল; আসিয়া কি দেখিল?—এক বিন্দু জলের অভাবে দরিদ্র ব্রাহ্মণের হৃৎপিণ্ডের গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, হতভাগ্যের প্রাণশূন্য শবদেহ—কুটিরের মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যাইতেছে।

গ্রামে শবদেহ পড়িয়া থাকিলে নিজেদেরই অমঙ্গল হইবে—এই ভয়ে গ্রামবাসীগণ চণ্ডীদাসের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। চিতা সজ্জিত

হইল, চিতার উপর শব স্থাপন করিয়া, চিতায় অগ্নি সংযোগের উদ্যোগ করিল।

ঠিক্ এই সময়—আলুথালু বেশে রুক্ষকেশা রোরুদ্যমানা রামমণি—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে শ্মশানে উপস্থিত হইল। বিয়োগবিধুরা রামমণি উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

"কোথা যাও ওহে প্রাণ বঁধু মোর! দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হ'তে এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি॥"

রামীর বিলাপে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চণ্ডীদাস চিতার উপর উঠিয়া বসিলেন। শবদেহ বহন-কারীরা মনে করিল—ব্রাহ্মণকে বুঝি "দানায়" পাইয়াছে! তাহারা শ্মশান ছাড়িয়া পলায়ন করিল। চণ্ডীদাসকে জীবিত দেখিয়া রামী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। চণ্ডীদাস রামীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"এদেশে রবনা সই! দূর দেশে যাব।"

তখন, সন্ধ্যার ধূসররাগে পশ্চিম দিক্ রঞ্জিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস রামীর সঙ্গে কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রে উভয়ের অনেক কথা হইল। চণ্ডীদাস সঙ্কল্প করিলেন—প্রভাতে তাঁহারা অন্য গ্রামে যাত্রা করিবেন। রামী আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল।

(৫)

সেই রাত্রে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

বিজয় নারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন বিশালাক্ষী দেবী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—"ওরে পিশাচ! তোরা আমার সেবক সেবিকার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়াছিস, তোদের উৎপীড়নে তাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে! এই পাপে

তোদের সর্ব্বনাশ হইবে। যদি মঙ্গল চাস্—এইবেলা সকলে মিলিয়া চণ্ডীদাস ও রামমণিকে প্রসন্ন কর্।”

চক্রবর্ত্তী প্রভাতে সকলের কাছে স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীদাসকে সমাজচ্যুত করিবার নেতা ছিলেন—এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়। গ্রামের সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল। তাঁহার কথায় কাহারো অবিশ্বাস রহিল না। চক্রবর্ত্তী গ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়া চণ্ডীদাসের শরণাগত হইলেন। করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। উদার প্রেমিক চণ্ডীদাস সকলকেই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। এইখানেই চণ্ডীদাসের মহত্ত্ব, যিনি শত্রুকে এমনভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিতো দেবতা। “এমন দেবতার সঙ্গে কি ব্যবহারই করিয়াছি”—ইহা ভাবিয়া, স্ব স্ব কৃতকার্য্য স্মরণ করিয়া গ্রামবাসীগণ লজ্জায় অধোবদন হইল! সেই দিন, নান্নুরের সেই পবিত্র মাঠে, তাহারা চণ্ডীদাসের কাছে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিল। চণ্ডীদাসের প্রধান শিষ্য হইলেন—স্বয়ং চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

ক্রমে, চণ্ডীদাসের পুনর্জীবন প্রাপ্তির অলৌকিক কাহিনী দেশ বিদেশে প্রচার হইয়া পড়িল। লোকে বুঝিলেন চণ্ডীদাস ও রামমণি সামান্য নর-নারী নহেন। চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্য শুনিয়া, কবিবর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পতিতপাবনী জাহ্নবীর পুণ্যতীরে, শ্যামপত্র বহুল বটবৃক্ষ মূলে—এই দুই অপূর্ব্ব প্রেমিক পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন!

(৬)

বৈষ্ণব কবি জয়দেবের কণ্ঠ হইতে যে অপার্থিব প্রেম সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব রাগিণীর অমিয়স্বরে, ললিত পঞ্চমে কণ্ঠ মিলাইয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা গাহিয়াছিলেন। আজ ভারতের দেশে দেশে চণ্ডী-দাসের মধুর গান প্রভাত সন্ধ্যায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রেম ও

মোহের পার্থক্য বুঝিয়া, চণ্ডীদাস প্রেমের নাম রাখিয়াছিলেন—"পিরীতি"। প্রেমিক চণ্ডীদাস প্রেমের বলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য রত্ন। সে পদাবলীর প্রত্যেক পদ—আবেগে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ! চণ্ডীদাসের কবিতা—বসন্তানিল তাড়িতা পুষ্পময়ী প্রিয়ঙ্গুলতা! চণ্ডীদাস বুঝিয়াছিলেন, প্রেমের অর্থ—স্বার্থত্যাগ। তাই রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রেমের আদর্শে, আপনার জীবন গঠন করিয়া, তিনি বৈষ্ণব জগতে আপনার হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত দেখাইয়া গিয়াছেন। আজ কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায় চণ্ডীদাসেয় পদাবলীকে অশ্লীল বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু, চণ্ডীদাসের অশ্লীলতা—অসুন্দর বা জুগুপ্সাজনক নহে। চণ্ডীদাসের "আদিরস" দেহের সঙ্গে পুড়িয়া যায় না, সে আদিরস প্রেমিকের প্রেমলীনতা। চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে—তাঁহারই নিজ জীবনের সত্যের অনুভূতি, তিনি দুঃখের কবি। তিনি প্রেমকে "জগৎ" বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই অনন্ত প্রেমের সাধনা করিয়া, তিনি নিজের ইষ্টদেবকে কখনও "গোয়ালিনী" কখনও বা "নাপিতানী" সাজাইয়া বৈষ্ণবকে বিষ্ণু ভক্তি শিখাইয়া গিয়াছেন।

শৈশব হইতেই চণ্ডীদাসের সঙ্গীতে আসক্তি ছিল। তিনি যেমন উচ্চদরের সাধক, উচ্চদরের কবি ছিলেন, তেমনি উচ্চদরের গায়কও ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিলে, অতি পাষাণ হৃদয় পাষণ্ডও কাঁদিয়া ফেলিত। চণ্ডীদাস যদি পদ রচনা করিয়া ব্রজের গুহ্যাতিগুহ্য মধুর রস গীতচ্ছন্দে প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে ভক্তগণ মধুর রসের আস্বাদ বুঝিতে পারিতেন না।

শেষ জীবনে, ১৩৯৯ শকে, মহাত্মা চণ্ডীদাস বৃন্দাবন ধামে—সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে।

বৃন্দাবনে রামীরও মৃত্যু হইয়াছিল।

ভক্ত কবি বিদ্যাপতি

(১)

উত্তরে তুষার-মণ্ডিত নগরাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে বিষ্ণু-পদোদ্ভবা পুণ্য-সলিলা ভাগীরথি, পূর্ব্বে লোক-প্রসিদ্ধ কৌশিকী-ধারা, পশ্চিমে শীকর সুশীতলা গণ্ডকী, এই চতুঃসীমা বদ্ধ ভূভাগ—যাহা জনক গৌতমাদি রাজর্ষি মহর্ষিগণের অমানুষিক লীলার কেন্দ্রস্থান—সেই অভ্রভেদী মণিময় প্রাসাদমালা-ভূষিতা সমৃদ্ধিময়ী মিথিলা নগরীর মধ্যে কমলা নদীর তীরস্থিত গড় বিসপীগ্রাম, ভক্ত-চুড়ামণি কবিকুল-কেশরী বিদ্যাপতির জন্মস্থান।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞান-গরিমায়, রাজ-সম্মানে,—একদিন এই "ঠাকুর বংশ" মণিহারের মধ্যমণির ন্যায় উজ্জ্বল প্রভায় বিসপী গ্রাম আলোক দীপিত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির পিতৃদেব গণপতি ঠাকুর মহারাজ গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাস্বর প্রতিভায় "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীর" জন্ম। পিতামহ 'জয়দত্ত' ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য ইহলোকে "যোগীশ্বর" উপাধি পাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির প্রপিতামহের নাম বীরেশ্বর। বীরেশ্বর মিথিলেশ্বর কামেশ্বরের বিশেষ বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহার কল্পনাপ্রসূত "বীরেশ্বর পদ্ধতি" নামক গ্রন্থ অনুসারে অদ্যাবধি মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণগণ দশকর্ম্ম-সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই আজন্ম পুণ্যপ্রথিত বরেণ্য ঠাকুরবংশে, অনুমান ২৪১ লক্ষ্মণ সম্বতে * বিদ্যাপতি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।

* Prof Kielhoruএর মতে ১১১৯ খঃ ৭ই অক্টোবর

বিদ্যাপতির বাল্য-জীবনী জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন-চরিত জনশ্রুতির মুখে পল্লবিত। কিন্তু তাঁহার অমর কাব্যের প্রত্যেক পদাবলীতে রাজাশিবসিংহের প্রভাব বড় বেশী। এই রাজা শিবসিংহ ২৯৩ লক্ষ্মণসম্বতের চৈত্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষীয়া ষষ্ঠী তিথিতে, বৃহস্পতি বারে মিথিলার সিংহাসনে অভিষিক্ত হ'ন। সে সময় বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য প্রভাবে—মিথিলা গৌরবময়ী। রাজ্য গ্রহণের চারি মাস পরে, রাজা এই ঠাকুরকুল-তিলক বিদ্যাপতিকে আপনার সভায় সমাদরে আহ্বান করেন। বিদ্যাপতি রাজ-সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা বুঝিলেন,—এ ব্রাহ্মণ শুধু নীরস বিতণ্ডায় অনুপ্রাণীত কঠোর পণ্ডিত নহে, ব্রাহ্মণ দেব-দুর্লভ কবিত্ব রসের প্রকৃত অধিকারী! রাজা গুণীর গুণের সম্মান রক্ষা করিলেন; বিদ্যাপতিকে "অভিনব জয়দেব" উপাধি দিয়া, বিসপী গ্রাম দান করিয়া, আপনার সভাপণ্ডিতের উচ্চপদ প্রদান করিলেন। বিদ্যাপতিও সস্ত্রীক রাজাশ্রয়ে বাণী আরাধনার সুযোগ্য অবসর প্রাপ্ত হইয়া কাব্যের অরুণ-রাগে রাজ-সভাকে কোকনদের মত শতদলে প্রস্ফুটিত করিলেন।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ শৈব ছিলেন। বলা বাহুল্য আশৈশব বিদ্যাপতিও কৈলাসনাথ "বাণেশ্বরকে"কে আপনার হৃদয়ের মর্ম্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার "শিবভক্তি" জনসমাজে তাঁহাকে দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় মহত্ব দান করিয়াছিল। এমনকি প্রবাদ আছে যে, বিদ্যাপতির ভক্তিবলে আকর্ষিত হইয়া স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব ছদ্মবেশে বিদ্যাপতির দাসত্ব করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির এক ভৃত্য ছিল, তাহার নাম "উগনা"। একদিন এই ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি স্থানান্তরে যাত্রা করেন। আতপ-তাপিত নিদাঘ-তপ্তিত ধূলি-সমাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে বিদ্যাপতির অত্যন্ত পিপাসা পাইল, তিনি তৃষিতকণ্ঠে ভৃত্যের কাছে বারি প্রার্থনা করিলেন। ভৃত্য উগনা—প্রভুর নয়নান্তরালে আত্মগোপন করিয়া

আপনার শিরস্থিত জটার ভিতর হইতে জল বাহির করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। বিদ্যাপতি জলপান করিয়া বিস্মিতভাবে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ জল তুমি কোথায় পাইলে? এ যে মন্দাকিনীর মদগর্ব্বিত স্নিগ্ধ, শীতল নির্ম্মল জল; এখানে তো গঙ্গা নাই—তবে গঙ্গাবারি কোথা হইতে আনিলে?" উগনা কোনও উত্তর দিল না। বিদ্যাপতিও ছাড়িবার পাত্র নহেন। প্রভুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গত্যন্তর বিহীন ভৃত্য, শেষে আপনার জটা হইতে জল বাহির করিয়া দেখাইল! তখন এই ভৃত্যকে সাক্ষাৎ শঙ্কর জানিতে পারিয়া ভৃত্যের পাদমূলে পতিত হইলেন। ভৃত্যরূপী শিব বিদ্যাপতির হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"বিদ্যাপতি! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু দেখিও—এ কথা জনসমাজে প্রকাশ করিও না, প্রকাশ হইলে আর আমি তোমার গৃহে থাকিব না।" উগনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, বিদ্যাপতি অনেক স্তবস্তুতি করিয়া, উগনাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। কিছুদিন এইরূপে কাটিল।

বিদ্যাপতির পত্নীভাগ্য অনুরূপ ছিল না। কথিত আছে—এই রমণী অত্যন্ত কোপন স্বভাব ও মুখরা ছিলেন।

একদা ব্রাহ্মণী উগনাকে কোনও দ্রব্য আনিতে আদেশ করেন। প্রভুপত্নীর আদিষ্ট পদার্থ লইয়া ফিরিয়া আসিতে উগনার একটু বিলম্ব হইয়াছিল। এই তুচ্ছ অপরাধে ব্রাহ্মণী নারিসুলভ কোমলতায় বিসর্জ্জন দিয়া, সরোষে যষ্টিহস্তে উগনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাপতি বাটিতেই ছিলেন। তিনি পত্নীর পুংস্কোকিল বিড়ম্বিনী আততায়ী চীৎকার শুনিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার রোষপরায়না পত্নী প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া উগনাকে লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া আপনার প্রভুত্ব দেখাইতেছেন। উগনার লাঞ্ছনা দেখিয়া বিদ্যাপতি ছুটিয়া আসিলেন, পত্নীর দৃঢ়হস্ত হইতে কুলিশ কঠোর

যষ্টি কাড়িয়া লইলেন; বলিলেন,—"কি করিতেছ? কাহার অঙ্গে প্রহার করিতেছ? উগনা সামান্য ভৃত্য নহে—উগনা সাক্ষাৎ শিব।" পত্নীর ব্যবহারে বিদ্যাপতির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, আত্ম-বিস্মৃত বিদ্যাপতি উগনার পরিচয় পত্নী-পাশে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। উগনাও— সেই স্থান হইতে বিদ্যুৎচকিত গতিতে অন্তর্হিত হইলেন।

উগনাশোকে উন্মাদ বিদ্যাপতি নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলেন;—

উগনা মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা কি শিব দহু ভেলা॥
ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বৈসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ॥
জে মোর কহতা উগনা উদেশ।
তাহি দেবঁও কর কঙ্গলা বেশ॥
নন্দন বনমে ভেটল মহেশ।
গৌরি মন হরখিত মেটল কলেশ॥
বিদ্যাপতি ভন উগনা সো কাজ।
নাহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ॥

(৩)

তরুণ বয়সে বিদ্যাপতি "কীর্ত্তিলতা" ও "কীর্ত্তিপতাকা" এই দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে সুমধুর মৈথিলি ভাষায় কাব্য রচনা করেন। তাঁহার "পুরুষ পরিকা" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ—সাহিত্য জগতের জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র।

বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণবধর্ম্মী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু মিথিলায় তাঁহাকে সকলেই শৈব বলিয়া জানে। জয়দেবের যেমন কান্ত-পদাবলী মুরলীর প্রেম নিস্বনে বিদ্যাপতির শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল। কৃষ্ণ লীলার আস্বাদ পাইয়া বিদ্যাপতির কচি হৃদয় ভাব মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই সময় হইতেই তিনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব অন্বেষণ করেন। তাঁহার কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী—ঐ সময় হইতেই প্রেম মহিমায় মণ্ডিত হইয়া জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিদ্যাপতির করুণ রসাভিষিক্ত আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ পদাবলী শুনিয়া—একদিন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য দেবও দিব্যোন্মাদ হইয়াছিলেন। এতদপেক্ষা তাঁহার পদাবলীর প্রশংসা আর কি হইতে পারে? বিদ্যাপতি-পদাবলী—লালসা বিরহে তন্ময় হইয়া বৈষ্ণবগণের ধমনীতে স্রোতের সহিত তরল প্রেম মিশাইয়া দিয়াছিল। সে পদাবলী বুঝি পৃথিবীর নহে,—অপ্সরার চরণ সিঞ্চিতের গুঞ্জনমিশ্রিত স্বর্গীয় সঞ্জীবনী সুধায় অভিষিক্ত,—দেবেন্দ্রের প্রসাদে প্রফুল্ল!!

বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। বৈষ্ণবগণ—তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদিগের গুরুস্থানীয় হইয়াও বামন ও "বৈষ্ণবত্বের" গোঁড়ামী করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মীকের মত তিনি হরি হরকে অভিন্ন ভাবিতেন। সে মহৎ হৃদয়ে—ভেদ জ্ঞানের লঘুতা কখনও স্থান পায় নাই। তাঁহার নিম্নলিখিত পদটীই তাহার প্রমান;—

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খন পীত বসন খনহি বঘছা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজচারি।
খন শঙ্কর খন দেব মুরারি॥

খন গেকুল ভএ ভরাবথি গায়।
খন ভিখ মাগিয়া ডমরু বজায়॥
খন গোবিন্দ ভএ লিয় মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁধ বোকান।
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
ও নারায়ণ ও শূলপাণী॥

(৪)

বিদ্যাপতির বহু পদের ভনিতায় শিব সিংহ ও তাঁহার পত্নী লছিমা দেবীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর "চণ্ডীদাস ও রামীর সহজ সাধনের মহিমার সাধারণেই তখন "রাধাকৃষ্ণ তত্বে" নায়ক নায়িকার ইন্দ্রিয় বিলাসের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাপতির পদে—নায়িকা সম্ভি সম্ভাষণ শুনিয়া লোকে লছিমা দেবীর প্রতি বিদ্যাপতির প্রেমাসক্তি কল্পনা করিয়াছিল। শুধু কল্পনা নয়, এমনকি হলাহল-প্রসবিনী খলের জিহ্বা—এই ঘটনায় রাজা শিবসিংহের আদেশে বিচার-পতির শূলদণ্ডে মৃত্যুসংবাদ রটনা করিতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তবে এ কলঙ্কের মূল কি? বিদ্যাপতি, শিবসিংহের আশ্রিত ছিলেন। সর্ব্বজীবে স্নেহশীলা সাধ্বী লছিমা দেবীকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করিতেন। রাজা ও রাণী মধুর রসাশ্রিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন, রাজাজ্ঞায় বিদ্যাপতি সঙ্গীত রচনা

করিতেন। রাজদম্পতি অন্তঃপুরে বিশ্রাম-সুখ কামনায় উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত-রসিকা পুরন্ধ্রিগণ সেই সকল পদাবলী গান করিত। এই কারণে পদাবলীতে কবি অপূর্ব্ব কৌশলে রাজা ও রাণীর নাম সংযুক্ত করিয়া দিতেন। সাধারণ লোকে কবি কৌশলের মর্ম্ম না বুঝিয়াই—বিদ্যাপতির সঙ্গীতে মদন বিকারের বিকট গন্ধ অনুভব করিয়াছিল।

(৫)

মিথিলায় প্রবাদ আছে,—একবার রাজা শিবসিংহ সম্রাটের কোপে পতিত হইয়া দিল্লীতে বন্দী হ'ন। রাজার সঙ্গে রাজকবি বিদ্যাপতিও দিল্লীগমন করিয়াছিলেন। রাজাকে সম্রাট্ বন্দী করেন; বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব কবিত্বময়ী সঙ্গীত শুনিয়া দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পুত্র ও কন্যা হইয়াছিল। পুত্রের নাম হরপতি। ৩২৯ লক্ষ্মণ সম্বতে, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে কবিরাজ রাজমুকুট বিদ্যাপতির লীলা অবসান হয়। প্রফুল্লমুখে আত্মীয় স্বজনের কাছে অন্তিমবিদায় লইয়া, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া জীবনের সায়াহ্নে, গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে বিদ্যাপতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

* * * *

বাজিতপুরের যেস্থানে বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল, সেস্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবির বংশ এখনও সৌরাট্ প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। কবিকে রাজা শিবসিংহ যে বিসপী গ্রাম দান করিয়াছিলেন, ১২৫৭ সালে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

(১)

আত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। যোগের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাধাকৃষ্ণ লীলায় প্রকাশ। রাধা প্রকৃতির পরমতত্ত্ব, কৃষ্ণ পুরুষের রূপ; প্রকৃতি-পুরুষের আসক্তির নাম—রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। সংসারের কুটিলতা ও মায়া হইতে আত্মা যখন পরিব্রাজিত হ'ন—তাহার নাম ব্রজভাব। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন—বৃন্দাবন ধামে! যতদিন আত্মার সংসার-বীজ সমস্ত না নষ্ট হয়, ততদিন আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই সংসারিকতা নির্ব্বাণের জন্যই কৃষ্ণ-বিরহ।

পুরুষ প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ ভাবই জগৎসংসার। জগতেই উভয়ের আসক্তি, বিচ্ছেদেই উভয়ের মুক্তি। রাধার শত বৎসরের বিচ্ছেদে—জীবাত্মার শত বৎসরের অনাসক্তিতে—মুক্তির আবির্ভাব! যোগের এই নিগূঢ় তত্ত্ব এক একটী করিয়া অবয়বী কল্পনায় কৃষ্ণলীলায় মূর্ত্তিমান! যোগের জীবাত্মা পরমাত্ম-তত্ত্বের সমস্ত স্তরই কৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি;—

কৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তিনি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ, প্রকৃতিতে অনাসক্ত, তখন তিনি জগতের হিতকারী। প্রজাপালনরূপে গোপালনে কৃষ্ণ, সংসার-গোষ্ঠে বিহার করেন। নন্দ-যশোদার স্নেহানুরাগে শ্রীহরি ক্ষীর নবনীতে হৃষ্ট, তার পর রাধার প্রেমানুরাগে—হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার ফুলচন্দনে চর্চ্চিত। পাঠক মহাশয়! ব্রজলীলার উপাখ্যানগুলি

স্মরণ করুন। বাৎসল্য ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া অনুরাগে প্রগাঢ়তর, সেই অনুরাগ আবার রাধার প্রেমে প্রগাঢ়তম। যে অনুরাগ সংসার মায়ার উপর বিজয়ী, সেই অনুরাগ রাধার অনুরাগ, সেই অনুরাগ যোগীর ঈশ্বরানুরাগ। এই অনুরাগের ক্রম স্ফূর্ত্তি যোগতত্ত্বে অনুভব করা যায়।

প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ, স্ত্রী-পুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুরাগে—কিরূপে রাধাকৃষ্ণলীলায় পরিণত হইয়াছিল, উপরে সংক্ষেপে তাহা বুঝাইলাম। বৈষ্ণবের হৃদয়, প্রেমে, অনুরাগে, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব রাধার প্রেমাদর্শে আপনার হৃদয় গঠিত করেন, কৃষ্ণের জন্য লালায়িত হন, ভক্তের অনুরাগ ভালবাসেন। রাধা মানবপ্রকৃতির পরমেশ্বরী। রাধা—রাধার অমানুষ দেবতুল্য প্রেম—বৈষ্ণবের জপমালা। বৈষ্ণব সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, সমস্ত জীবনকে কৃষ্ণপ্রেমে উৎসর্গ করেন। বৈষ্ণবের ভক্তি প্রথমে জয়দেবের পদাবলীতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণবানুরাগের বাসন্তি বিকাশ—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। প্রেমের উল্লাস, প্রেমের মুগ্ধতা কৃষ্ণলীলাচ্ছলে ততদিন বঙ্গদেশকে মুঞ্জরিত করিয়াছিল। সেই মুঞ্জরিত কুসুম—শ্রীমতী রাধা সুন্দরী। রাধার অনুরাগ, ঐকান্তিকতা, উন্মত্ততা, মধুরতা—আত্মহারা জয়দেব পদ্মাবতীতে দেখিয়াছিলেন, প্রেমিক বিদ্যাপতি লছিমা দেবীতে কল্পনা করিয়াছিলেন। মাতোয়ারা চণ্ডীদাস রামমণি রজকিনীতে উপভোগ করিয়াছিলেন।

ভক্তি—ভগবানের আদরের জিনিষ। সেই আদরেই রসময়ী কল্পনা—মান। প্রেমের সহিত প্রেম আকৃষ্ট হইবে বলিয়া—শ্রীমতী মালিনী। প্রেমের পরিপুষ্টি সাধনের বিশিষ্ট উপায়—বিরহ। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বিরহে বড় উন্মত্ত। এই তন্ময়তা কিন্তু সাধারণে বুঝিল না।

তাহারা রাধাকৃষ্ণ লীলার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখিতে পাইল। রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসে শ্যামাবির্ভাবের স্বপ্নচিত্র—মানবলীলার প্রেমে পরিণত হইল। রাধাকৃষ্ণের লীলা অসংখ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ—নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি করিল।

তান্ত্রিকগণ আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। লোকে ঘোর কল্পনার প্রহেলিকার মধ্যে নিপপতিত হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাধি পূর্ণ বিকারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল! মধুর ভক্তিতত্ত্ব—নারদ গর্গাদি মহাজ্ঞানীর কথা ছাড়িয়া দাও, গোপিকাগণও যে ভক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তরিয়া গিয়াছিল, সেই ভক্তিতত্ত্বও বিকৃত বুদ্ধি নরনারীর কাছে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিতের অভাব ছিল না, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কাজেই শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল না।

ইহার কারণ বৈষ্ণবগণ বৈদিক ঋষিরপরিতর্পণ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া ভক্তিলাভ করিতেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন। তাহার ফলে বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। পণ্ডিতগণ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বকে ঈশ্বরের পরিতর্পণ মনে করিতেন। অশিক্ষিত বৈষ্ণবগণ 'সহজ ভজন' পন্থায় নারীসঙ্গ করিয়া সেই সন্দেহকে জনসমাজে সত্যে পরিণত করিল।

বৈষ্ণবদের এই দুঃসময়ে বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্ম্মশিক্ষার মন্দিরে, ভক্তির বিকট বিকাশ বুঝাইবার জন্য, ধর্ম্মসঙ্কটের নিবিড় তিমিরে, ভক্তবীর চৈতন্যচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের মত দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ তীর্থে উদিত হইলেন!

(২)

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুণ মাসে, জ্যোৎস্না মধুর পৌর্ণমাসী তিথিতে, স্নিগ্ধ নীলাকাশে ষোল কলায় পূর্ণ শশী আনমনে রূপের বাজার খুলিয়া বসিয়াছিলেন।

গগণ-নিকুঞ্জে সেদিন চাঁদের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, তেমন শোভা বুঝি আর কখনও হয় নাই! তাই রূপ লুব্ধ, চিরক্রূর বুদ্ধি, দৈত্যধর্ম্মী রাহু লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া সেই অমল ধবল জ্যোতিঃ শুধাংশু দেবকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল! তখন তিমিরাঞ্চলা সন্ধ্যা সুন্দরী অভিসারিকার বেশে মাটীতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতেছিলেন।

ঠিক এই সময়ে সিংহলগ্নের শুভ মুহূর্ত্তে নবদ্বীপের এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রেমাবতার চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন।

চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। এই রূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৈতন্যদেব ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া চন্দ্র-গ্রহণের সময় ভূমিষ্ট হন। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল বলিয়া, সকলঙ্ক আকাশের চাঁদকে রাহু বুঝি সেদিন গ্রাস করিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের অসামান্য রূপলাবণ্য ও দেবশ্রী দেখিয়া, পাড়া প্রতি-বেশীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। শিশুর দেহে "কাঁচা সোণার মত" গৌর-কান্তি দেখিয়া এবং ঐ শিশু রোরুদ্যমান অবস্থায় "হরিনাম" শুনিয়াই হাসিয়া উঠিত বলিয়া, কামিনীগণ তাহার নাম রাখিল—"গৌরহরি।" ডাকিনী যোগিনীর দৃষ্টির ভয়ে মাতা নাম রাখিলেন—"নিমাই।" চৈতন্যের মাতামহ নবদ্বীপের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশুর নাম রাখিলেন—"বিশ্বম্ভর।"

এই তিন নামেই চৈতন্যদেব বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যে শিশু যত আদ-রের, তার নামও তত বেশী। চৈতন্য বাপ মার আদরের ছেলে ছিলেন। শচী দেবীর উপর্য্যুপরি ৮টী কন্যা ভূমিষ্ট হইয়াই মরিয়া গিয়াছিল। আট মেয়ের পর, একছেলে হয় "বিশ্বরূপ," বিশ্বরূপের পর এই দেবের জন্ম। কোলের ছেলেটীর উপর মাতার মমতা কিছু অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে। তাই চৈতন্যকে শচী দেবী চ'খের আড় করিতেন না।

বিদ্যাপতির বাল্য-জীবনী জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন-চরিত জনশ্রুতির মুখে পল্লবিত। কিন্তু তাঁহার অমর কাব্যের প্রত্যেক পদাবলীতে রাজাশিবসিংহের প্রভাব বড় বেশী। এই রাজা শিবসিংহ ২৯৩ লক্ষ্মণসম্বতের চৈত্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষীয়া ষষ্ঠী তিথিতে, বৃহস্পতি বারে মিথিলার সিংহাসনে অভিষিক্ত হ'ন। সে সময় বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য প্রভাবে—মিথিলা গৌরবময়ী। রাজ্য গ্রহণের চারি মাস পরে, রাজা এই ঠাকুরকুল-তিলক বিদ্যাপতিকে আপনার সভায় সমাদরে আহ্বান করেন। বিদ্যাপতি রাজ-সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা বুঝিলেন,—এ ব্রাহ্মণ শুধু নীরস বিতণ্ডায় অনুপ্রাণীত কঠোর পণ্ডিত নহে, ব্রাহ্মণ দেব-দুর্লভ কবিত্ব রসের প্রকৃত অধিকারী! রাজা গুণীর গুণের সম্মান রক্ষা করিলেন; বিদ্যাপতিকে "অভিনব জয়দেব" উপাধি দিয়া, বিসপী গ্রাম দান করিয়া, আপনার সভাপণ্ডিতের উচ্চপদ প্রদান করিলেন। বিদ্যাপতিও সস্ত্রীক রাজাশ্রয়ে বাণী আরাধনার সুযোগ্য অবসর প্রাপ্ত হইয়া কাব্যের অরুণ-রাগে রাজ-সভাকে কোকনদের মত শতদলে প্রস্ফুটিত করিলেন।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ শৈব ছিলেন। বলা বাহুল্য আশৈশব বিদ্যাপতিও কৈলাসনাথ "বাণেশ্বরকে"কে আপনার হৃদয়ের মর্ম্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার "শিবভক্তি" জনসমাজে তাঁহাকে দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় মহত্ত্ব দান করিয়াছিল। এমনকি প্রবাদ আছে যে, বিদ্যাপতির ভক্তিবলে আকর্ষিত হইয়া স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব ছদ্মবেশে বিদ্যাপতির দাসত্ব করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির এক ভৃত্য ছিল, তাহার নাম "উগনা"। একদিন এই ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি স্থানান্তরে যাত্রা করেন। আতপ-তাপিত নিদাঘ-স্তম্ভিত ধূলি-সমাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে বিদ্যাপতির অত্যন্ত পিপাসা পাইল, তিনি তৃষিতকণ্ঠে ভৃত্যের কাছে বারি প্রার্থনা করিলেন। ভৃত্য উগনা—প্রভুর নয়নান্তরালে আত্মগোপন করিয়া

আপনার শিরস্থিত জটার ভিতর হইতে জল বাহির করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। বিদ্যাপতি জলপান করিয়া বিস্মিতভাবে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ জল তুমি কোথায় পাইলে ? এ যে মন্দাকিনীর মদগর্ব্বিত স্নিগ্ধ, শীতল নির্ম্মল জল ; এখানে তো গঙ্গা নাই—তবে গঙ্গাবারি কোথা হইতে আনিলে ?" উগনা কোনও উত্তর দিল না। বিদ্যাপতিও ছাড়িবার পাত্র নহেন। প্রভুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গত্যন্তর বিহীন ভৃত্য, শেষে আপনার জটা হইতে জল বাহির করিয়া দেখাইল! তখন এই ভৃত্যকে সাক্ষাৎ শঙ্কর জানিতে পারিয়া ভৃত্যের পাদমূলে পতিত হইলেন। ভৃত্যরূপী শিব বিদ্যাপতির হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"বিদ্যাপতি ! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু দেখিও—এ কথা জনসমাজে প্রকাশ করিও না, প্রকাশ হইলে আর আমি তোমার গৃহে থাকিব না।" উগনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, বিদ্যাপতি অনেক স্তবস্তুতি করিয়া, উগনাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। কিছুদিন এইরূপে কাটিল।

বিদ্যাপতির পত্নীভাগ্য অনুরূপ ছিল না। কথিত আছে—এই রমণী অত্যন্ত কোপন স্বভাব ও মুখরা ছিলেন।

একদা ব্রাহ্মণী উগনাকে কোনও দ্রব্য আনিতে আদেশ করেন। প্রভুপত্নীর আদিষ্ট পদার্থ লইয়া ফিরিয়া আসিতে উগনার একটু বিলম্ব হইয়াছিল। এই তুচ্ছ অপরাধে ব্রাহ্মণী নারিসুলভ কোমলতায় বিসর্জ্জন দিয়া, সরোষে যষ্টিহস্তে উগনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাপতি বাটিতেই ছিলেন। তিনি পত্নীর পুংস্কোকিল বিড়ম্বিনী আততায়ী চীৎকার শুনিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন ; আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার রোষপরায়না পত্নী প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া উগনাকে লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া আপনার প্রভুত্ব দেখাইতেছেন। উগনার লাঞ্ছনা দেখিয়া বিদ্যাপতি ছুটিয়া আসিলেন, পত্নীর দৃঢ়হস্ত হইতে কুলিশ কঠোর

যষ্টি কাড়িয়া লইলেন ; বলিলেন,—"কি করিতেছ ? কাহার অঙ্গে প্রহার করিতেছ ? উগনা সামান্য ভৃত্য নহে—উগনা সাক্ষাৎ শিব।" পত্নীর ব্যবহারে বিদ্যাপতির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, আত্ম-বিস্মৃত বিদ্যাপতি উগনার পরিচয় পত্নী-পাশে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। উগনাও—সেই স্থান হইতে বিদ্যুৎচকিত গতিতে অন্তর্হিত হইলেন।

উগনাশোকে উন্মাদ বিদ্যাপতি নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলেন ;—

উগনা মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা কি শিব দহু ভেলা॥
ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বৈসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ॥
জে মোর কহতা উগনা উদেশ।
তাহি দেবঁও কর কঙ্গনা বেশ॥
নন্দন বনমে ভেটল মহেশ।
গৌরি মন হরখিত মেটল কলেশ॥
বিদ্যাপতি ভন উগনা সো কাজ।
নাহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ॥

(৩)

তরুণ বয়সে বিদ্যাপতি "কীর্ত্তিলতা" ও "কীর্ত্তিপতাকা" এই দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে সুমধুর মৈথিলি ভাষায় কাব্য রচনা করেন। তাঁহার "পুরুষ পরিকা" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ—সাহিত্য জগতের জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র।

বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণবধর্ম্মী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু মিথিলায় তাঁহাকে সকলেই শৈব বলিয়া জানে। জয়দেবের যেমন কান্ত-পদাবলী মুরলীর প্রেম নিস্বনে বিদ্যাপতির শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল। কৃষ্ণ লীলার আস্বাদ পাইয়া বিদ্যাপতির কচি হৃদয় ভাব মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই সময় হইতেই তিনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব অন্বেষণ করেন। তাঁহার কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলী—ঐ সময় হইতেই প্রেম মহিমায় মণ্ডিত হইয়া জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিদ্যাপতির করুণ রসাভিষিক্ত আন্তরিক-তায় পরিপূর্ণ পদাবলী শুনিয়া—একদিন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য দেবও দিব্যোন্মাদ হইয়াছিলেন। এতদপেক্ষা তাঁহার পদাবলীর প্রশংসা আর কি হইতে পারে? বিদ্যাপতি-পদাবলী—লালসা বিরহে তন্ময় হইয়া বৈষ্ণবগণের ধমনীতে শ্রোতের সহিত তরল প্রেম মিশাইয়া দিয়াছিল। সে পদাবলী বুঝি পৃথিবীর নহে,—অপ্সরার চরণ সিঞ্চিতের গুঞ্জনমিশ্রিত স্বর্গীয় সঞ্জীবনী সুধায় অভিষিক্ত,—দেবেন্দ্রের প্রসাদে প্রফুল্ল !!

বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। বৈষ্ণবগণ—তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদিগের গুরুস্থানীয় হইয়াও বামন ও "বৈষ্ণবত্বের" গোঁড়ামী করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মীকের মত তিনি হরি হরকে অভিন্ন ভাবিতেন। সে মহৎ হৃদয়ে—ভেদ জ্ঞানের লঘুতা কখনও স্থান পায় নাই। তাঁহার নিম্নলিখিত পদটীই তাহার প্রমান;—

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খন পীত বসন খনহি বঘছা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজচারি।
খন শঙ্কর খন দেব মুরারি॥

খন গেকুল ভএ ভরাবথি গায়।
খন ভিখ মাগিয়া ডমরু বজায়॥
খন গোবিন্দ ভএ লিয় মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁধ বোকান।
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
ও নারায়ণ ও শূলপাণী॥

(৪)

বিদ্যাপতির বহু পদের ভনিতায় শিব সিংহ ও তাঁহার পত্নী লছিমা দেবীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর "চণ্ডীদাস ও রামীর সহজ সাধনের মহিমার সাধারণেই তখন "রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে" নায়ক নায়িকার ইন্দ্রিয় বিলাসের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাপতির পদে—নায়িকা সন্ধি সম্ভাষণ শুনিয়া লোকে লছিমা দেবীর প্রতি বিদ্যাপতির প্রেমাসক্তি কল্পনা করিয়াছিল। শুধু কল্পনা নয়, এমনকি হলাহল-প্রসবিনী খলের জিহ্বা—এই ঘটনায় রাজা শিবসিংহের আদেশে বিচার-পতির শূলদণ্ডে মৃত্যুসংবাদ রটনা করিতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা-পতি জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তবে এ কলঙ্কের মূল কি? বিদ্যাপতি, শিবসিংহের আশ্রিত ছিলেন। সর্ব্বজীবে স্নেহশীলা সাধ্বী লছিমা দেবীকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করিতেন। রাজা ও রাণী মধুর রসাশ্রিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন, রাজাজ্ঞায় বিদ্যাপতি সঙ্গীত রচনা

করিতেন। রাজদম্পতি অন্তঃপুরে বিশ্রাম-সুখ কামনায় উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত-রসিকা পুরন্ধ্রিগণ সেই সকল পদাবলী গান করিত। এই কারণে পদাবলীতে কবি অপূর্ব্ব কৌশলে রাজা ও রাণীর নাম সংযুক্ত করিয়া দিতেন। সাধারণ লোকে কবি কৌশলের মর্ম্ম না বুঝিয়াই—বিদ্যাপতির সঙ্গীতে মদন বিকারের বিকট গন্ধ অনুভব করিয়াছিল।

(৫)

মিথিলায় প্রবাদ আছে,—একবার রাজা শিবসিংহ সম্রাটের কোপে পতিত হইয়া দিল্লীতে বন্দী হ'ন। রাজার সঙ্গে রাজকবি বিদ্যাপতিও দিল্লীগমন করিয়াছিলেন। রাজাকে সম্রাট্ বন্দী করেন; বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব কবিত্বময়ী সঙ্গীত শুনিয়া দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পুত্র ও কন্যা হইয়াছিল। পুত্রের নাম হরপতি। ৩২৯ লক্ষ্মণ সম্বতে, কার্ত্তিক মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে কবিরাজ রাজমুকুট বিদ্যাপতির লীলা অবসান হয়। প্রফুল্লমুখে আত্মীয় স্বজনের কাছে অন্তিমবিদায় লইয়া, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া জীবনের সায়াহ্নে, গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে বিদ্যাপতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

* * * *

বাজিতপুরের যেস্থানে বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল, সেস্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবির বংশ এখনও সৌরাট্ প্রদেশে বর্ত্তমান আছে। কবিকে রাজা শিবসিংহ যে বিসপী গ্রাম দান করিয়াছিলেন, ১২৫৭ সালে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

(১)

আত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। যোগের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাধাকৃষ্ণ লীলায় প্রকাশ। রাধা প্রকৃতির পরমতত্ত্ব, কৃষ্ণ পুরুষের রূপ; প্রকৃতি-পুরুষের আসক্তির নাম—রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। সংসারের কুটিলতা ও মায়া হইতে আত্মা যখন পরিব্রাজিত হ'ন—তাহার নাম ব্রজভাব। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন—বৃন্দাবন ধামে! যতদিন আত্মার সংসার-বীজ সমস্ত না নষ্ট হয়, ততদিন আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই সংসারিকতা নির্ব্বাণের জন্যই কৃষ্ণ-বিরহ।

পুরুষ প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ ভাবই জগৎসংসার। জগতেই উভয়ের আসক্তি, বিচ্ছেদেই উভয়ের মুক্তি। রাধার শত বৎসরের বিচ্ছেদে—জীবাত্মার শত বৎসরের অনাসক্তিতে—মুক্তির আবির্ভাব! যোগের এই নিগূঢ় তত্ত্ব এক একটী করিয়া অবয়বী কল্পনায় কৃষ্ণলীলায় মূর্ত্তিমান! যোগের জীবাত্মা পরমাত্ম-তত্ত্বের সমস্ত স্তরই কৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি;—

কৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তিনি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ, প্রকৃতিতে অনাসক্ত, তখন তিনি জগতের হিতকারী। প্রজাপালনরূপে গোপালনে কৃষ্ণ, সংসার-গোষ্ঠে বিহার করেন। নন্দ-যশোদার স্নেহানুরাগে শ্রীহরি ক্ষীর নবনীতে হৃষ্ট, তার পর রাধার প্রেমানুরাগে—হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার ফুলচন্দনে চর্চ্চিত। পাঠক মহাশয়! ব্রজলীলার উপাখ্যানগুলি

স্মরণ করুন। বাৎসল্য ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া অনুরাগে প্রগাঢ়তর, সেই অনুরাগ আবার রাধার প্রেমে প্রগাঢ়তম। যে অনুরাগ সংসার মায়ার উপর বিজয়ী, সেই অনুরাগ রাধার অনুরাগ, সেই অনুরাগ যোগীর ঈশ্বরানুরাগ। এই অনুরাগের ক্রম স্ফূর্ত্তি যোগতত্ত্বে অনুভব করা যায়।

প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ, স্ত্রী-পুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুরাগে—কিরূপে রাধাকৃষ্ণলীলায় পরিণত হইয়াছিল, উপরে সংক্ষেপে তাহা বুঝাইলাম। বৈষ্ণবের হৃদয়, প্রেমে, অনুরাগে, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব রাধার প্রেমাদর্শে আপনার হৃদয় গঠিত করেন, কৃষ্ণের জন্য লালায়িত হন, ভক্তের অনুরাগ ভালবাসেন। রাধা মানবপ্রকৃতির পরমেশ্বরী। রাধা—রাধার অমানুষ দেবতুল্য প্রেম—বৈষ্ণবের জপমালা। বৈষ্ণব সংসারের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, সমস্ত জীবনকে কৃষ্ণপ্রেমে উৎসর্গ করেন। বৈষ্ণবের ভক্তি প্রথমে জয়দেবের পদাবলীতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণবানুরাগের বাসন্তি বিকাশ—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। প্রেমের উল্লাস, প্রেমের মুগ্ধতা কৃষ্ণলীলাচ্ছলে ততদিন বঙ্গদেশকে মুঞ্জরিত করিয়াছিল। সেই মুঞ্জরিত কুসুম—শ্রীমতী রাধা সুন্দরী। রাধার অনুরাগ, ঐকান্তিকতা, উন্মত্ততা, মধুরতা—আত্মহারা জয়দেব পদ্মা-বতীতে দেখিয়াছিলেন, প্রেমিক বিদ্যাপতি লছিমা দেবীতে কল্পনা করিয়াছিলেন। মাতোয়ারা চণ্ডীদাস রামমণি রজকিনীতে উপভোগ করিয়াছিলেন।

ভক্তি—ভগবানের আদরের জিনিষ। সেই আদরেই রসময়ী কল্পনা—মান। প্রেমের সহিত প্রেম আকৃষ্ট হইবে বলিয়া—শ্রীমতী মালিনী। প্রেমের পরিপুষ্টি সাধনের বিশিষ্ট উপায়—বিরহ। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বিরহে বড় উন্মত্ত। এই তন্ময়তা কিন্তু সাধারণে বুঝিল না।

তাহারা রাধাকৃষ্ণ লীলার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখিতে পাইল। রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসে শ্যামাবির্ভাবের স্বপ্নচিত্র—মানবলীলার প্রেমে পরিণত হইল। রাধাকৃষ্ণের লীলা অসংখ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ—নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি করিল।

তান্ত্রিকগণ আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। লোকে ঘোর কল্পনার প্রহেলিকার মধ্যে নিপপতিত হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাধি পূর্ণ বিকারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিল! মধুর ভক্তিতত্ত্ব—নারদ গর্গাদি মহাজ্ঞানীর কথা ছাড়িয়া দাও, গোপিকাগণও যে ভক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তরিয়া গিয়াছিল, সেই ভক্তিতত্ত্বও বিকৃত বুদ্ধি নরনারীর কাছে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিতের অভাব ছিল না, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কাজেই শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল না।

ইহার কারণ বৈষ্ণবগণ বৈদিক ঋষিরপরিতর্পণ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া ভক্তিলাভ করিতেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন। তাহার ফলে বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। পণ্ডিতগণ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বকে ঈশ্বরের পরিতর্পণ মনে করিতেন। অশিক্ষিত বৈষ্ণবগণ 'সহজ ভজন' পন্থায় নারীসঙ্গ করিয়া সেই সন্দেহকে জনসমাজে সত্যে পরিণত করিল।

বৈষ্ণবদের এই দুঃসময়ে বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্ম্মশিক্ষার মন্দিরে, ভক্তির বিকট বিকাশ বুঝাইবার জন্য, ধর্ম্মসঙ্কটের নিবিড় তিমিরে, ভক্তবীর চৈতন্যচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের মত দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ তীর্থে উদিত হইলেন!

(২)

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুণ মাসে, জ্যোৎস্না মধুর পৌর্ণমাসী তিথিতে, স্নিগ্ধ নীলাকাশে ষোল কলায় পূর্ণ শশী আনমনে রূপের বাজার খুলিয়া বসিয়াছিলেন।

গগণ-নিকুঞ্জে সেদিন চাঁদের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, তেমন শোভা বুঝি আর কখনও হয় নাই! তাই রূপ লুব্ধ, চিরক্রূর বুদ্ধি, দৈত্যধর্ম্মী রাহু লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া সেই অমল ধবল জ্যোতিঃ শুধাংশু দেবকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল! তখন তিমিরাঞ্চলা সন্ধ্যা সুন্দরী অভিসারিকার বেশে মাটীতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতেছিলেন।

ঠিক এই সময়ে সিংহলগ্নের শুভ মুহূর্ত্তে নবদ্বীপের এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রেমাবতার চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন।

চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। এই রূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৈতন্যদেব ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া চন্দ্র-গ্রহণের সময় ভূমিষ্ট হন। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল বলিয়া, সকলঙ্ক আকাশের চাঁদকে রাহু বুঝি সেদিন গ্রাস করিয়াছিল।

চৈতন্যদেবের অসামান্য রূপলাবণ্য ও দেবশ্রী দেখিয়া, পাড়া প্রতি-বেশীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। শিশুর দেহে "কাঁচা সোণার মত" গৌর-কান্তি দেখিয়া এবং ঐ শিশু রোরুদ্যমান অবস্থায় "হরিনাম" শুনিয়াই হাসিয়া উঠিত বলিয়া, কামিনীগণ তাহার নাম রাখিল—"গৌরহরি।" ডাকিনী যোগিনীর দৃষ্টির ভয়ে মাতা নাম রাখিলেন—"নিমাই।" চৈতন্যের মাতামহ নবদ্বীপের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শিশুর নাম রাখিলেন—"বিশ্বম্ভর।"

এই তিন নামেই চৈতন্যদেব বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যে শিশু যত আদ-রের, তার নামও তত বেশী। চৈতন্য বাপ মার আদরের ছেলে ছিলেন। শচী দেবীর উপর্য্যুপরি ৮টী কন্যা ভূমিষ্ট হইয়াই মরিয়া গিয়াছিল। আট মেয়ের পর, একছেলে হয় "বিশ্বরূপ," বিশ্বরূপের পর এই দেবের জন্ম। কোলের ছেলেটীর উপর মাতার মমতা কিছু অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে। তাই চৈতন্যকে শচী দেবী চ'খের আড় করিতেন না।

(৩)

চৈতন্যের 'বাল্যলীলা' অতি অদ্ভুত! স্বভাবের ধর্ম্মে, জনশ্রুতি সেই অদ্ভুতকে বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত করিয়া পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছিল।

ষষ্ঠমাসে চৈতন্যের 'অন্নপ্রাশন' হয়। অন্নপ্রাশনের দিন বালককে অনেক দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে একখানি "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থও ছিল। চৈতন্য সকল দ্রব্য ছাড়িয়া সেই গ্রন্থখানি লইয়াই খেলা করিলেন। ছয় মাসের ছেলের কাণ্ড দেখিয়া শচী দেবী, মিশ্র মহাশয় এবং প্রতিবেশীগণ সকলেই অবাক্ হইলেন। এই ঘটনা তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন ও কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

শচী মাতার সুন্দর শিশু শুক্ল পক্ষের শশীকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বালকের 'দুরন্তপনাও দেখা দিল। গ্রামবাসীদের গৃহে গিয়া চৈতন্যদেব বড়ই উৎপাত করিতেন। গোকুলের সেই গোপ শিশুটীর মত, শচীমাতার সন্তানের স্নেহের আবদার, প্রীতির উৎপাত, ভালবাসার অত্যাচার অহর্নিশি সহ্য করিয়া প্রতিবেশীগণ একদিকে বিরক্ত ও রুষ্ট এবং অপর দিকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইত।

ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা আরও একটু বৃদ্ধি হইল। চৈতন্য বলিতে লাগিলেন তিনি ঈশ্বর! জাহ্নবীর সৈকত পুলিনে কুলনারিগণ যখন পুষ্পচন্দনে ইষ্ট সাধনা করিতেন, চৈতন্য সেই সময়ে গিয়া বলিতেন "তোমরা আমার পূজা কর।" শুধু ইহাই নহে, লোকের দেবার্চ্চনার উদ্দিষ্ট দ্রব্য কাড়িয়া খাইতেন। বিরক্ত হইয়া সকলে শচী দেবীর কাছে শিশুর দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মাতা বালককে শাসন করিতেন, অন্তরে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ষাট্ ষাট্ বলিয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া স্নেহমধুর বচনে কত বুঝাইতেন।

একদিন একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের বাটিতে আতিথ্য স্বীকার করেন। শচী দেবী ও মিশ্র অতিথির আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলে, ব্রাহ্মণ অন্ন প্রস্তুত করিয়া মুদিত নয়নে সেই ঘৃতান্ন রাশি ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করিলেন। তাহার পর যেমন আহার করিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন—মিশ্রের শিশুপুত্র শান্ত সুবোধটীর মত সেই নিবেদিত অন্নগ্রাস ধীরে ধীরে মুখে তুলিতেছেন। ব্রাহ্মণ মিশ্রকে এ ঘটনা জানাইলেন। পুত্রকে তিরস্কার করিয়া আবার অতিথির আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়বার অন্ন প্রস্তুত হইল। সে অন্ন ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবার পূর্ব্বে অতিথি দেখিলেন—সেই দুষ্ট বালক আবার তাহা উচ্ছিষ্ট করিতেছে। এইরূপে তিন বার অন্ন প্রস্তুত হইল, তিন বারই চৈতন্য তাহা উচ্ছিষ্ট করিলেন। শেষে ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন এ বালক সাধারণ নহে। তাঁহার ইষ্টদেবতাই এই বালক গোপালের বেশে অন্নভোজন করিতেছেন! তখন ব্রাহ্মণ চৈতন্যের স্তবস্তুতি করিয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

আর একদিন শচীদেবী পূজা করিতে আসিয়া দেখিলেন, চৈতন্য ঘরের শালগ্রামগুলিকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং ঠাকুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট! বালকের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া শচীদেবী তিরস্কার করিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কি এক আকর্ষণী শক্তিগুণে মুগ্ধ হইয়া শচীদেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন!

চৈতন্যের ঐশ্বরিকতার অভ্যাসে শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা চৈতন্যকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না, চৈতন্যও কাহাকে ভয় করিতেন না। কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে চৈতন্য নীরবমুখে শান্তভাব ধারণ করিতেন। বিশ্বরূপও অনুজের অলৌকিক কার্য্যাবলীর পরিচয় পাইয়া, কেবল বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে চৈতন্যের পানে চাহিয়া থাকিতেন।

এইরূপে কাহারও ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া, কাহারও খাদ্য লইয়া পলায়ন করিয়া, কাহারও কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া, কোন প্রাত্যহিক বহু বিভ্রাটের মধ্য দিয়া চৈতন্যের সুকুমার শৈশব অতীত হইয়াছিল। শিশুর দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত জনমণ্ডলীর কাছে শচীদেবী কেবল ক্ষমা চাহিতেন, কাহাকেওবা মিষ্ট কথায় পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিতেন।

এই চটুল চতুর শৈশবে, কালনাদিনী জাহ্নবী পুলিনে বল্লভাচার্য্যের দুহিতা লক্ষ্মীদেবীর সহিত চৈতন্যের বাল্যপ্রেমের সঞ্চার হয়।

যথাসময়ে মিশ্রমহাশয় পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট চৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইল। চৈতন্যের অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, গঙ্গাদাসের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই চৈতন্যের অগ্রজ সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষার অসাধারণ অভি-নিবেশ দেখিয়া শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের ভয় হইল—নিমাই হয়তো সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। জনক জননী পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হইলেন। কিন্তু চৈতন্য কোন বাধাই গ্রাহ্য করিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই লোকে শুনিল—মিশ্র ঠাকুরের সেই দুরন্ত ছেলেটী এক মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক এক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপের নিকটস্থ বিদ্যা নগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্য এই টোলের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র-রূপে পরিগণিত হন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি চৈতন্যদেব আপনার অসাধারণ প্রতিভার ভাস্বর মহিমায় কাব্য, সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

(৪)

চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ উদাসীন বেশে গৃহ পরিত্যাগ করিলে, মিশ্রঠাকুর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যের ছাত্রাবস্থাতেই পুত্রবিয়োগবিধুর জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হইল। সংসারানভিজ্ঞ চৈতন্য পিতৃবিয়োগে বড়ই বিপন্ন হইলেন। চৈতন্যের সে বালস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় সহসা তিরোহিত হইল, শোকাতুরা মাতাকে তিনি শান্তগম্ভীর ভাবে সান্ত্বনা করিতেন। স্বামীহীনা অসহায় বিধবা চৈতন্যের আশ্বাসবচনে বজ্রদগ্ধ বল্লরীর মত সংসারে বাস করিতে লাগিলেন।

মাতার মলিনমুখে অভয়ের অভিব্যঞ্জনা দেখিয়া গৃহকার্য্যের প্রতি চৈতন্যের দৃষ্টি পতিত হইল। চৈতন্য বুঝিলেন সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলে সহধর্ম্মিণীর সাহায্য চাই। শচীদেবীও পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শচীদেবী চৈতন্যের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন।

শুভদিনে, শুভক্ষণে বনমালী ঘটকের মধ্যস্থতায়, চৈতন্যের সেই শৈশবসঙ্গিনী ধর্ম্মপরায়ণ বল্লভাচার্য্যের সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে চৈতন্যের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইল। চৈতন্য গৃহস্থ হইলেন। সংসারের নানা অসঙ্গতার মধ্যেও পুত্রের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, শচীদেবীর মনে নিমায়ের সংসারত্যাগরূপ ভাবী বিপদের আশঙ্কা জনিত উৎকণ্ঠা একরকম দূর হইয়া গেল। ধৈর্য্যের দৃঢ়বন্ধনে বুক বাঁধিয়া, শচীদেবী পুত্র পুত্রবধূকে লইয়া আবার সংসার করিতে লাগিলেন।

(৫)

সংসার করিতে গেলে অর্থ চাই। বিবাহের পর বাধ্য হইয়া চৈতন্য বাটীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অধ্যা-

পনার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্রমণ্ডলী আসিয়া চৈতন্যের চতুষ্পাঠীর শোভা বর্দ্ধন করিল। এই নবীন যুবকের শাস্ত্রজ্ঞান গরিমার কথা শুনিয়া, অনেক পণ্ডিত চৈতন্যের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কাছে লজ্জায় অধোবদন হইয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। অচিরে 'দিগ্বিজয়ী' গৌরবে চৈতন্যের জয় দুন্দুভি ঘোর রবে বাজিয়া উঠিল। সমাজে তাঁহার অতুল প্রতিপত্তি জন্মিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, তণ্ডুল, তৈজসাদি বিবিধ উপহারে চৈতন্যের ক্ষুদ্র কুঠীর পূর্ণ হইতে লাগিল। চৈতন্য আদর্শ গৃহীর ন্যায় দীন দরিদ্রের প্রতিপালন, এবং অতিথি অভ্যাগতের সৎকার করিয়া, শচীদেবীর সাধের সংসারে দেবতার আশীর্ব্বাদ বহিয়া আনিলেন।

গৌরাঙ্গের পত্নী লক্ষ্মী দেবী ধর্ম্মনিষ্ঠায়, শ্বশ্রূসেবায়, পতিভক্তিতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া নারীধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন গঙ্গাপার হইবার সময়,নৌকায় এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে চৈতন্যের আলাপ হয়। চৈতন্যের হস্তে একখানি পুঁথি ছিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওখানি কি পুঁথি?" চৈতন্য উত্তর দিলেন—এখানি ন্যায়-শাস্ত্রের টীকা, আমি রচনা করিয়াছি।" ব্রাহ্মণ ঐ পুঁথির কিয়দংশ পড়িতে বলিলেন। চৈতন্য পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মণের মুখ বিষাদ কালিমায় একেবারেই ম্লান হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিয়া ফেলিলেন—"আমার সর্ব্বনাশ হইল! আমি বহু বর্ষ ধরিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়া একখানি টীকা রচনা করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইল। আপনার ও টীকার নাম শুনিলে কেহই আমার টীকা গ্রাহ্য করিবে না।" ব্রাহ্মণের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া সহাস্যবদনে চৈতন্য কহিলেন,—"ইহার জন্য আর চিন্তা কি?" ব্রাহ্মণের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়া চৈতন্য সেই সযত্নরচিত অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-

ময়ী টীকা তরঙ্গসঙ্কুলা জাহ্নবীর জলে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলেন। এই অপূর্ব্ব উদারতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দেখিয়া, ব্রাহ্মণের দুই গণ্ড বহিয়া কৃতজ্ঞতা অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

ইহার পর চৈতন্যদেব শিষ্যমণ্ডলী সহ পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর।

তিনি যে দেশে গমন করিতেন, তদ্দেশবাসিগণ তাঁহাকে সুপণ্ডিত জানিয়া অভ্যর্থনা করিত। তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া কৃতার্থ হইত। অনেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র প্রভৃতি বহুমূল্য উপহার লইয়া নিমাই পণ্ডিতের একটা মুখের কথা শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিত।

চৈতন্য যখন পূর্ব্ববঙ্গে, তখন তাঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই মৃত্যুর কারণ—স্বামী-বিরহ। কেহ কেহ বলেন সর্পাঘাতেই লক্ষ্মীর মৃত্যু হইয়াছিল।

(৬)

ভক্তের ভক্তি উপহার, বহু দ্রব্য সম্ভার লইয়া চৈতন্যদেব গৃহে প্রত্যাগত হইলে, শচীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। মাতৃ-কণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ চৈতন্যকে লক্ষ্মীদেবীর অকালমৃত্যুর কাহিনী জানাইয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিল। লক্ষ্মীশোকে চৈতন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে শোক বাহিরে প্রকাশ পাইল না, অন্তরে অরুন্তুদ যন্ত্রণা লইয়া চৈতন্য মাতাকে বঝাইলেন—"মরণং প্রকৃতি শরীরীণাং"।

লক্ষ্মীর বিরহ-জ্বালা জুড়াইবার জন্য চৈতন্যদেব দ্বিগুণ উৎসাহে ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু মাতৃসকাশে পুত্র-হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় মর্ম্মব্যথা অগোচর ছিল না। চৈতন্যের প্রতিকার্য্যেই শচীদেবী নৈরাশ্যের ছায়া দেখিতে পাইলেন। শেষে শচীদেবী আপনি

উদ্যোগ করিয়া সনাতন পণ্ডিতের আদরিণী দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত চৈতন্যের আবার বিবাহ দিলেন। নববধূর পুষ্পপেলব সৌন্দর্য্যে শচী দেবীর আঁধার গৃহ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ছাত্রগণের অধ্যাপনায়, পণ্ডিতবর্গের সহিত বাদ-বিতণ্ডায়, বহুবিধ শাস্ত্র আলোচনায় লিপ্ত থাকিয়া, চৈতন্য আবার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীচৈতন্য কৌমুদী বিভাসিত ফুল্ল রজনীতে শিষ্যবর্গসহ জাহ্নবীতটে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌরাঙ্গকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই পণ্ডিত পুরুষ যুবক গৌরাঙ্গের তর্কতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। পণ্ডিতের দুর্দ্দশা দেখিয়া শিষ্যগণ হাসিয়া উঠিল। গৌরাঙ্গ তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন, দাম্ভিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে অপমানিত দেখিয়া নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া বিনয়নম্র-বচনে তাঁহার অনেক প্রশংসা করিলেন। হতগর্ব্ব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌরাঙ্গের বিনীত ব্যবহারে আরও লজ্জিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়বার্ত্তা অচিরে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কর্ণগোচর হইল।

জ্ঞান গরিমায়, কূটতর্কের প্রভাবে, চৈতন্য জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও মনে শান্তি পাইলেন না। তিনি আনন্দের অনন্ত উৎসের সন্ধানে লালায়িত হইয়া পড়িলেন। মাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, বিদ্যার গৌরব, সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রাণের ভিতর কিসের অভাব অনুভব করিয়া দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে অশান্তি আসিয়া চৈতন্যের ব্যাকুল আত্মাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

মনের এই বিপর্য্যয় অবস্থায় চৈতন্যদেব শিষ্যগণের সহিত পবিত্র গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—পিতৃলোকের সদ্গতির জন্য বিষ্ণু

পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিবেন। এই স্থানেই তাঁহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। চৈতন্য গয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিতে পাইলেন, শত শত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গদাধরের পাদপদ্ম পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভক্তি ভরে পূজা করিতেছেন! এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া চৈতন্যের হৃদয়েও ভক্তি প্রস্রবণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, পাণ্ডিত্যের নিদারুণ অভিমানে ইদানীং চৈতন্যদেব নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। গয়াধামে আসিয়া তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে কি এক অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত পূর্ব্ব, বিমল আনন্দ উপলব্ধি করিলেন। যে বিষ্ণুর পাদ পদ্মে শত সহস্র লোক আসক্ত, সেই বিষ্ণুকে পাইবার জন্য চৈতন্য ব্যাকুল হইলেন। বিষ্ণু পাদপদ্ম হইতে উন্মুক্ত ভক্তির উৎস চৈতন্যের বিশাল বক্ষ প্লাবিত করিল।

গয়াক্ষেত্রে—কুমার হট্ট (হালিসহর) নিবাসী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হইল। ঈশ্বর পুরী—ভক্তিপরায়ণ মাধবেন্দ্র পুরীর একজন প্রধান শিষ্য। এই নিঃসঙ্গ বৈরাগীর পবিত্র হৃদয়ে,—চৈতন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির সুপন্থা দর্শন করিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে হৃদয়স্পর্শী প্রেমবার্ত্তা শুনাইয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ঈশ্বর পুরীর নিকট পবিত্র দশাক্ষর মন্ত্রলাভ করিয়া চৈতন্য বিষ্ণুপদে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

কৃষ্ণপ্রেম চৈতন্যকে উন্মত্ত করিল। মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাব বিহ্বল চৈতন্য কিন্তু প্রেমাবেশে, ব্যাকুল বিরহে, আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। শিষ্যগণ বহুকষ্টে চৈতন্যকে লইয়া ঘরে ফিরিল। এই সময় চৈতন্যের বয়স দ্বাবিংশ বৎসর মাত্র।

(৭)

অভিমান, পাণ্ডিত্য গর্ব্ব, জ্ঞান গরিমা—সকল বিসর্জ্জন দিয়া চৈতন্য নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। লোকে দেখিল—নিমাই পণ্ডিতের সে

শাস্ত্রাভিজ্ঞতার উজ্জ্বলমূর্ত্তি, তর্কপ্রিয়তার জীবন্ত উচ্ছ্বাস—সমস্তই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!

দেশ প্রত্যাগত চৈতন্যের সঙ্গে অনেকেই সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। চৈতন্য সকলের সঙ্গেই দৈন্যতার বিনয় সম্ভাষণ করিলেন। এইবার নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। চৈতন্যের নয়নে প্রেমাশ্রু, দেহে প্রেমাবেশের কম্পন, জীবনে অসামান্য ভক্তির লক্ষণ, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাব সমষ্টি দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন—নিমাই পণ্ডিতের জীবনে বিহ্বলতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। পুত্রের উন্মাদাবস্থা, নির্জ্জন প্রিয়তা, আকুল রোদন প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া শচীদেবী চৈতন্যকে ব্যাধিগ্রস্ত ভাবিলেন। তিনি পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনায় ঠাকুর দেবতার চরণে 'মানসিক' করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যের বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষায় আনন্দ প্রকাশের জন্য একদিন শুক্লাম্বরের গৃহে বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইলেন। ভক্ত বৃন্দের মধ্যস্থলে ভাব বিভোর গৌরচন্দ্রেরও আবির্ভাব হইল। "কৃষ্ণ কোথায়?" বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য চৈতন্য শুক্লাম্বরের গৃহের একটা খুঁটী এমন জড়াইয়া ধরিলেন যে খুঁটী তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য দেবও মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। বৈষ্ণবদের যত্নে শুশ্রূষায় তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

চৈতন্যের প্রেম-বিহ্বলতা—নগরে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণরূপ অবতার দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য—অধ্যাপনা, ছাত্র, সংসার আসক্তি, সব ছাড়িয়া অশ্রুকমলে পৃথক পূর্ণ শরীরে—একেবারেই উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠে কেবল "হরিধ্বনী"র গুঞ্জরণ মানবত্বের সীমায় দেবত্ব আনিয়া হাজির করিল।

(৮)

অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত নিমাই—বিদ্যার গর্ব্ব পদদলিত করিয়া সামান্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মিশিয়াছেন—শুনিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী চৈতন্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। বামাচারী শাক্তগণ চৈতন্যের ভক্তি দেখিয়া—তাহাকে মানবের দৌর্ব্বল্য ভাবিয়া চৈতন্যকে ঘৃণা করিতে লাগিল। চৈতন্যের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে বলিয়া তাহারা নবদ্বীপের প্রত্যেক পল্লীতে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে ভাবে মুগ্ধ চৈতন্য বৈষ্ণব সেবায় মত্ত হইলেন। তিনি স্নাত বৈষ্ণবের সিক্তবস্ত্র স্বহস্তে নিংড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কাহার পূজার সামগ্রী, কুশাদি যোগাইয়া দিতে লাগিলেন, কাহারও পদ সেবা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বৈষ্ণবগণকে লইয়া চৈতন্য হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সংসার সুখাসক্ত নিদ্রাপ্রয়াসী প্রতিবাসীগণ রাত্রে কীর্ত্তনের উন্মত্তরোল ও প্রেমোস্পদের তাণ্ডব নৃত্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা বৈষ্ণবগণকে রাজ্যশাসনের বিভীষিকা দেখাইয়া জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিকে শাক্তগণের ক্রূর জিঘাংসা, অন্যদিকে বৈষ্ণবগণের প্রশান্ত আত্মরক্ষা—ক্ষুব্ধ নবদ্বীপে রীতিমত ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই মায়াবাদী বিপ্লবের দুঃসময়ে বৈষ্ণব বৃন্দের বল বৃদ্ধি করিতে, অবধূত নিত্যানন্দ চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন। নিত্যানন্দ একচাকা গ্রামে হার ওঝার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, অতি শৈশবেই একজন সন্ন্যাসী আসিয়া নিত্যানন্দকে গৃহত্যাগী করিয়া সঙ্গে লইয়া যান।

নিত্যানন্দের পিতা মাতা অতিথি সেবা তৎপর গৃহস্থ ছিলেন, সন্ন্যাসী অতিথি বেশে আসিয়া তাঁহাদের একমাত্র পুত্র নিত্যানন্দকে প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণ দম্পতী ধর্ম্মের অনুরোধে হৃদয়ের ধনকে বিদায় দিলেন।

সেকালে লোকের ধর্ম্মানুরাগ কত প্রবল ছিল! অতিথির আকিঞ্চন পূর্ণ করিবার জন্য -পুত্র পরিত্যাগ! —এ উচ্চভাব আজি কালিকার নরনারী কল্পনাও করিতে পারেন না!

মথুরায় থাকিয়া নিত্যানন্দ চৈতন্যের গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি চৈতন্যের ভক্তিলীলা দেখিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হইলেন। শুভক্ষণে নিতাই চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইল। নিত্যানন্দ চৈতন্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। নিত্যানন্দ—চৈতন্যের তেজঃ পুঞ্জ কলেবর ও বদন মণ্ডলে ভক্তির উৎসাহ রেখা দেখিয়া চৈতন্যের পাদমূলে লুণ্ঠিত হইলেন।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের সুন্দর দেহে তপঃ সঞ্চিত পুণ্য দীপ্তির বিকাশ দেখিয়া আত্ম বিস্মৃত হইলেন। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সমবেত ব্যক্তি মণ্ডলী নিতাই গৌরের জয় উচ্চারণ করিতে লাগিল! সে উচ্চরোল শাক্তগণের হৃদয়ে বিষদিগ্ধ বজ্র শারকের মত আঘাত করিল।

দুইটী বেগবতী তরঙ্গিনীর সম্মিলন কালে যেমন প্রচণ্ড তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হইয়া উঠে, পরে সেই স্রোতদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া সাগরাভিমুখী হয়, নিতাই গৌরের প্রেম সলিলেও সেইরূপ বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হইল। ভক্তবৃন্দ প্রেমোন্মত্ত নিতাই গৌরকে পরিবেষ্টন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, প্রেমলীলায় নবদ্বীপ টলমল করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পরম বৈষ্ণব শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। শ্রীবাসের পত্নী মালিনীদেবী মাতার ন্যায় স্নেহ-কোমলকরে, নিত্যানন্দের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিতেন।

তৎকালে বৈষ্ণব সমাজে "ব্যাসপূজা" উৎসব প্রচলিত ছিল। সেই উৎসব উপলক্ষে শ্রীবাসের ভবনে সমস্ত দিন ব্যাপী নৃত্য কীর্ত্তন হইত।

নিতাই গৌর এই উৎসবে যোগদান করিলেন। এই সময় বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যও নিতাই গৌরকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে পরিপূর্ণ যোগ সঞ্চয় করিয়া বৈষ্ণব সমাজ—নবদ্বীপে প্রেম মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন।

ক্রমে, নিমাই গৌরের ভক্তির আকর্ষণে, মুরারি, হিরণ্য, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, রাম, গরুড়াই, নারায়ণ, হরিদাস, বাসুদেব, বক্রেশ্বর, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, সদাশিব, শ্রীমান, শ্রীগর্ভ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ—এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তণের দল গঠন করিলেন। এই সব ভক্ত মণ্ডলীকে লইয়া প্রতি নিশীথে গৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তণ আরম্ভ করিলেন। মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ, করতালের গম্ভীর ধ্বনি—নবদ্বীপকে ভক্তি রসে মাতাইয়া তুলিল।

শাক্তগণের সর্ব্বনাশ হইল। তাহারা বৈষ্ণবের শত্রুতা সাধনে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবগণের গৃহদ্বারে, জবাফুল, মদ্যভাণ্ড, সিন্দুর রক্তচন্দন, মাংস, অস্থি প্রভৃতি বামাচারীর পূজাকরণ ছড়াইয়া দিতে লাগিল। অধিকন্তু বৈষ্ণবগণের প্রেমলীলাকে গুপ্ত ব্যভিচার বলিয়াও ঘোষণা করিল।

(৯)

গৌরাঙ্গ দেব শাক্তদের শত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তন স্থলে তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস জন্মিল—চৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান, কলিযুগে কলুষহারী নাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদ, হরিদাস ব্রহ্মা—অবতার তত্ত্বে বিশ্বাসবান্ বৈষ্ণবমণ্ডলী সাধারণকে ইহা বুঝাইতে লাগিলেন।

যখন সঙ্কীর্ত্তনের দল নগর ভ্রমণে বাহির হইত, তখন ভক্তগণ চৈতন্য

ও নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পুষ্পমাল্য চন্দনে সজ্জিত করিয়া দিতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ছত্র ধারণ করিতেন, ভক্ত মণ্ডলীর শ্রদ্ধা উপহার পাইয়া চৈতন্যের মনে রাজসিক বিকার প্রবেশ করিতে পারিল না, চৈতন্য আপামর সাধারণকে আলিঙ্গন করিয়া হরিনাম মহামন্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। যবন কুলোদ্ভব হরিদাসও তাঁহার কাছে—ব্রতনিষ্ঠ সুব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

বৈষ্ণব দলের অগ্রণী হইয়া চৈতন্য নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকলেই সেই তেজব্যঞ্জক কলেবর সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষকে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু চৈতন্য তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—"ভাই সকল! আমি অন্য ভিক্ষা চাহি না, আমার ভিক্ষা—তোমারা একবার বদন ভরিয়া হরি হরি বল"। তৎকালে সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার বিধির অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল না, চৈতন্যই প্রথমে—এইরূপ দেশব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারের পথ দেখাইয়াছিলেন।

(১০)

চৈতন্য যুগে, নবদ্বীপে "জগাই" ও "মাধাই" নামক দুইজন মহাপাষণ্ড বিরাজ করিত। ইহারা দুই ভাই, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইয়াও এই পাষণ্ডদ্বয় —মদ্যপান, ব্যভিচার, অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি পৈশাচিক কুক্রিয়ায় চিরাভ্যস্ত ছিল। নবদ্বীপের প্রত্যেক নরনারী—এই দুর্দ্ধর্ষ নারকীদ্বয়কে ভয় করিত। চৌর্য্যবৃত্তি নরহত্যা, গৃহদাহ, সতীত্ব হরণ—প্রভৃতি দুষ্কার্য্য সাধনে 'জগাই মাধাই'—ভদ্র সমাজে সাধারণের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়া পথে ঘাটে প্রেতলীলার আস্ফালন করিয়া বেড়াইত।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রতি—পাষণ্ডদ্বয়ের আক্রোশ জন্মিল। নিত্যানন্দ—ভ্রাতৃদ্বয়ের পাপ জীবনের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদের চরিত্র শোধনের উদ্যোগ করিলেন।

একদিন প্রভু নিত্যানন্দ স্বদলের সহিত—জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হরিধ্বনি করিলেন। সুরাপানে আরক্ত লোচন জগাই মাধাই, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের পানে চাহিল। তারপর সেই পিশাচদ্বয় নিত্যানন্দকে এক ভগ্ন মৃৎপাত্রের দ্বারা প্রহার করিল। নিত্যানন্দের ললাটদেশ হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইল। চৈতন্যদেব এ সংবাদ পাইলেন। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের উদ্ধার বাসনায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, নিত্যানন্দ চৈতন্যকে বলিলেন—"প্রভো! এ অবোধ ভ্রাতৃদ্বয়কে রক্ষা কর'। নিত্যানন্দের কথায় চৈতন্যদেব কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"ভাই নিতাই! তুমিই প্রকৃত সাধু! শত্রুকে যে রক্ষা করিতে পারে, সে দেবতা। তোমার এই উত্তপ্ত রক্ত ধারায়—জগাই মাধাইয়ের আজন্ম সঞ্চিত পাপ রাশি—আজ বিধৌত হইয়াছে।"

বাস্তবিক, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তেই—জগাই মাধাই কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে—চৈতন্যদেবের চরণে শরণাগত হইল। চৈতন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। জগাই মাধাই বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কঠিন হৃদয় অলৌকিক প্রেমের বিশ্বব্যাপী তেজে—একেবারেই গলিয়া গেল। ভক্তগণ পাপীর উদ্ধার হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিলেন। জগাই মাধাই 'হরি হরি' ব্যোমনাদে—সকলকে বিস্মিত করিয়া, প্রেম ভরে নৃত্য করিতে লাগিল।

জগাই মাধাইয়ের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে—অনেক পাষণ্ডই চৈতন্যের দৈবশক্তির মহিমা বুঝিল।

(১১)

নগরাধ্যক্ষ কাজী সাহেব একদিন পথে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় কাজির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবদের চীৎকারে কাজী সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যদি তোমরা এইরূপ

চীৎকার করিয়া দেশের শান্তিভঙ্গ কর, আমি তোমাদিগকে কারাগারে রাখিব।" কাজী সাহেব জাতিনাশেরও ভয় দেখাইলেন।

কাজীর কথায় বৈষ্ণবগণ ভীত হইলেন। আর কেহ সঙ্কীর্ত্তন করিতে সাহস করিলেন না। এ সংবাদ গৌরাঙ্গদেব শুনিতে পাইলেন। ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার মর্ম্মস্থলে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি সমস্ত বৈষ্ণবকে আহ্বান করিলেন। প্রত্যেককেই বুঝাইয়া বলিলেন—"কাজীর ভয়ে সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিলে চলিবে না, নাম সঙ্কীর্ত্তনই বৈষ্ণব ধর্ম্মের জীবনী শক্তি! আপনারা প্রস্তুত হউন, আজ আমিই আপনাদের সঙ্গে নগর সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হইব।" চৈতন্যের আশ্বাসে নিষ্প্রভ বৈষ্ণব সমাজে আবার নবজীবন সঞ্চার হইল। ভক্তগণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। আজ বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে—সে দলের নেতা স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু,—অচিরেই এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। আবাল বনিতা বৃদ্ধ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনের পথ আম্র পল্লব, পুষ্পমাল্য, দীপশ্রেণী, কদলীকাণ্ড প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন। গৃহস্থের গৃহদ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়া শুভ চিহ্ন সূচনা করিল।

গোধূলীর সময়ে, বিবাহের বর সজ্জ্যার ন্যায় নগর সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হইল। সহস্র সহস্র নরনারী পুলক পূর্ণ অন্তরে এই অভিনব সমারোহে যোগদান করিলেন। নগরবাসী পুরুষগণ, প্রজ্বলিত মশাল লইয়া এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আপনাদিগের জয়ধ্বনী মিশাইয়া দিল।

সেনাপতির আদেশে, সৈন্যগণ যেমন সংগ্রাম কৌশল প্রদর্শনে অগ্রসর হয়, চৈতন্যের ইঙ্গিতে তেমনি বৈষ্ণবগণ দলে দলে অগ্রসর হইলেন! মেঘগম্ভীর নাদী শত শত মৃদঙ্গে 'দশকুশীর' মধুর বোল বাজিতে লাগিল, করতাল, শৃঙ্গ, মৃদঙ্গের ধ্বনীর সঙ্গে বাজিয়া উঠিল! লক্ষকণ্ঠে ঐক্যতানে

—হরিনামের মহিমা ঘোষিত হইল। বিপক্ষের বুক—গৌরাঙ্গের জয় নাদে গুরু গুরু গর্জ্জনে কাঁপিতে লাগিল।

তখন, মাল্যচন্দন বিভূষিত বৈষ্ণবদল হরিগুণ গান করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন। অগ্রে অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস, পশ্চাতে —শ্রী গৌরাঙ্গ—ভুবনমোহনরূপে পথ আলো করিয়া চলিলেন! প্রভুর মস্তকে ভ্রমর নিন্দিত কৃষ্ণ অলকদাম—পবন স্পর্শে দুলিতে লাগিল, কমল নয়নে প্রাণস্পর্শী প্রেমধারা! কণ্ঠে সুবাসিত কুসুমমালা, স্কন্ধে—হিমালয় বক্ষে ভাগীরথীর ন্যায় যজ্ঞসূত্র শোভিত! দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্য রাশি ভাস্বর জ্যোতির সোহাগে উথলিতেছিল, নৃত্য ভঙ্গিমায় মনোরম পদ-সঞ্চালন দেখিয়া, ধরণী সাগ্রহে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন! গৌরাঙ্গের মুখে ঘন ঘন হরিনাম!! উভয় পার্শ্বে প্রেম বিহ্বল নিত্যানন্দ ও ভাবুক গদাধর! কি অপরূপ দৃশ্য! এই অপূর্ব্ব সমারোহ, এ উন্মত্ত ভক্তির প্রকাশ যে স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, সেই স্থানেরই অধিবাসীগণ আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল পুষ্টি করিতে লাগিল। এই বিরাট সঙ্কীর্ত্তন—অতি বড় পাষণ্ডের শরীরেও রোমাঞ্চকর উন্মত্ততা ঢালিয়া দিল।

সঙ্কীর্ত্তণ করিতে করিতে ভাবোন্মত্ত ভক্তগণ গঙ্গাপুলিনের পথ বাহিয়া চলিলেন। পুরনারীগণ মঙ্গল শঙ্খে অধর সংযোজনা করিল। লক্ষকণ্ঠে সপ্তস্বরের মূর্চ্ছনা উঠিল—

"তুয়ার চরণে মন লাগুহু রে শারঙ্গ ধর"।

ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনের দল কাজীর বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেই উত্তাল তরঙ্গ সম প্রমত্ত সমারোহের ভীষণ নিনাদে সন্তপ্ত হইয়া কাজী তাঁহার এক অনুচরকে বলিলেন—"ও কিসের গোলমাল, সন্ধান লইয়া আইস।"

দূত কাজীকে সংবাদ দিল—"নিমাই পণ্ডিতের দল গান গাহিতে গাহিতে এই দিকে আসিতেছে। শুনিয়া কাজী বাহিরে আসিলেন, সেই

বিরাট জন সংঘ দেখিয়া ভয়ে কাজীর প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সময় গৌরাঙ্গদেব কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। কাজী ভাবিলেন—বোধ হয় ইহারা সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দেওয়ার প্রতিশোধ লইতে আসিতেছে।

চৈতন্য কাজির হস্তধারণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কাজী সাহেব! ভয় কি? আমরা অত্যাচার করিতে আসি নাই। আমরা আসিয়াছি আপনার কাছে সঙ্কীর্ত্তনের অনুমতি লইতে। কাজী সাহেব! আজ আমরা আপনার অতিথি, আপনি দেশের শাসন কর্ত্তা, আপনার ক্ষমতা অসীম, আজ অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করুন্।"

কাজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"পণ্ডিতজী! বল, তুমি কি চাও?"

চৈতন্য বলিলেন—"আমাদের কীর্ত্তনে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইও না।"

কাজী নত মস্তকে চৈতন্যের কথায় স্বীকৃত হইলেন। বৈষ্ণবগণ জয় মহাপ্রভুর জয়" বলিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। আবার সঙ্কীর্ত্তণ আরম্ভ হইল।

(১২)

চৈতন্যদেব গৃহী হইয়াও আসক্তি শূন্য বৈরাগী ছিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন—এরূপ ভাবে সংসারে থাকিলে লোকে আমার নির্মুক্ত ভাব বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং লোক শিক্ষার জন্য আমায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে।

ভক্ত মণ্ডলীর কাছে চৈতন্য স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন—বিষয় স্পৃহা হইতে মুক্তি লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কার্য্য না দেখিলে, লোকে কেবল বাক্যে অনুসরণ করিতে সম্মত হইবে কেন? সুতরাং জীবের কল্যাণের জন্য চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

চৈতন্য হৃদয়ের বলে সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেন। গদাধর, নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর সহগামী হইবার জন্য প্রস্তুত

হইল। প্রিয়তমার গাঢ় প্রেমালিঙ্গন, মাতার অমিয় মধুর উদার স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের বিরহ খিন্ন বিরস বদন—চৈতন্যকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। চৈতন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন। নবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে গগণভেদী হাহাকার উত্থিত হইল। আনন্দ কোলাহলময় নবদ্বীপে শোকের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে—শ্মশানের নৈরাশ্য মাখিয়া নীরব হইল। পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহের দীর্ঘশ্বাস শুনিতে শুনিতে, স্নেহময়ী শচীমাতার নয়নযুগলে নির্ঝরিণীর উৎস দেখিতে দেখিতে, অটল প্রতিজ্ঞ চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কাটোয়া নগরে যাত্রা করিলেন।

কাটোয়ায় বিখ্যাত গোস্বামী কেশব ভারতী মহাশয় বাস করিতেন। চৈতন্য ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। যথাকালে দীক্ষা গ্রহণের আয়োজন হইল। ভারতীর অনুরোধে একজন ক্ষৌরকার চৈতন্যের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। তপ্তকাঞ্চন দেহে গৌরাঙ্গদেব অরুণ বসন পরিধান করিয়া দেপ্রবভায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিলেন। সেই দণ্ড কমণ্ডলু ধৃত ব্রহ্মাচারী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য কেশবের গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল।

১৪৩১ শকাব্দে (১৫০৯ খৃঃ) পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ক্রমে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার পর, কেশব ভারতী তাঁহার নাম রাখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব পশ্চিমাভিমুখে বহুদেশে পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে গমন করেন। নীলাচল যাত্রার পূর্ব্বে চৈতন্যদেব একবার নবদ্বীপে সকলের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই সময় শচীদেবী একবার পুত্র মুখ দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু অভাগিনী বিষ্ণু প্রিয়া নিকটে পাইয়াও পতি পাদপদ্ম পূজা করিবার অনু-

মতি পান নাই। সন্ন্যাসীর পত্নী সন্দর্শন নিষিদ্ধ। চির দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলি শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া নারী জীবনে ধিক্কার প্রদান করিয়াছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

চৈতন্যের অনন্ত লীলা সংক্ষেপে কি বলিব? মহাপ্রভুর প্রেমলীলা বঙ্গ সমাজকে এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্ম বিপ্লবে আত্মহারা মূঢ় মানব কুলকে তিনি ভক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন, ভক্তি পথের পথিক হইতে গেলে, জ্ঞান, ধন, মান— কিছুরই আবশ্যকতা নাই; বলবীর্য্য পাণ্ডিত্যেরও প্রয়োজন নাই— প্রয়োজন কেবল হৃদয়ের। বৈরাগ্য ও দৈন্যের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়া তিনি নরনারীকে শিখাইয়া গিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানবেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

(১৩)

১৪৫৫ শকে, অষ্ট চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে মহাপ্রভুর মর্ত্ত্যলীলা সমাপ্ত হয়। ভাবাবেশে উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গদেব সমুদ্র গর্ভে পতিত হন। তাঁহার শবদেহ একজন ধীবর জালে করিয়া তীরে উত্তোলন করিয়াছিল। কেহ বলেন—গদাধরের গৃহস্থিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সহিত লীন হইয়া গিয়াছিলেন।

বিষয় কীটগণকে শান্তি নিকেতন দেখাইয়া দিবার জন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গোলকধাম হইতে যে হরিভক্তি সুধা আনিয়া মর্ত্ত্যলোকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, পাষণ্ড আমরা সে অমূল্য ধনের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম না! আমরা যখন সংসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, কলুষ তাড়নায় সন্তপ্ত থাকিয়া, দারিদ্র্য শোকের আঘাত সহিয়া পাগলের মত ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াই, অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণের

আশায় শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন কৈ? একবারও তো মনে পড়ে না যে, মহাপ্রভু আমাদের জন্য যে অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই বিষম বিষয় বাসনার ঘোরতর বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র মহৌষধ! কত শতাব্দি অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে অমৃত এখনও চির নূতন। সে কল্পতরুর নিকট হাত পাতিলে, মানবের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না।

ভক্তপ্রবর নরহরি সরকার ঠাকুর

(১)

সে আজ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা ; তান্ত্রিকের তামসিকতায়—পঞ্চ মকারের প্রবল প্রলোভনে—বৃথা আড়ম্বর ও অনাচারের মধ্যে ধর্ম্ম যখন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন লক্ষ্যহীন ভাবহীন আচারহীন প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গলের জন্য বৈকুণ্ঠের অমিয় ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য সখ্য, মধুরাদি অপরূপ রস-ধারায় সিক্ত হইয়া বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। চৈতন্যের উদ্দাম ছুটাছুটিতে, অতৃপ্ত অনির্ব্বাচ্য ইন্দ্রিয়সুখ পায়ে ঠেলিয়া জীব-জগৎ প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল। গৌরাঙ্গ পাগল হইয়া অনেককে পাগল করিয়াছিলেন, বুঝাইয়াছিলেন—মানুষের সুখ-তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিবার নয়, সে চায় "সাগরসঙ্গম"—সে সাগর কোথায়? সে সাগর স্বয়ং শ্রীভগবান! জীবের পরম পুরুষার্থ, সর্ব্বদুঃখ নাশের একমাত্র উপায়, অনন্ত তৃপ্তির আধার আনন্দময় ভগবানে আত্মসমর্পণ। প্রেমের প্রথম বিকাশে দাস্য ভাবের উদয়, তখন ভক্ত ভগবানে পার্থক্য থাকে ; শেষে এই পার্থক্য ঘুচিলে ভক্তের অনুরাগ সখ্যে পরিণত হয়, সখ্য হইতে ক্রমে মধুর রসের উৎপত্তি। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের জীবনী, ইহাই প্রেমময় মহাপ্রভুর হৃদয়ের হিরণ্ময় ইতিহাস। চৈতন্য নিজলীলায় এই সকল ভাবই পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সুন্দর, বৈষ্ণবের প্রেমময় ও সুন্দর, সুন্দর না হইলে সুন্দরে মিলিবে কেন? বৈষ্ণবের যেমন আনন্দ মিলনে, তেমনি আনন্দ বিরহে। বৈষ্ণবের সাধনা ভক্তির সাধনা, প্রেমের সাধনা,—মিলনে প্রাপ্তি,

বিরহে অনন্ত ব্যাপ্তি।' বৈষ্ণবের জীবনের স্বামী—চিরানন্দময় অনন্ত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমের চরমোৎকর্ষই বৈষ্ণবের রাধিকা; অনিত্যের উপর ভালবাসা ভুলিয়া, নিত্যের উপর অনন্য শরণার আত্মসম্প্রদান—বৈষ্ণবের যুগল মিলন। বৈষ্ণবের সর্ব্ব লীলার সার—মধুর "রাস-লীলা"।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভাবরাজ্যে প্রেমের বসন্ত দেখা দিয়াছিল, যখন তাঁহার উদার ধর্ম্ম, অবাধ প্রেম আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন শ্রীখণ্ডে পঞ্চবিংশতি জন মহা-সাধক সেই অসম্ভব স্বার্থশূন্য মহাপুরুষের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া জন্ম সফল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বৈষ্ণবধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঠাকুর নরহরি দাস সরকারের নাম আমরা সর্ব্বাগ্রেই উল্লেখ করিতেছি।

(২)

শ্রীখণ্ড কাটোয়ার সন্নিকটস্থ একখানি গণ্ডগ্রাম। ইহার চতুর্দ্দিকে হরিৎ তৃণক্ষেত্র, তাহার মাঝে গ্রামখানি যেন নীলাম্বুবেষ্টিত কুবলয় কুঞ্জের মত শোভমান!। কিন্তু হায়! বৈষ্ণবের মহাতীর্থ শ্রীখণ্ডের আর সে গৌরব নাই! এখন আছে কেবল প্রাতঃসন্ধ্যায় নিয়মিত নাম সঙ্কীর্ত্তন—মহাজন পদাবলীর অমৃতধারা! আর শত শত জীর্ণ মন্দিরে, ভগ্ন প্রাসাদে, চূর্ণ কুটিরে সেই অতীত শুভদিনের গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয়!!

এই পুণ্যভূমি শ্রীখণ্ডের এক পরম ভাগবত বৈদ্যবংশে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর নরহরির জন্ম হয়। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুকুন্দ দাস। মুকুন্দ গৌড়ের "রাজবৈদ্য ছিলেন। সুতরাং নরহরির পিতার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। মাতা পিতার আদর্শে অতি শৈশবে নরহরির প্রাণে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয়। যেখানে নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইত, সকল ভুলিয়া বালক নরহরি সেইখানেই বসিয়া থাকি-

তেন। মাতার কোলে বসিয়া তাঁহার মুখে নরহরি কৃষ্ণলীলার গল্প শুনিতেন। এই সময় হইতে শিশু-হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, পণ্ডিতের দেশ বলিয়া তখন নবদ্বীপের বড় সম্মান। সমগ্র বঙ্গের জ্ঞানের প্রবেশদ্বার নবদ্বীপে, তখন দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে আসিত। নারায়ণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য নরহরিকে এই বাণীর বিলাস-কাননে প্রেরণ করিলেন। বালকের সুন্দর আকৃতি, "প্রতপ্ত কনকোজ্জ্বল" বর্ণ দেখিয়া একজন মহা-পণ্ডিত তাহাকে ছাত্ররূপে গৃহে স্থান দিলেন। এই পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী সর্ব্বশাস্ত্র সাধনার কেন্দ্র ছিল। শুভদিনে নরহরির বিদ্যারম্ভ হইল।

একদা নবদ্বীপের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে নরহরির সঙ্গে গৌরাঙ্গ দেবের সাক্ষাৎ হয়। গৌরের সুন্দর রূপ দেখিয়া নরহরি আত্মহারা হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মনে হইল এমন সৌন্দর্য্য বুঝি তিনি আর কাহারও দেখেন নাই! নরহরির মুখে প্রেমের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া গৌরাঙ্গও মুগ্ধ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ কাহাকেও চিনিতেন না, আত্মার অলক্ষিত দৃষ্টিতে সেইদিন উভয়ের পরিচয় হইল। পরিচয় ক্রমে গাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল।

নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গকে জন্ম জন্মান্তরে সাধনার ধন, প্রাণের দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেন। নরহরিকে পাইয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ আত্ম-গৌরব অনুভব করিল। পাড়ায় পাড়ায় মহোৎসবের আয়োজন হইল।

(৩)

পিতামাতার অনুরোধে কৃতবিদ্য নরহরি শ্রীখণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। নরহরি দারপরিগ্রহে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি

গৌরপ্রেম যজ্ঞে সমস্ত কাম আহুতি দিয়াছিলেন। রমণীর মোহ কটাক্ষ তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

নরহরি আজন্ম কৌমার ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের অপূর্ব্ব লীলা, বিরহ মিলন, মান অভিমান, ধ্যান ধারণা, প্রেমের উচ্ছ্বাস, কঠোর বৈরাগ্য, অতুল করুণা, সর্ব্বোপরি তাঁহার বিরাট মহিমার মহান চিত্রগুলি নরহরির সরল হৃদয়ে অমর তুলিকাস্পর্শে অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গৌরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীখণ্ডে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। নরহরির নাম সঙ্কীর্ত্তনে ভাবের "সোণার কাঠি"র স্পর্শে নির্জীব শ্রীখণ্ড চকিতে সরস ও সজীব হইয়া উঠিল। নরহরির গৌরভক্তি আরণ্য কুসুমের মত স্বতঃ বিকশিত হইয়া দশদিক আমোদিত করিল।

তিনি চৈতন্যদেবকে পুরুষ এবং আপনাকে 'রমণী' ভাবিয়া মিলনা-কুলা সতীর পতি সমাগমের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই ভাবোন্মত্ততার সংবাদ পাইয়া, বৈষ্ণব সমাজ পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণের ধারণা হইল—এই নরহরি সামান্য ভক্ত নহেন। ইনি রাধিকার সখী "মধুমতী"—"পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা, অধুনা নরহর্য্যাখ্য সরকার প্রভুপ্রিয়ঃ।" নরহরিকে দেখিবার জন্য ভক্ত মণ্ডলী শ্রীখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নরহরির অবস্থা—"গৌরাঙ্গ-মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে, কুলশীল তার সব ভাসিয়া যায়, গৌরাঙ্গের অনুরাগে!" বৈষ্ণবগণের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। সকলেই বুঝিলেন—নরহরি রাধার সখী মধুমতীই বটে! এতদ্বিষয়ে যাথার্থ নির্ণয়ের জন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ একদিন সপারিষদে শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। নরহরি নিত্যানন্দকে অভ্যর্থনা করিলে, প্রভু মধু পান করিতে চাহিলেন। নরহরি প্রভুকে একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া দিলেন। সকলেই সেই পুষ্করিণীর জল পান করিলেন, জল মধুতে

পরিণত হইয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দ আবেগময় বক্ষে নরহরিকে আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ প্রেমিক নরহরির পদধূলি লইলেন।

(৪)

ক্রমে অনেকেই নরহরির নিকটে গৌর-প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গৌর-প্রেমে সমগ্র বঙ্গদেশ সঞ্জীবীত করিবার জন্য নরহরির মনে বহুদিন হইতেই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। চিরবাঞ্ছিত শচীনন্দনের প্রেমে তিনি যে অমৃত লাভ করিয়াছেন, সে অমৃত জগজ্জনে বিলাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ অধীর হইল। একদিন শিষ্যগণের কাছে গৌরভক্ত নরহরি মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

গৌরলীলা দরশনে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুই ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
সে গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মেনি সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হ'লে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাইবে প্রভু ?

নরহরির আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুনন্দন ঠাকুর। ইনি গৌরাঙ্গের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলিয়া বৈষ্ণব সমাজ ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করিত। কথিত আছে এই মহাত্মা চৈতন্য দেবকে চামর ব্যজন করিতেন, ইনি গৌরাঙ্গের সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় গৌরলীলা প্রকাশিত হইলে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইবে, সুতরাং রঘুনন্দন খুল্লতাত নরহরিকে পদাবলী রচনায় উৎসাহিত করেন।

* এই পুষ্করিণী অদ্যাবধি শ্রীখণ্ডে "মধুপুকুর" বলিয়া বিখ্যাত।

এইরূপে ঠাকুর নরহরিই সর্ব্বপ্রথমে গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী প্রকাশ করিয়া নবভাবে নবকল্পনায় বৈষ্ণব সাহিত্যকে অমর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। নরহরির রচিত ৪ খানি লীলাগ্রন্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত", "ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল" ও "নামামৃত সমুদ্র" সাধকোচিত অপূর্ব্ব বিনয়ে পরিপূর্ণ, ভাব সরোবরের ফুটন্ত পারিজাত প্রেমের শিশির সম্পাতে তাহা বড় উজ্জ্বল! প্রেমিকের সমস্ত প্রেম, কবির সমস্ত কল্পনা দিয়া নরহরি গৌরের মহিমা অমর ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন! অণুকরণে, তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে গোবিন্দ দাস, লোচন দাস প্রভৃতি সাধকগণ বঙ্গভাষায় গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে এ সাহস কাহারও হয় নাই।

(৫)

চৈতন্য দেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন নরহরি বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। শেষে জাজি গ্রাম-নিবাসী শিষ্যপ্রধান শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরামর্শে নরহরিও নীলাচলে যাত্রা করেন। নরহরিকে পাইয়া গৌরাঙ্গ অত্যন্ত আনন্দিত হন। সেই অবধি প্রতি বৎসর রথের সময় পুরীধামে গৌরাঙ্গের সহিত নরহরির সাক্ষাৎ হইত।

চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমে গিয়া এক মহাসঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। ঐ সম্প্রদায় সপ্তদলে বিভক্ত হইয়াছিল। ঠাকুর নরহরি একদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহার ভাগ্যে গৌরাঙ্গ দর্শন ঘটিত না। অনেক অনুনয় করিয়া গৌরাঙ্গ নরহরিকে শ্রীখণ্ডে পাঠাইয়া দিতেন।

গৌরাঙ্গের অদর্শনে নরহরির প্রাণে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। তিনি কাঁদিয়া কাটিয়া পাগলের মত ছটফট্ করিতেন। শেষে শ্রীখণ্ডের

এক নির্জ্জন স্থানে নরহরি এক ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গৌরাঙ্গ প্রভুর দারুময় বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে, চান্দ্র কার্ত্তিক দ্বাদশী তিথিতে ঠাকুর নরহরির বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। তাঁহার তিরোভাবের পুণ্যদিনে, প্রতি বৎসর শ্রীখণ্ড গ্রামে একটী মেলা বসিয়া থাকে। ঐ মেলা উপলক্ষে তথায় বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। নরহরির প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি এখনও শ্রীখণ্ডে বর্ত্তমান। বৈষ্ণবগণ ভক্তিভরে প্রভুর বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন।

নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশাবলী আজিও শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন।

লীলা-রসিক লোচন দাস

(১)

চৈতন্য যুগে, এই অধঃপতিত বঙ্গে—আচারহীন ধর্ম্মের তিমির-পটল দূরীভূত করিয়া, শত সূর্য্যের ময়ূখ মালায়—যে সকল অদ্বিতীয় মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া, কর্ম্মভোগের কঠোর আশ্রম প্রেমের কুসুম কুঞ্জে পরিণত করিয়াছিলেন—সাধকবর লোচনদাস তাঁহাদের অন্যতম। একদিন এই মহাত্মার অপরাজেয় মহাশক্তি, ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় অভিষিক্ত হইয়া, অজ্ঞানান্ধ কোটী কোটী নরনারীর উদ্ধারের জন্য, বৈকুণ্ঠের তোরণদ্বার খুলিয়া দিয়াছিল!

ত্রিলোচন, লোচনানন্দ, লোচন—তাঁহার এই তিনটী নাম; "চৈতন্য মঙ্গল" ও "দুর্ল্লভসার" গ্রন্থে—এই তিন নামেই তিনি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু লোচন নামেই তিনি বিখ্যাত। বর্দ্ধমানের দশক্রোশ উত্তরে, কোগ্রাম নামক কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, জ্ঞানগৌরব বিপুল বৈদ্যকুলে, গৌরভক্ত লোচনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর, মাতার নাম—সর্ব্বানন্দী দেবী। পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়া, লোচন দাস ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই কোগ্রামেই তাঁহার মাতুলালয় ছিল। লোচন বৈদ্যদম্পতীর একমাত্র সন্তান, পিতামাতার পবিত্র কোমল স্নেহ উষায়, তাঁহার প্রভাত জীবন সুধাময় হইয়াছিল। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত ও মাতামহী অভয়া দেবীর অত্যধিক আদরে লোচনের বিদ্যাশিক্ষার অবকাশ হয় নাই, সরল হাসি খেলার মধ্য দিয়াই তাঁহার সুকুমার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল।

কমলাকরের যথেষ্ঠ ভূসম্পত্তি ছিল। অন্নসংস্থানের কোন ভাবনা ছিলনা। সুতরাং পুত্রের শিক্ষা হউক আর না হউক, পৌত্রমুখদর্শন-রূপ মহাপুণ্যের প্রলোভনে, পিতা কমলাকর অতি অল্প বয়সেই পুত্রের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। আভিজাত্যে কমলাকর মহাকুলীন, দেশে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া তাহার সম্ভ্রম ছিল, এমন সুযোগ সত্ত্বে বাঙ্গালীর ঘরে পাত্রী জুটিবার বিলম্ব হয় না। শীঘ্রই কমলাকরের পুণ্যভবন, বিবাহ-বাসরের মঙ্গল মধুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একাদশ বর্ষীয় বালক লোচন, এক অষ্টম বর্ষীয়া বালক চম্পক দাম গৌরী দেব-বালিকাকে বধূরূপে বরণ করিয়া, মাতা পিতার পারত্রিক পিণ্ডের যোগাড় করিলেন। নববধূর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, অস্তমান রবি-সদৃশ গম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তি কমলাকর, জাগ্রত কৌতুকে আপনার অক্ষয় স্বর্গের আভাষ পাইলেন, স্নেহময়ী শ্বশ্রূর মুখেও হাস্যের রেখাও ফুটিল। কিন্তু কি জানি কেন বালিকাবধুর সহিত ক্ষণস্থায়ী সন্ধি সংস্থাপনে—লোচনের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ রহিল না। বিবাহের পর আটদিন নববধূ গৃহলক্ষ্মীরূপে স্বামীর কক্ষ উজ্জ্বল করিল,—এই আটদিন লোচনের মুখে কেহ পুলকের চিহ্নও দেখিতে পায় নাই। লোচনের মনে হইল—অনন্ত কাল-সাগরের কোটী তরঙ্গের মাঝে, যেন একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ নিঃশব্দে আসিয়া, নিয়তির লৌহ-শৃঙ্খল চিরকালের জন্য তাঁহার হৃদয়ে পরাইয়া দিয়াছে! এই বিবাহের ঘটনায়, একজনকে ঋণমুক্ত করিয়া, চিরজীবনের জন্য তিনিই ঋণী হইয়া গিয়াছেন!

সংসার যখন আপনাকে কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে ডুবাইয়া দিত, লোচন তখন অন্যমনস্কভাবে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা ব্যাধ-তাড়িত মৃগের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেন। লোচনের স্বভাব চঞ্চল ছিল বলিয়া, এ পরিবর্ত্তন কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিত না।

(২)

কিছুদিন এইভাবে অতীত হইল। কাংশাশুক পরিহিতা, পঙ্কজ-লক্ষণা প্রফুল্লমুখী শরৎ—ধরণীর বক্ষে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন। বর্ষার বিষণ্ণতা ও স্থিরগম্ভীরভাব ভুলিয়া নিসর্গ সুন্দরীর মুখে স্নেহের স্বচ্ছ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সরমময়ী সেফালী লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল। স্থলে স্থলপদ্ম, জলে কুমুদ কহ্লার কোকনদ, গগনে নির্ম্মল জ্যোৎস্না, সর্ব্বত্র ছায়ালোকের অপূর্ব্ব মাধুরী! দিবা সূর্য্যের কনক কিরণে উদ্ভাসিত, রজনী—শশি-সনাথ তারামণ্ডলী ভূষিতা; শরতের মধুর ছবির সহিত, প্রকৃতির মধুর পরিবর্ত্তন মিশিয়া, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দ-কোলাহল জাগাইয়া দিল।

প্রেমের, আনন্দের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিণতি এই শরতে! শাক্ত তাই শরতের উপাসনা করেন, বৈষ্ণবের সারদীয় মহোৎসব বড় সুন্দর, সেই চিরসুন্দর রাসমণ্ডপে—লীলাময়ের মধুর মিলন লীলা! জীব তাঁহার অনন্ত লীলার সাথী—রাসের রাসেশ্বরী! রাসের অতৃপ্ত সুখ-লালসা—প্রেমিকবরের বাঁশরী নিনাদ।

সৌন্দর্য্যের হাট শ্রীখণ্ডে তখন রাসের বড় ধূম হইত। মিলনের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া ভক্তগণ শ্রীখণ্ডে সমবেত হইতেন। সেই মহানন্দের ঈষদাভাষ এখনও নরহরি প্রমুখ মহাত্মাগণের স্মৃতি বিজড়িত শ্রীখণ্ডের শত শত তৃণলতা জটিল ভগ্ন স্তূপে, মন্দিরে দেউলে—দেখিতে পাওয়া যায়।

রাসোৎসব দেখিবার জন্য দুই চারিজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বালক লোচন দাস শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। নরহরির কানন কুটিরোত্থিত বিশ্বজাগরণ মন্ত্র—লোচনের হৃদয়কে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিল। স্পর্শ মণির স্পর্শে লৌহ পিণ্ড রত্নচ্যুতি বিকীর্ণ করে, ভাববিহ্বল বৈষ্ণব-

বৃন্দের গৌরপ্রেমে তন্ময়তা দেখিয়া, লোচনের লোচন যুগলে আনন্দের নির্ঝর বহিল। লোচন আর দেশে ফিরিলেন না, নরহরির শিষ্য হইয়া শ্রীখণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। এই অপ্রত্যাশিত মিলনের জন্যই বুঝি শ্রীখণ্ডে সেদিন মোহমধুর পূর্ণিমা রজনীর উদয় হইল।

গৌরভক্ত নরহরিকে সকলেই সম্ভ্রমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। তিনি একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহাপণ্ডিত ছিলেন। নীলাচলে, গৌরাঙ্গ-দেবের সম্মুখে, লোকানন্দ নামক জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, নরহরির নিকটে তর্কে পরাভূত হইয়াছিলেন। পুত্র লোচন সেই ধর্ম্মপ্রাণ নরহরির শিষ্য হইয়াছে,—এ সংবাদে লোচনের পিতামাতাও আনন্দিত হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে লোচন দাসের শ্রীখণ্ডে থাকাই স্থির হইল। কমলাকর মধ্যে মধ্যে পুত্রকে দেখিতে আসিতেন। পুত্রের অভিনিবেশের পরিচয় পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিত না।

চন্দন তরুর পারিপার্শ্বিক পাদপ যেমন্ তৎসৌরভে সুরভিময় হইয়া উঠে, ঠাকুর নরহরির আশ্রয়ে থাকিয়া লোচন দাসও তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সাধক হইয়া উঠিলেন। নরহরির পুত্রবৎ স্নেহ, মধুর উপদেশ মহৎ চরিত্রের অতুল প্রভাব—লোচনকে সাধনের পথে এতদুর অগ্রসর করিয়া দিল যে, তাঁহার আর সংসারে আসক্তি রহিল না। শৈশবের সুখস্বপ্নরচিত সাধের জন্মভূমি, জ্ঞানের প্রথম সোপান পিতা, অনন্ত স্নেহ-স্নিগ্ধ মাতৃক্রোড়, প্রেমের প্রতিমা প্রণয়িনী—সকলি বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া, লোচন গৌরপ্রেমে আত্মসমর্পণ করিলেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় নরহরি ঠাকুরের আদর্শে—লোচনের চরিত্র গঠিত হইল। লোচন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিলেন। আলালের ঘরের দুলাল, প্রায়শ্চিত্ত শুচি তপঃ ক্লশ যাজ্ঞিকের মত দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন।

(৩)

এদিকে লোচনের বালিকাপত্নী, সদ্যপ্রফুল্ল মধুগর্ভ অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার ন্যায় পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতেছিল; সেই পরিণয় রজনীতে শুভ দৃষ্টির সময় ব্যতীত তাহার ভাগ্যে আর স্বামী সন্দর্শন ঘটে নাই। বাসনা ও তৃপ্তির মাঝে কত যে গিরিনদী ব্যবধান—বালিকা তাহা জানিত না।

আপনার সমস্ত শৈশব-অভিধান নিরবচ্ছিন্ন অধরের হাসিতে ডুবাইয়া দিয়া, আর বড় বেশী দিন সে নিরাপদে থাকিতে পারিল না। জীবনের সুমধুর বসন্ত কাল কমনীয় যৌবন, বালিকার নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। পুষ্পস্তবক বিভূষণা নবমল্লিকার ন্যায় তাহার কোমল তনু অপূর্ব্ব শ্রীসম্পদে ভরিয়া উঠিল। যেন কোন অজ্ঞাত শিল্পীর ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে—বালিকার চটুলনয়নে অলস মদির ভাব, চরণে সবিলাস মন্থরগতি এবং সর্ব্বাঙ্গে লজ্জাবতীর সরম জাগাইয়া দিল। জীবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, পিত্রালয়ে সকলের চ'খে চ'খে থাকিয়াও তন্বঙ্গী আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিল।

অষ্টম বর্ষে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পর আরও আটটী বসন্ত তাহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—তথাপি স্বামীর পবিত্র স্মৃতি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ন্যায় এখনও তাহার প্রাণে জাগিয়া আছে। কুসুম কলিকার সৌরভের মত বালিকার হৃদয় কোরকে প্রেম যে কোথায় লুকাইয়া ছিল, তাহা সে জানিত না। কবে কোন্ পথ দিয়া তথায় অরুণালোক প্রবেশ করিল, লালসার মৃদুমন্দ সমীরণ বহিল, সুপ্ত হৃদয়কে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করিয়া দিল—তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। প্রেমের সৌরভ হৃদয়কন্দরে চাপিয়া রাখিবার জন্য বালিকা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু স্রোতের জল অতি ক্ষীণ—তাহার বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে আর তাহাকে সংযত করা অসম্ভব।

এই আট বৎসরের মধ্যে স্বামী তাহার সংবাদ লন নাই, দেখিতেও আসন নাই। সে কেবল পিতামাতার মুখ হইতে অন্তরালে দাঁড়াইয়া স্বামীর কুশল সংবাদ শুনিতে পাইত, তখন তাহার মনে হইত—এই উন্মুক্ত গগনতলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর ন্যায় বায়ুসাগরে পাড়ি দিয়া সুনীল অভ্রস্তূপ ভেদ করিয়া, বেদনাক্লিষ্ট দুঃখময় জীবনের কাহিনী লইয়া, একবার সেই হৃদয়েশ্বরের চরণ সমীপে ছুটিয়া যায়। একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য, ঈশ্বর মানুষ সকলকে সরাইয়া ফেলিয়া, প্রাণের কাছে প্রাণেশ্বরকে টানিয়া আনে!

রমণীর সেই রহস্যময় অজ্ঞেয় হৃদয়ের প্রতিধ্বনি—অন্তর্যামীর কর্ণ-গোচর হইয়াছিল।

(৪)

স্মৃতির সহিত, অতীতের সহিত যে মূর্ত্তি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, চ'খে দেখিতে না পাইলেও সে মূর্ত্তি যুবতীর প্রাণের অগোচরে ছিল না। কল্লোলিনীর কলতানে সে স্বামীর অব্যক্ত প্রণয়কাহিনী শুনিতে পাইত, শারদ জ্যোৎস্নার তরলাভায় নাথের অপরূপ রূপ প্রভাসিত দেখিত, ফুলের ফুল্ল হাসিতে স্বামীর প্রফুল্ল মুখের শোভা দেখিত, বাসন্তী মলয়ের মৃদুল স্পর্শে—জীবিতেশ্বরের কোমল করের রোমাঞ্চস্পর্শ অনুভব করিত। কবির ভাষায় তাহার অবস্থা—"ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে!" কিন্তু রমণী অনন্তের মাঝে অনন্ত প্রকৃতির মতই নীরব থাকিত।

যুবতীর এই ভাব তাহার মাতা বুঝিলেন। বুঝিলেন—শূন্য নয়নে ফুল্ল আকাশের পানে কন্যার উদাস চাহনি দেখিয়া, বুঝিলেন—অতর্কিত আহ্বানে কন্যার চকিত ভাব দেখিয়া, বুঝিলেন—কন্যার আহারে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অনুদ্যম, হাসিতে বিষন্নতা, লাবণ্যে কালিমার ছায়া দেখিয়া!

মাতা তখন জামাতাকে আনিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

স্বামীবিরহে সতীর শিশিরমথিত পদ্মিনীর ন্যায় মলিন মুখখানি দেখিয়া, প্রতিবেশিগণ লোচনের নীরস ব্রহ্মচর্য্যকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কমলাকর ঠাকুর নরহরির শরণাগত হইলেন।

নরহরি লোচনকে বিরলে বুঝাইলেন,—"ইহলোককে এমন করিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। বিশেষতঃ তুমি যখন বিবাহিত, তখন পত্নীর প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে। অনন্যশরণা আশ্রিতা অবলাকে উপেক্ষা করিলে, অপরাধী হইতে হয়, ইহাতে লোকনিন্দারও ভয় আছে। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিলে, ইষ্টদেব কখনও অপ্রসন্ন হইবেন না।

স্বয়ং আজন্ম ব্রহ্মচারী হইয়াও, নরহরি জোর করিয়া লোচনকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন—যাবার সময় বলিয়া দিলেন—"যদি সংসারে থাকিতে তোমার ভাল না লাগে, তবে পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিও। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে মাতা ও পত্নীর অনুমতি লইয়াছিলেন।"

বহু নির্ব্বন্ধে বাধ্য হইয়া লোচন শ্বশ্রু-আলয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিবাহের পর এই যাত্রাই তাঁহার প্রথম। আমোদপুরে কাকুট গ্রামে তাঁহার শ্বশুর বাটী—লোচন পদব্রজে যাত্রা করিলেন।

(৫)

গ্রামে প্রবেশ করিয়া লোচন পথিপার্শ্বে এক অসামান্য সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। চঞ্চল দীপ শিখার ন্যায় বনপথ আলো করিয়া যুবতী শূন্য কুম্ভ বক্ষে লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। অপরাহ্নের অলস সমীরণ, তাহার অযত্ন বিন্যস্ত অলকগুচ্ছ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।

শ্বশুর বাটীর পথ লোচনের জানা ছিলনা। তিনি বিনয়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠে—তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! অমুকের বাটী কোন্‌দিকে?"

রমণী পূর্ব্বোন্মুক্ত নয়ন তুলিয়া একবার আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ইঙ্গিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া পান্থকে এক সঙ্কীর্ণ পথ দেখাইয়া দিয়া অধোমুখে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

বিহঙ্গ সঙ্গীত নাদিত পাদপমূলে, প্রদোষ নক্ষত্রের আলোকে হৃদয়ের শূন্যতায় যুবক যুবতীর মুহূর্ত্তের মিলন—অদৃষ্ট দেবতা অলক্ষ্যে বসিয়া ক্রূর হাসি হাসিলেন।

লোচন শ্বশুর বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গেল।

বসন্তের জ্যোৎস্না পুলকিত মধু যামিনীতে, এক নির্জ্জন কক্ষে, বহু-কাল পরে স্বামী স্ত্রীতে চারিচক্ষের মিলন হইল। কিন্তু হায়! এ মিলন প্রণয়ের প্রথম উন্মেষেই—বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এত কাছাকাছি হইয়াও—দুইটী বিস্মিত হৃদয় পাশাপাশি শিহরিয়া উঠিল। লোচন দেখিলেন—তাঁহার পত্নী সেই পূর্ব্বদৃষ্টা যুবতী—যাহাকে পথিমধ্যে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন। রমণীও চিনিল—সেই অপরিচিত পথিক তাহারই চির পরিচিত প্রাণের দেবতা! অমনি, অতীতের স্মৃতি প্রাথার্য্য, সেই মাধুরীমাখা স্বর্ণপ্রতিমার আয়ত ইন্দিবর লোচনে অভিমানে অশ্রুর মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। তাহার পর সব স্থির! যুবতী অঞ্চল প্রান্তে সিক্ত নয়ন মুছিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সুপ্ত মানবের পদতলে সূচীবিদ্ধ হইলে সে যেমন চমকিত, বিত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে, প্রথম যৌবনের প্রথম স্বামী সন্দর্শন—তেমতি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

নবযুবতী পত্নীর এ মর্ম্মযাতনা—লোচনও বুঝিতে পারিলেন। লোচনের মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। চিরোজ্জ্বল বরণী তরুণী—দেবরাজ্যের সমস্ত সুষমা অঙ্গে মাখিয়া আজ লোচনের নয়ন সম্মুখে আবির্ভাব হইয়াছিল,—আজ তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা একটী মুখের কথায় ওলট পালট হইয়া গিয়াছে! তবুও সে—স্বামীর

পানে চাহিয়া আছে! তাহার সেই করুণ চাহনিতে বুঝি হৃদয়ের চির-সঞ্চিত অস্ফুট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরবে ব্যক্ত হইতেছিল। হায়! এই শয়নকক্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে সতী তো জানিত না—তা'র জীবনের অনন্ত তৃষা—একটী ত্রিযামা যামিনীর প্রথম যামেই নিভিয়া যাইবে!

এইবার সেই নীরব নিস্পন্দ মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখে কথা ফুটিল। সমস্ত রাত ধরিয়া স্বামীর পাদমূলে বসিয়া রমণী অনেক কথা কহিল। কথা আর থামে না। কবিরা বৃথাই কথার মাধুরীর গৌরব করেন। দূর তারকা রশ্মির মত যাহাদের মুখে কথা ফুটিতে চায় না, সেই অবলা, অশিক্ষিতা, নারীর মুখে—সেই ঘোরা নিশিথিনীর বুকে, লোচন যে স্বতঃ নিঃসৃত বীণার অমৃত ধারা শুনিলেন,—সে প্রকার গভীর কবিতা বিশ্বের কোন কাব্যেই পাওয়া যায় না। রাত্রি শেষে— নিদাঘ প্রদোষে অস্ফুট ইরম্মদ ধ্বনীর স্থায় রুদ্ধ কণ্ঠে রমণী বলিল—"আমি তোমার দাসী হইয়া জন্মিয়াছি, চিরজন্ম দাসীই থাকিব। জীবনে কখনও ঈশ্বরকে ভাবিনি, কিন্তু পলে পলে, স্বপনে, জাগরণে, কৈশোরে যৌবনে] কেবল তোমাকে ভেবেছি।—তোমাকে আর স্পর্শ করিবার অধিকার আমার নাই, কিন্তু সেবা করিবার অধিকার আছে। আর আমায় ফেলিয়া যাইও না।"

পর দিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে—লোচন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পিতার মৃত্যুতে,—অনেক ভূসম্পত্তি লোচনের করতলগত হইল। লোচনের সংসারাসক্তি একেবারেই ছিল না, দেহপিঞ্জর বিমুক্ত স্বর্গ গমনোন্মুখ জীবাত্মার স্থায় তাঁহার মন তখন সম্মুখেই চলিয়াছে। তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে দান করিয়া গ্রামের

পরিত্যক্ত প্রান্ত সীমায়—পত্নীকে লইয়া কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন।

লোচনের পর্ণকুটির অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত ছিল। সুহাসিনী শ্যামল প্রকৃতির সুশীতল আলিঙ্গনে—পত্নীর প্রশান্তমুখে—লোচন কেবল সান্ত্বনার স্বর্গীয় আভাষ পাইতেন। লোচন যুবা পুরুষ, তাঁহার পত্নীও যুবতী, তাঁহাদের ভালবাসাও বন্যার উদ্বেলিত প্রভাবে উচ্ছ্বসিত নদীর মত কুল ছাপাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু দম্পতীর এই মধুর প্রেমে মোহময় আত্মবিস্মৃতি ছিল না। ধর্ম্মের প্রভাবে, চরিত্রের দৃঢ়তায়, আলোকবিহীন স্থানের উদ্ভিদের মত দম্পতীর ইন্দ্রিয়লালসা বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই। যুবক যুবতী দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র দাম্পত্য প্রেম শেষে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে, সমর তাণ্ডবে নৃত্য করিয়া সর্ব্ববিজয়ী পঞ্চশর,—দুইটী হৃদয়কে শত চেষ্টাতেও আসঙ্গলিপ্সায় এক করিতে সমর্থ হয় নাই।

ক্রমে স্বামীর উপদেশে যুবতীর মোহের আবরণ লূতাতন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া পড়িল। পৃথিবীর সকল বন্ধন হইতে সকল অবগুণ্ঠন হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, এই অলোকসামান্যা সুন্দরী—জগতের সমক্ষে আপনার ভাস্বর-দ্যুতি প্রকাশ করিল। তাহার ষোল বৎসরের পরিপুষ্ট আবেগপূর্ণ যৌবন,—একদিনের জন্যও মদির বিহ্বলতায় স্বামীকে আলিঙ্গন করিতে চাহে নাই। শোভাশালিনী পূর্ণিমা রজনীতে, প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ ও জ্যোৎস্নার লীলা হাস্যের মধ্যে, নিভৃত চিন্তায়

* লোচনের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি—"লোচনের ডাঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ। লোচনের কুলগুরুবংশীয় পুত্তুরার অধিকারীরা আজিও তাহা ভোগদখল করিতেছেন। ঐ সকল জমিতে অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য বাস করেন।

উপবিষ্ট স্বামীর অধরে, যুবতীর সেই পূর্ণ, রসাল বিম্বাধর—তৃষিত চুম্বনের কুহরণ অনুভব করে নাই! যৌবন বসন্তের প্রথম অঞ্জলি গৌরাঙ্গ-চরণে সমর্পণ করিয়া, তরুণী প্রেম শ্রদ্ধার স্রক চন্দনে—ঈশ্বর জ্ঞানে স্বামীর পূজা করিত! তাহার তরঙ্গায়িত রূপের উচ্ছ্বাস—ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র শ্রী ফুটিয়াছিল!—ভাদ্রমাসের ভরাগাঙ্গে প্রবৃত্তির তুফান ছিল না, দীর্ঘনিশ্বাসের ঝঞ্ঝায় স্তম্ভিত আবেগ, তাহার হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনিতে পারিত না। যে নারী স্বামীর চরণে আপনাকে অক্ষুব্ধ চিত্তে সমর্পণ করিতে পারে, ধর্ম্ম স্বয়ং আসিয়া তাহাকে ভোগলালসার অন্ধকূপ হইতে তুলিয়া, নিজের নিভৃত নিরাপদ বক্ষে শত আবরণে বেষ্টন করিয়া ধরেন।

কুটির প্রাঙ্গণে বসিয়া লোচন যখন "চৈতন্য মঙ্গল" গান করিতেন, সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে যখন ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় ঝঙ্কার উঠিত,—তাহার উচ্ছ্বাস যখন মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় উত্তেজিত হইয়া, প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ গন্ধ বাহিত নৈশ সমীরণে মিশিয়া, হিল্লোলে হিল্লোলে—অপার রহস্যনিলয় আকাশের পানে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিত, যুবতী ছায়ার মত স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া তাহা শুনিত। গানের প্রতিবর্ণ তাহারই অতৃপ্ত বাসনারূপে ঝঙ্কৃত হইত। এমন নবীন যৌবন, এমন শশধর-কিরণ বিধৌত ধরাতল, এমন বসন্তের সুখস্পর্শ সমীরণ, এমন কুসুম-সুরভি সমাকুল মধুর রজনী,—সমস্তই তাহার সেই বাসনাব্যাপ্ত বেদনা-বিদ্ধ যৌবনের প্রতি প্রকৃতির তীব্র বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইত। তাহার আরক্ত নয়ন, নীহার স্নাত রক্ত কমলের মত জলে ভরিয়া আসিত!

লোচনও বুঝিতেন—ধর্ম্মপত্নী হইয়াও যুবতী আজ তাহার পক্ষে নভঃ সঞ্চারিণী সৌদামিনীবৎ দুষ্প্রাপ্য। তিনি পত্নীকে সাধনার সহচরী—আত্মার সঙ্গিনী করিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। সুন্দরীর সেই আয়ত চঞ্চল ভঙ্গিময় কৃষ্ণতার নেত্রযুগল, সেই মৃণাল গঞ্জিত চম্পক রাগরঞ্জিত

সুকোমল বাহুবল্লরী, সেই নব কিশলয় কোমল গণ্ডস্থল, সেই আকুঞ্চিত প্রশান্ত, অর্দ্ধেন্দু সদৃশ সুঠাম ললাট, আর সেই তরঙ্গিত সাগর ফেণনিভ উষারাগ দীপ্ত, উচ্ছল তৃষিত হৃদয়, লোচনের ভক্তি লুব্ধ চিত্তকে এক-মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। অথচ পত্নীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার বঙ্গবিখ্যাত মহাকাব্য চৈতন্যমঙ্গলে* এই পত্নীর প্রেমের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

(৭)

লোচনদাস—বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে উদার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার গৌরভক্তিতে বঙ্গদেশ একদিন প্লাবিত হইয়াছিল। ঠাকুর নরহরির—ইচ্ছা ছিল বঙ্গভাষায় "গৌরলীলা" প্রকাশিত হয়, মহাত্মা লোচন দাস—গুরুর সেই আশা আগ্রহের সহিত পূর্ণ করিয়াছিলেন।

"চৈতন্যমঙ্গল" বৈষ্ণব সাহিত্যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা আদি মধ্য অন্ত এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যের সমস্ত লীলাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকের অনুমান—মুরারিগুপ্তের সংস্কৃত "চৈতন্য-চরিত" অবলম্বনে—লোচন চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পাঁচালীরূপে "চৈতন্যমঙ্গল" গীত হয়। এই গ্রন্থে ইতিহাসের নীরস অস্থিপঞ্জর, ভাবপ্রবাহে সরস ও কবিত্ব কল্পনার অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়াছে। যে প্রস্তরের উপর বসিয়া লোচন দাস ইহা রচনা করেন, বৈষ্ণবগণ আজিও তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

---

* মহাপ্রভু নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন দাস একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থের নামও "চৈতন্যমঙ্গল" ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গ দেবের যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, লোচনদাস সাধনপ্রভাবে তাহা অবগত হইয়া লিপিবদ্ধ করেন। বৃন্দাবন দাস এ ঘটনা লিখেন নাই। ইহার যাথার্থ্য লইয়া উভয় কবির মধ্যে তর্কযুদ্ধ হয়। শেষে বৃন্দাবনের জননী নারায়ণী দেবী—লোচন-লিখিত ব্যাপার সত্য বলিয়া প্রকাশ করিলে, বিবাদ মিটিয়া যায়। সেইদিন হইতে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য ভাগবত" রাখা হয়, এবং লোচনের গ্রন্থ "চৈতন্যমঙ্গল" নামে খ্যাতি লাভ করে।

"চৈতন্যমঙ্গল" বৈষ্ণবের সাধনার ধন, ইহার ভাষা প্রেমের ভাষা, ভাব সর্ব্বস্ব হৃদয়ের ভাষা।

"চৈতন্য মঙ্গল" ব্যতীত—"দুর্ল্লভ সার" "রাগ লহরী" "বস্তুতত্ত্ব সার", "আনন্দ লতিকা" "প্রার্থনা" "শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলাস" ও দেহ-নিরূপণ"—এই সাতখানি গ্রন্থ লোচন দাস রচনা করিয়াছিলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে, ২৯শে পৌষ,—৬৬ বৎসর বয়সে, লোচনদাস লোকান্তরিত হ'ন। তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে অজয়নদের তীরস্থিত প্রসিদ্ধ "লোচন ডাঙ্গায়" দিবসত্রয়ব্যাপী এক বহু জনাকীর্ণ মেলা বসিয়া থাকে। ঐ মেলায় অনেক সাধু ভক্তের সমাগম হয়। লোকে ঐ মেলাকে "উজানীর মেলা" বলে।

কোগ্রামের কুনুর নদীর তীরে, লোচনের সমাধি বর্ত্তমান। বহু দূর-দেশাগত ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রতিদিন এই সমাধি পূজিত হয়। সমাধির স্থানটী কবির সমাধিরই উপযুক্ত, উপরে—আকাশের চন্দ্রাতপ, পার্শ্ব দিয়া প্রসন্নসলিলা তটিনী কলতানে প্রবাহিতা, চারিদিকে শ্যামল তৃণক্ষেত্র। সমাধি প্রদেশ কুসুমিত মাধবীলতায় বেষ্টিত—সেই মাধবী ফুল প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলির মত সমাধির উপর অহর্নিশি ঝরিয়া পড়িতেছে! দেখিলে নয়ন সার্থক হয়, অধম মনুষ্যজন্মকে কত গরীয়ান্ বলিয়া মনে হয়।

মহারাজ অমৃত পরলোক গামী হইলে, তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া, রাজ জামাতা কুলরাও রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অমৃত-কন্যার গর্ভে কুলরাওয়ের এক সন্তান জন্মিল। রাজা রাণী সন্তানের নাম রাখিলেন "মদীরাও"।

কুলরাওর মৃত্যুর পর মদীরাও দক্ষিণাপথের অধিপতি হইলেন, তাঁহার অধিকার আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। এই সময় একজন অমাত্য রাজপদে নিবেদন করিল—"মহারাজ! আপনি অসংখ্য জনপদের শাসন কর্ত্তা, কিন্তু এখনও আপনার পৈত্রিক রাজ্য "লাহোর" আপনার হস্তগত হয় নাই।" মন্ত্রীর উত্তেজনায় রাজা পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে কুলপুত্র পরাভূত হইলেন। মদীরাওর প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, কুলপুত্র ছদ্মবেশে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া, হিন্দুর প্রধান তীর্থ বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন।

(৩)

পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে পদার্পণ করিয়া কুলপুত্রের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন—কাশী জ্ঞান গরিষ্ঠ মুক্তির স্থান। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি দর্শনে তিনি বড় তৃপ্তি পাইলেন। স্থান মাহাত্ম্যে—তাঁহার মন হইতে বিষয় বাসনা একেবারেই দূর হইয়া গেল।

সাধু সন্ন্যাসী, দণ্ডী প্রভৃতি বিষয় বিরাগীদের সহবাসে থাকিয়া তিনি শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার মতি গতি ফিরিয়া গেল। তিনিই একদিন পিতৃসত্ত্ব হইতে কুলরাওকে বঞ্চনা করিয়া "নবকোট" অধিকার করিয়াছিলেন—পরস্ব হরণ করা—মহাপাপ, এই সকল অতীত ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! কুলরাও আর তো বাঁচিয়া নাই, বাঁচিয়া থাকিলে, এখনি সমস্ত আত্মাভিমন বিসর্জ্জন দিয়া কুলপুত্র কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—অনুতাপে। কুলপুত্র, কুলরাওর পুত্র মদীরাত্তর কাছে আসিয়া আপনার দোষ স্বীকার করিয়া কতই ক্রন্দন করিলেন। মহানুভব মদীরাও কুলপুত্রকে ক্ষমা করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে লাহোরের সিংহাসন অর্পণ করিলেন। সত্তত্তায় চিরবিবাদ মিটিয়া গেল।

মঙ্গল ব্রত শুচিকায় কুলপুত্র মদীরাত্তর সভায় গিয়া প্রথমেই বেদপাঠ করিয়াছিলেন। এইজন্য মদীরাও কুলপুত্রকে "বেদী" উপাধি দান করেন। সেই অবধি কুলপুত্রের বংশধরগণ "বেদী" উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া আসিতেছেন। নানকের পিতা কানু এই বংশের সন্তান বলিয়া লোকে তাঁহাকে "বেদী" বলিত।

এই কৌতুককর জনশ্রুতির সাহায্যে বুঝা যাইতেছে—শিখসমাজের নেতা নানক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪)

নানকের জীবনবৃত্তের সহিত অনেক অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা জগতসমক্ষে অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনার প্রভাব সংস্থাপিত করেন, মানব কল্পনা তাঁহাদিগের কার্য্য পরম্পরাকে ঐশী শক্তি মণ্ডিত করিয়া অতিশয়োক্তিতে দেবতা বলিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকে। নানকের জীবনও অনেক কাল্পনিক ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সে সকল অমানুষিক ব্যাপারের অনুসরণ না করিয়া আমরা কেবল মহাত্মা নানকের জীবনবৃত্তের স্থূল বিবরণ বর্ণনা করিব।

গুরু নানক অতি অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধ্যেই গণিত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার প্রভা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃই শুদ্ধাচার চিন্তাশীল ও

দয়াপ্রবণ ছিলেন। এই সকল অত্যুদার গুণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

কানুবেদী অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সংসারের অসচ্ছলতায় ব্যথিত হইয়া তিনি পুত্রের মুখাপেক্ষী হইলেন। পুত্র উপার্জ্জন করিয়া টাকা আনিলে পারিবারিক সমস্ত অভাব দূর হইবে—এই ভরসায় কাণুবেদী পুত্রকে চল্লিশটী মুদ্রা দিয়া লবণ ব্যবসায়ের পরামর্শ দিলেন। নানক টাকা লইয়া লবণ কিনিবার জন্য বিদেশে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে কোনও গ্রামে নানককে রাত্রিযাপন করিতে হইল। এই গ্রামে কেবল নিরন্ন দরিদ্রের বাস। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া, নরনারীর বুভুক্ষার হাহাকার শুনিয়া নানকের তরুণ হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আত্মবিস্মৃত হইয়া—লবণ ক্রয়ের জন্য সংগৃহীত সেই চল্লিশটী টাকা দরিদ্র সেবায় ব্যয় করিয়া, রিক্তহস্তে হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন। বলা বাহুল্য পিতামাতার কাছে তাঁহার আর লাঞ্ছনার সীমা রহিল না।

(৫)

এই সময় সাংসারিক ভোগতৃষ্ণায় তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল। পিতা এই উদাসী পুত্রকে বিষয়বন্ধনে বাঁধিবার জন্য পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। নানকের বংশগৌরব এবং বিদ্যার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল, সুতরাং পাত্রীর অভাব হইল না। ১৪১১ শকে, এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বালিকার সঙ্গে নানকের বিবাহ হইল, কিন্তু তাঁহার সংসার-বিরাগ ঘুচিল না।

ক্রমে এই পত্নীর গর্ভে, নানকের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র-দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ—শ্রীচাঁদ, ভবিষ্যতে পিতৃপদানুসরণে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীদাস গৃহবাসী হইয়াছিলেন।

শ্রীচাঁদের ধর্ম্মচাঁদ নামে এক পুত্র হয়, এই পুত্রই উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এখনও ধর্ম্মচাঁদের বংশধরগণ নানকপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নানকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান-ধর্ম্মে বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। যৌবনে নানক এই উভয় ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা কিছুতেই শান্ত হইল না। নানক দেখিলেন,—উভয় ধর্ম্মের মধ্যেই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারপূর্ণ লৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের অত্যন্ত প্রভাব। যাহাতে হৃদয়ে শান্তিলাভ লয়, যাহাতে পবিত্র ও উদার ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, নানক তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি জাতি-গত, সম্প্রদায়গত ও অনুশাসনগত সর্ব্ববিধ বৈষম্য দূরীভূত করিয়া সমদর্শী প্রণালীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যুবকের এই সাধু-চেষ্টায়, স্বর্গ হইতে অদ্বৈতদর্শি বিশ্বেশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল।

মহাত্মা নানক হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে একত্র করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন।* ভারতের যোগচারী সন্ন্যাসী আরবোপকূলের সর্ব্বত্যাগী ফকির সকলেরই কার্য্যকলাপ দেখিয়া নানক বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন। কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানের প্রকৃত আভাষ পাইলেন না। সর্ব্বত্রই কুসংস্কার, সর্ব্বত্রই কর্ম্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার,—নানক ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। শেষে সন্ন্যাসধর্ম্ম, গৈরিক বেশ পরিত্যাগ করিয়া গুরুদাস পুরজেনার ইরাবতী তটস্থিত কীর্ত্তিপুরে প্রস্থান করিলেন।

কীর্ত্তিপুরে নানক এক ধর্ম্মশালা স্থাপন করিলেন। এই স্থানেই তাঁহার উদার ধর্ম্ম মত সাধারণের কাছে প্রচারিত হইল। নানকের পূর্ব্বে যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন,—এক একটী নির্দ্দিষ্ট দেবতাকে অধিষ্ঠাত্রী করিয়া, তাঁহারা আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানক

তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে বুঝাইলেন—"বাহ্য আড়ম্বর নিষ্ফল, কেবল একমাত্র অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য সাধন।"

রামানন্দের রামসীতা, গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষ্ণু, চৈতন্যের বল্লভাচার্য্যের গোপাল—ইঁহারা সকলেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, এই সকল সাম্প্রদায়িক মত নানকের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে সুসংস্কৃত ও সংশোধিত হইয়া নব ধর্ম্মমত স্থাপিত হইল। এই ধর্ম্মমত, অতি উদার পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোক নানকের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ধীরবুদ্ধি নানকের হৃদয়ে, সংকীর্ণতা ছিল না,—তিনি লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থূল সূক্ষ্ম সকলকেই একক্ষেত্রে আনায়ন করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার অকপট প্রেমভক্তিতে, তাঁহার অকুণ্ঠিত সরলতায়, তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর শিরায় শিরায় অচিন্ত্যনীয় উৎসাহ শক্তি বিদ্যুৎদ্বেগে সঞ্চারিত হইল।

কীর্ত্তিপুরের ধর্ম্মশালায় নানক সপরিবারে বহুশিষ্যে পরিবৃত হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করেন। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে, এই স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র নিষ্কলঙ্ক জীবন-স্রোত অচিন্ত্য অগম্য অমৃত প্রবাহে মিশিয়া যায়। তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর।

গুরু নানকের অভ্যুদয় কাল—লোদীবংশের প্রাদুর্ভাবের সময়; তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন—মোগল বংশের অভ্যুদয়ের পর। ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার জীবিত কালের ষষ্ঠীবর্ষ পঞ্চ মাস ও সপ্তদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। বাবা নানক হইতেই শিখজাতির উৎপত্তি এবং অভ্যুদয়। ভারতের পরাধীনতা সময়ে, নানকের সযত্ন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, বিষয় নিস্পৃহ তপস্বীর ন্যায় ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরিশেষে এক মহাপ্রতাপশালী মহান্ জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

নানকের ধর্ম্ম ক্ষুদ্র সলিল রেখার মত পৃথিবীর একাংশে শোভা পাইতেছিল, আজকাল তাহাকে আবর্ত্তময়ী মহা তরঙ্গিণীতে পরিণত করিয়াছে! নানকের অভ্যুত্থান—জাতীয় ইতিহাসের একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য অধ্যায়। বিশ্ববরেণ্য নানকের সম্প্রদায় এক সময় ভারত-সাগরে জলবুদ্বুদের মত উত্থিত হইয়াছিল, প্রথমে লোকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি বিস্ময়স্তিমিত নয়নে চাহিয়া দেখিবার অবকাশও পায় নাই। কালমাহাত্ম্যে সেই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ ওয়াটালু বিজয়ী ব্রিটিশ তেজেরও সম্মুখীন হইয়াছিল। এখনও পঞ্জাবের প্রতিগৃহে প্রভাত সন্ধ্যায় ধ্বনিত হয়।

বিনাগুরু পুরে নাহ্ উধার,
বাবা নানক আখোয়া এহি বিচার।

পূর্ণ গুরু ভিন্ন কাহারও উদ্ধার নাই, বাবা নানক বিচারপূর্ব্বক একথা বলিয়াছেন!

বলা বাহুল্য, রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, বাবা নানক আপনার অপ্রতিহত প্রভাববলে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন!

---

* কাহারও কাহারও মতে নানকের জন্মস্থান—ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী তনবন্দী নামক গ্রামে। কিন্তু এ মত সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। তনবন্দীতে নানকের পিতা বাস করিতেন। কানাকূপ গ্রামে মাতুলালয়ে নানকের জন্ম হয়।

সাধক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা কবীর

(১)

আমাদের দেশে মহাত্মা কবীরের কাহিনী কেবল "ভক্ত মালের" পুণ্য কথায় দেখিতে পাওয়া যায়। কবীরের বাল্য জীবনী, লোক-বিস্ময়কর অভিনব গুজবের অনন্ত ভাণ্ডার! সে সকল অলৌকিক ঘটনা—বিংশ শতাব্দির বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, কবীর যে ভারতের ইতিহাসে একটী পূতোজ্জ্বল অমর নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। আমরা "ভক্তমাল" হইতে কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সঙ্কলন করিলাম।

এক্ষণে কোন কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কবীরের জন্ম যবনকুলে। কিন্তু তিনি ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। সুকুমার শৈশবেই তাঁহার নির্ম্মলচিত্ত নরনারায়ণ রামের নামে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য অনেকের ধারণা—কবীর হিন্দুবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। বিধিবিড়ম্বনায় হয়তো তাঁহার পিতামাতা মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন, সেই অবধি কবীরকে যবন আখ্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। *

কবীর যখন নিতান্ত বালক—বয়স ৫।৬ বৎসর মাত্র, তখন হইতে রামের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। শিশুর অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া ভগবান রামচন্দ্র কবীরকে স্বপ্নে দেখা দিয়া রামানন্দের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের আদেশ দেন। কিন্তু যবনকুলজাত বলিয়া যদি "রামানন্দ"

---

* ভক্তমালগ্রন্থেও কবীর যবন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

কবীরকে শিষ্যশ্রেণীতে স্থান না দেন, সেই ভয়ে কবীর "রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিলেন না। এইভাবে কিছুদিন কাটিল।

দীক্ষা গ্রহণ না করিলে শরীর বিশুদ্ধ হয় না, লোকের তখন ইহাই বিশ্বাস ছিল। কবীরও বুঝিলেন তাঁহাকে মন্ত্র লইতে হইবে, নতুবা সাধন-পথে অগ্রসর হইবার তাঁহার ক্ষমতা জন্মিবে না। কবীর দীক্ষা গ্রহণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যখন ইষ্টদেবের অনুমতি পাইয়াছি, তখন যেমন করিয়া হউক রামানন্দের শিষ্য হইব"।

রামানন্দ তখন হিন্দুর মহাতীর্থ বারাণসী ধামে বাস করিতেন। কবীর গুরুর উদ্দেশে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন।

কাশীর "মণিকর্ণিকা" ঘাট—সাধকের চ'ক্ষে বড় পবিত্র স্থান। এই মণিকর্ণিকায় রামানন্দ প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করিতে আসিতেন। কবীর ইহা জানিতে পারিলেন। একদিন গভীর রাত্রিকালে কবীর পুণ্যসলিলা মণিকর্নিকার সোপানতটে শয়ন করিয়া রহিলেন; অন্ধকার থাকিতে থাকিতে "রামানন্দ" স্নান করিতে আসিতেন। সে'দিনও যথাকালে "রামানন্দ স্নান করিতে আসিলেন, ঘাটে নামিতে নামিতে সোপানতটশায়ী কবীরের অঙ্গে তাঁহার চরণ স্পর্শ হইল। রামানন্দ শবদেহ মনে করিয়া "রাম কহ" বলিয়া সরিয়া গেলেন, কবীরের প্রাণের কামনা পূর্ণ হইল। গুরুর পদরেণুতে শুদ্ধকায় হইয়া কবীর নির্জ্জনে কুটির বাঁধিয়া দিবানিশি মহামন্ত্র "রাম" নাম জপ করিতে লাগিলেন।

(২)

শুভক্ষণে যবন কবীরের শ্রবণমূলে, রামানন্দের মুখোদ্গীর্ণ "রাম কহ" শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল। সেইদিন হইতেই কবীরের নবজীবন আরম্ভ। কবীর কৌপীন, তিলক ও মাল্য ধারণ করিয়া ভক্তসমাজে প্রবেশ করি-

লেন। অচিরেই লোকে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া আদর করিতে লাগিল।

পুত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে—কবীরের পিতামাতা শীঘ্রই এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা কাশীতে আসিয়া কবীরকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কবীরের শৈশব সহচরগণ কবীরকে সুন্দরী সহধর্ম্মিণী ও নানা ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইল। কবীর কিছুতেই ভুলিলেন না, তিনি বন্ধুগণকে স্পষ্টই বলিলেন—

নারী কি ঝাঁই পড়ত্ অঁধে হোত ভুজঙ্গ।
কবীর তিন্‌কো কোন্ গতি নিত্ নারীকে সঙ্গ॥

নারীর ছায়া সর্পের দেহে পতিত হইলে, সে সর্পও অন্ধ হইয়া যায়। হায়! নিত্য যে এমন নারীর সঙ্গে বাস করে, তা'র কি গতি হয়—ভাবিয়া দেখ!

কবীর আর গৃহে ফিরিলেন না। আত্মীয়স্বজনগণ বিফলমনোরথ হইয়া কবীরকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। কবীরের পিতামাতা তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

"আপনার ঈমান্ ছাড়ি লৈলি হিন্দুধর্ম্ম।
কে তোরে শিখাইল করিতে হেন কর্ম্ম?"

মাতৃভক্ত কবীর মাতার নিকটে অকপটে স্বীকার করিলেন, "মা! আমি রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সাধক চূড়ামণি রামানন্দ স্বামী আমার গুরুদেব। আমি আর গৃহে ফিরিব না, এই কাশীতে থাকিয়াই সাধনা করিব, তোমরা ফিরিয়া যাও।

(৩)

আশ্রমে বসিয়া স্বামী রামানন্দ শিষ্যমণ্ডলীকে নিষ্কাম ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতেছিলেন, এমন সময় এক প্রৌঢ়া রমণী রামানন্দের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সহস্র কোলাহল সঙ্কুল নগরের প্রান্তভাগে—অতি মনোরম স্থানে স্বামীজির আশ্রম। রমণী আশ্রমের প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রামানন্দের জ্যোতির্ম্ময় মুখচ্ছবি দেখিতে লাগিলেন। সহসা রমণীর প্রতি রামানন্দের দৃষ্টি পতিত হইল। রামানন্দ জনৈক শিষ্যকে রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু শিষ্যের নিকট রমণী আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে রামানন্দের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

রমণী রামানন্দকে প্রণাম করিলেন না। তাঁহার এই ব্যবহারে স্বামীজির শিষ্যগণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন, একজন পরুষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"তুই কে মাগী? গুরুজীকে একটা প্রণামও কর্‌লি না?"

রমণী গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—"কাফেরের গুরুকে আমি মুসলমানী হইয়া প্রণাম করিব?" শিষ্য বলিল—"তুই যবনী? তবে হিন্দুর আশ্রমে আসিয়াছিস কেন? তোর এখানে কি আবশ্যক?" রমণী কহিলেন—"তোমাদের গুরু আমার ছেলেটাকে কাফেরের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন কেন?" রমণীর কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিলেন—"আমি মুসলমানকে কখনও শিষ্যত্বে গ্রহণ করি নাই। তোমার পুত্র কে? আমি তাহাকে জানি না।"

ঠিক এই সময় মহাত্মা কবীর আসিয়া রামানন্দের চরণে প্রণাম করিলেন।

রামানন্দ কবীরকে কখনও দেখেন নাই, সুতরাং অবাক্ হইয়া আগন্তুক যুবার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কবীরের বৈষ্ণবের বেশ দেখিয়া শিষ্যগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আসন প্রদান করিল। সেই সময় রমণী বলিলেন—"এই আমার পুত্র। ইহাকেই তোমরা কাফেরের মন্ত্র দিয়াছ।"

রামানন্দের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। তিনি সবিস্ময়ে কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু! আমি এ রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

দেখিতেছি তোমার হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ! আমি তোমাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, অথচ তোমার মাতা অনুযোগ করিতেছেন আমি তোমায় তোমার পিতৃধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছি।"

তখন কবীর রামানন্দের চরণে পতিত হইয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কবীর মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়া ছিলেন, প্রত্যূষে স্নান করিতে আসিয়া রামানন্দ কবীরের দেহে চরণ স্পর্শ করেন, তারপর অপবিত্র শবদেহ মনে করিয়া রামানন্দ—"রাম কহ" বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া যান। সেই অবধি কবীর রাম মন্ত্র সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কবীর সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

সে সকল শুনিয়া রামানন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না। রামানন্দ উঠিয়া কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ধন্য বৎস! ধন্য তুমি, তুমি কখনও যবন নও। তুমি ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, আজ আমি সর্ব্বসমক্ষে তোমায় শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। আজ বুঝিলাম—স্বয়ং ভগবান তোমায় কৃপা করিয়াছেন।" রানানন্দের স্বর কাঁপিতে লাগিল। তিনি কবীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎসগণ! আজ তোমাদের সুপ্রভাত! আজ কবীরের শুভাগমনে এ আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। তোমরা এই মহাত্মার পদধূলি লও! ভক্তিক্ষেত্রে—হিন্দু যবনে প্রভেদ নাই। আমার রামচন্দ্র চণ্ডাল কন্যার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন।"

কবীরকে পাইয়া শিষ্যগণ সেদিন মহোৎসবের আয়োজন করিল।

কবীরের মাতা কবীরকে ফেলিয়া গৃহে যাইতে চাহিলেন না। রামানন্দ অনেক বুঝাইয়া কবীরকে মাতার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। রামানন্দ কবীরকে উপদেশ দিলেন—মাতাকে কখনও কষ্ট দিওনা, সংসারে

থাকিয়াও ধর্ম্ম সাধন হয়, যাও বৎস! দেশে ফিরিয়া যাও, আবার এখানে আসিও।"

ভক্ত কবীর গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। মাতাপুত্রে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

(৪)

কবীরের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কবীরের পিতা বস্ত্র বয়ন করিয়া স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেন। বার্দ্ধক্যের কঠোর গ্রাসে পিতাকে সামর্থ্যহীন দেখিয়া কবীরও তন্তুবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার উপর সংসারের ভার পড়িল।

কবীর যখন বস্ত্র বুনিতেন তখন তাহার মুখ দিয়া কেবল রাম নাম বাহির হইত।

একদা কবীর একখানি বস্ত্র লইয়া নগরের বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। বস্ত্রখানি তাঁহার নিজের বোনা। কবীর খরিদ্দারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন বৈষ্ণব আসিয়া বলিল, —"বাবা আমায় ঐ কাপড়খানি দাও।" কবীর ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্র খণ্ড বৈষ্ণবকে দান করিলেন।

দান করিয়া কবীর বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। তাঁহার ভাবনা হইল—কেমন করিয়া শূন্য হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন? বস্ত্র-বিক্রয় লব্ধ অর্থে আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া গেলে, তবে তাহাদের সংসার চলিবে। নহিলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে উপবাসী থাকিতে হইবে। ঐ বস্ত্র খণ্ডই আজ তাঁহার ভরসা ছিল, গৃহে তণ্ডুল কণার পর্য্যন্ত অভাব,—কবীর দশদিক শূন্য দেখিলেন। গৃহে যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না। বাটির পার্শ্ববর্ত্তী কোন বনে বসিয়া কবীর রামনাম জপ করিতে লাগিলেন।

কবীরের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন—ভক্তকে এইরূপ বিপন্ন বুঝিয়া,

ভক্তবৎসল রামচন্দ্র কবীরের রূপ ধারণ করিয়া নানাবিধ আহার্য্য লইয়া কবীরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবীরের পিতা মাতা অত জিনিষ কথনও চক্ষে দেখেন নাই! দূর হইতে পিতা মাতার হর্ষোচ্ছাস শুনিয়া কবীর যেমন বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ছদ্মবেশী রামচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ভগবানের অসীম দয়া দেখিয়া—কবীরের নেত্রযুগল প্রেমাশ্রুনীরে ভরিয়া উঠিল, তিনি—"হা প্রভো! কোথায় গেলে বলিয়া উন্মাদের মত চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন!

সেই দিন হইতে কবীরের গৃহে অন্নাভাব ঘুচিয়া গেল। কবীর নিশ্চিন্ত মনে ইষ্ট আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

(৫)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবীরের জীবনী অলৌকিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কবীর কোন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া সভাক্ষেত্রে সেচন করিতে লাগিলেন, রাজা কবীরকে উন্মত্ত মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরে পাগল! শুধু শুধু জল ছড়াইতেছিস্ কেন?" কবীর বলিলেন—"মহারাজ, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে আগুণ লাগিয়াছে, সেই আগুণ আমি নিভাইয়া দিতেছি, নহিলে সমস্ত পুড়িয়া যাইবে।" রাজা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কবীরকে সভা হইতে দূর করিয়া দিলেন।

অল্পদিন পরে রাজার কাছে সংবাদ আসিল, কবীরের কথাই সত্য। কবীর যে সময় রাজ সভায় সলিল সেচন করেন, ঠিক সেই সময়ে শ্রীমন্দিরে অগ্নি সংযোগ হইয়াছিল। মন্দিরের অর্দ্ধাংশ ভস্মশেষ হইবামাত্র —দেবতার কৃপায় প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, তাহাতেই ভগবানের বিগ্রহ ও লোকজনাদি রক্ষা পাইয়াছে।

তখন রাজার চৈতন্য হইল, তিনি সস্ত্রীক ভিখারী কবীরের শরণাগত

হইলেন। রাজ্যেশ্বর রত্নকিরীট—দরিদ্রের চরণে লুন্ঠিত হইল। কবীর রাজা ও রাণীকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

ক্রমে অনেকেই কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরকে পূজা করিতে লাগিল। কোন কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক কবীরের সাধুতা ও ইন্দ্রিয় সংযম পরীক্ষা করিবার জন্য কবীরকে বেশ্যার কুহকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান গরিষ্ঠ কবীর সকল অগ্নি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(৬)

কবীর যখন জাতিভেদ ভুলিয়া হিন্দুমুসলমান উভয় ভ্রাতাকে স্নেহের ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করিলেন, তাঁহার মুখে "রাম নাম" শুনিয়া দেশ যখন সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইল, তখন ক্রূর কর্ম্মা কতিপয় ব্রাহ্মণ কবীরের উচ্ছেদ কামনায় দিল্লীর বাদসাহের শরণাগত হইলেন। এই বাদসাহ হিরণ্যকশিপুর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন, তাহার উপর কোন কোন মুসলমানও কবীরের বিরুদ্ধে বাদসাহের কাণ ভারি করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণের অভিযোগ—"কবীর নীচ হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার করিতেছে—ইহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। মুসলমানের আবেদন, "কবীর মুসলমান হইয়া কাফেরের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, এরূপ ধর্ম্মদ্রোহীর প্রাণদণ্ড করাই উচিত।"

সম্রাটের দূত গিয়া কবীরকে ধরিয়া আনিল। কবীর প্রসন্নমুখে সম্রাটকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সম্রাট বলিলেন—"তুমি জাতিতে মুসলমান, তবে কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ কেন?" মহাত্মা কবীর উত্তর দিলেন—"ধর্ম্মে জাতিভেদ আন কেন বাবা! সব ধর্ম্মই এক।" বাদসাহ কবীরকে "রামনাম" পরিত্যাগ করিবার আদেশ করিলেন। কবীর সম্মত হইলেন না। বাদসাহ নির্ভীক কবীরের কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন।

ভক্ত প্রহ্লাদের মত কবীরের নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সম্রাটের অনুচরগণ পৈশাচিক অট্টহাস্যে গগণ কম্পিত করিল,—কবীর অক্ষতদেহে অগ্নির ভিতর হইতে উঠিয়া আসিলেন। অগাধ সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও—কবীরের মৃত্যু হইল না। শত্রুরা পরাজয় স্বীকার করিল।

নিয়তির অপ্রতিবিধেয় বিধান বলে, কবীরের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইল। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিষ্যবর্গকে আপনার আসন্ন মৃত্যুর কথা জানাইয়া সময়োচিত উপদেশ দিলেন। শিষ্যগণ কাঁদিতে লাগিল।

কবীর একখানি বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিলেন, আর কেহ তাঁহাকে উঠিতে দেখিল না। রামপদ ধ্যান করিতে করিতে রামময় প্রাণ কবীর শান্তিধামে চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুর পর কবীরের শবদেহ লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধিল। হিন্দুরা শবকে দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন, মুসলমানেরা কবীরের দেহ কবরস্থ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও কথা শুনিল না, যুক্তি তর্ক, অনুনয় বিনয়—সমস্তই বৃথা হইল। কবীরেব শবদেহের উভয় পার্শ্বে হিংসার জীবন্ত প্রতিকৃতির ন্যায় বিলোল জিহ্বা শাণিত ছুরিকায়—সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া উঠিল! হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে—আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল

তখন গ্রামের প্রধান শান্তিরক্ষক সেই বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হিন্দু, ক্ষান্ত হও, মুসলমান ক্ষান্ত হও, কবীর তোমাদের উভয় পক্ষের গুরু, সে সম্বন্ধে তোমরা পরস্পর ভ্রাতা, ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া এমন পবিত্রস্থান কলঙ্কিত করিও না। এসো—সাধুর পবিত্র দেহ—নদী সলিলে ভাসাইয়া দিই।"

একথায় কোন পক্ষ আপত্তি করিল না। কিন্তু দেহাবরণ উন্মোচন করিয়া সকলেই দেখিল—কবীরের শব দেহ যেন যাদুমন্ত্রবলে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও তাহা আর পাওয়া গেল না। শেষে সেই শবাবরণ বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া, তাহার একাংশ হিন্দুরা চিতানলে দগ্ধ করিলেন, অপরাংশ লইয়া মুসলমানগণ মহাসমারোহের সহিত কবরস্থ করিলেন।

হায়! ধার্ম্মিক চূড়ামণি কবীর অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন, আছে তাঁহার "কবীরপন্থী" ধর্ম্ম, আছে—তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ দোঁহাবলী, আছে—ভক্ত হৃদয়ে—তাহায় অক্ষয় মধুর পবিত্র স্মৃতি।

———

বৈদান্তিক রামানুজাচার্য্য

(১)

দাক্ষিণাত্যের চোলপত জেলায় শ্রীপরম্বদর বড় বিখ্যাত জনপদ। ইহা মাদ্রাজ সহরের ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগরে—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্বীয় শাখাধ্যায়ী হারীত গোত্রজ ব্রাহ্মণ কেশব ত্রিপাটী বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম কান্তিমতী দেবী।

এই কেশব ত্রিপাটীর ঔরসে, সাধ্বী কান্তিমতীর গর্ভে, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে চৈত্র মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে, মধ্যাহ্নে, কর্কট লগ্নে—এক দেব শিশুর জন্ম হয়। সেই শিশুই ভারত বিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য—শ্রীমৎ রামানুজ আচার্য্য।

গর্ভাষ্টমে রামানুজের উপনয়ন সংস্কার হয়। উপনয়নের পর তিনি পিতার কাছে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। পারলৌকিক পিণ্ডের প্রলোভনে কান্তীমতী দশম বর্ষীয় বালক পুত্রের বিবাহ দেন।
রামানুজের বয়স যখন ১৫ বৎসর—তখন কেশব ত্রিপাটীর মৃত্যু হয়। পিতৃভক্ত রামানুজ পিতার শোকে, প্রথম যৌবনে পত্নীকে ছাড়িয়া বিরাগী হইলেন। সংসারে তাঁহার আর আসক্তি রহিল না।

(২)

তৎকালে কাঞ্চীপুরে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন—তাঁহার নাম যাদব প্রকাশ মিশ্র। ব্রহ্মসূত্রের টীকা রচনা করিয়া যাদব মিশ্র পণ্ডিত সমাজে বড় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংসার ত্যাগী রামানুজ

রামানুজাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীরঙ্গনাথ"

নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই যাদব মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। রাত্রে—শাস্ত্র ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে রামানুজ পরাস্ত হইয়া মিশ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদী গুরুর সঙ্গে—রামানুজের বড় বেশী দিন বনিল না; রামানুজ—বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য—যাদব মিশ্রকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, মিশ্র তাহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। এই সূত্রে গুরু শিষ্যে একটা গুরুতর মনোবিবাদ হয়—রামানুজ কাঞ্চিপুর পরিত্যাগ করিয়া মধুরন্তক গ্রামে উপস্থিত হ'ন।

মধুরন্তক গ্রামে বিষ্ণুভক্ত যামুনাচার্য্যের প্রধান শিষ্য—মহাপূর্ণ, আপনার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ করিয়া অব্যবস্থিত চিত্ত রামানুজকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য রামানুজকে কাঞ্চীপুরে পুনঃ প্রেরণ করেন।

(৩)

কাঞ্চীপুরে আসিয়া অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক রামানুজ যখন নবোৎসাহে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন, তখন অনেকে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত বিরুদ্ধ শাস্ত্র ব্যাখ্যা মনে করিয়া রামানুজকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যাহারা মন দিয়া রামানুজের কথা শুনিল—তাহারা একে একে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন কাঞ্চীপুরে থাকিয়া রামানুজ সন্ন্যাসী বেশে বহু শিষ্য সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ঘোর সমুদ্র - মহীশূররাজ বল্লালের রাজধানী। বল্লাল জৈনপন্থী ছিলেন। রামানুজ সশিষ্যে ঘোর সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। জৈনপন্থী পণ্ডিতগণ রামানুজের যথেষ্ট বিপক্ষতা করিল, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় শেষে সকলেই পরাজিত

হইল। রাজা স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রামানুজের উপদেশে—"বিষ্ণু বর্দ্ধন" নামে রাজার নামকরণ হইল। রামানুজ ঘোর সমুদ্রে বিষ্ণুর চিত্রই প্রতিষ্ঠা রাখিয়া বৈষ্ণবগণকে প্রভুর সেবার ভার দিয়া—বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রের অধীশ্বর কৃমিকণ্ঠ চোল বৈষ্ণবধর্ম্মকে বড় ঘৃণা করিতেন। রামানুজ এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এখানে ধর্ম্ম প্রচারের তত সুবিধা হইল না। কৃমিকণ্ঠ চোলের এক রূপসী কন্যা ছিল,—রাজ কন্যা উন্মাদ রোগে বহুদিন ভুগিতেছিলেন, কোন চিকিৎসক তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারেন নাই। রামানুজের মুখে "হরিনাম" শুনিয়া রাজকন্যা প্রকৃতিস্থ হন। সাধুর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া রাজা বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমায় মুগ্ধ হন। সুযোগ পাইয়া রামানুজ—এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে "শ্রীরঙ্গ-নাথ" নামে এক বিষ্ণুব বিগ্রহ স্থাপন করেন।

রামানুজ—প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে—বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, যাহারা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতাবলম্বী ছিল—তাহারাও দলে দলে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ সমর্থন করিল। জৈনপন্থীগণও তাহার শিষ্য হইতে লাগিল, গয়াধামের বৌদ্ধগণও রামানুজকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল।

কাশ্মীরের "সারদামঠ" ভারতীদেবীর বিলাস কুঞ্জ—সাধু সন্ন্যাসীগণ "সারদা মঠকে" পবিত্র ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। একদিন রামানুজ সশিষ্যে সারদামঠে উপস্থিত হইলেন। রামানুজ স্বরচিত—"শ্রীভাষ্য" "বেদান্তসংগ্রহ" এবং "গীতাভাষ্য" নামক গ্রন্থত্রয় সারদামঠের অধ্যক্ষকে উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু মঠাধ্যক্ষ এই তিনখানি গ্রন্থ মঠে রাখিতে চাহিলেন না। তিনি রামানুজকে স্পষ্টই বলিলেন—"আপনার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, অতএব—এ সকল গ্রন্থ এমঠে আমরা রাখিতে পারিব না।" তখন রামানুজ—

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির

[এই স্থানে রামানুজ স্বামী দেহত্যাগ করেন

সারদামঠের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতমণ্ডলীকে—নিজ গ্রন্থের ভ্রম প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সূত্রে উভয় পক্ষে—তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিল, পরিণামে—রামানুজ স্বামীই জয়ী হইলেন। এইবার রামানুজের অপূর্ব্ব গ্রন্থ সারদা মঠের গ্রন্থাগারে সসম্মানে স্থান পাইল। সমগ্র দাক্ষিনাত্য প্রদেশ রামানুজের মহান্ প্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইল যে—এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের ভাগ্যে এত শিষ্য লাভ ঘটে নাই। এই সকল শিষ্যগণ "শ্রীসম্প্রদায়ী" নামে বৈষ্টব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

(৫)

সমগ্র ভারতবর্ষে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া রামানুজ— "শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে" উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটী তাঁহার বড় প্রিয় স্থান ছিল। জীবনের অবশিষ্ঠাংশ তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে—তাঁহার মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য—এক সময় ৭০০ সন্ন্যাসী, ১২ হাজার গৃহস্থ, ৫ শত কণ্ঠী এবং বহু সংখ্যক বৈরাগী একত্র সমবেত হইয়াছিলেন।

রামানুজের "শ্রীসম্প্রদায়ীর" মধ্যে মঠাধ্যক্ষ বা মোহান্ত নাই। মোহান্ত পদের পরিবর্ত্তে—রামানুজ পীঠাধিপতি" পদের সৃষ্টি করেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্যের মধ্যে—কেবল ৭৪ জন মাত্র, এই গৌরবময় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানযুগে, রামানুজের "শ্রীসম্প্রদায়" দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার একটী দলের নাম—"বেদকলাই", অপর দলের নাম "তেন কলাই"। "বেদকলাইগণ" সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী, "তেন কলাইগণ" তামিলী সাহিত্যে শ্রদ্ধাবান্।

রামানুজ রচিত ৭ খানি দর্শন গ্রন্থ—ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

তাঁহার গ্রন্থের নাম "রামানুজ-দর্শন'। তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া লোকে তাঁহাকে বৈদান্তিক শেষনাগের অবতার বলিত। রামানুজের ধর্ম্মমত—জীব, ঈশ্বর, উপায় (ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ), পুরুষার্থ ও বিরোধী (ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক) এই অর্থ পঞ্চকের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রামানুজের মতে—জীব ৫ প্রকার, ১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। কেবল, ৪। মুমুক্ষু ; ৫। বদ্ধ। ঈশ্বরের স্বরূপ ও ৫ প্রকার—১। পর, ২। ব্যূহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্য্যামী, ৫। অর্চ্চা। উপায় ৫ প্রকার,—১। কর্ম্ম যোগ, ২। জ্ঞানযোগ, ৩। ভক্তিযোগ, ৪। প্রপত্তি যোগ, ৫। আচার্য্যাভি মানযোগ। পুরুষার্থ ৫ প্রকার—১ ধর্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম ৪। কৈবল্য, ৫। মোক্ষ।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে, "শ্রীরঙ্গনাথের" পবিত্র মন্দিরে, ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে—লোকাচার্য্য রামানুজস্বামী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স—১২০ বৎসর হইয়াছিল।

———

দাদুপন্থী নিশ্চল দাস

দিল্লী হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে "কিহড়োলী" নামক একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে তারুজী দাস নামে একজন দরিদ্র গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম লছমী। তারুজীর ঔরসে লছমীর গর্ভে —দাদুপন্থী নিশ্চল দাস জন্মগ্রহণ করেন।

এই মহাত্মার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কোন কথাই জানিবার উপায় নাই। অদ্যাবধি তাঁহার জন্ম সময়ও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে—নিশ্চল দাস মহাত্মা তুলসী দাসের সম সাময়িক ছিলেন।

দাদুপন্থীরা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। শৈশব হইতেই নিশ্চল দাসের হৃদয়ে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিন বালক নিশ্চল দাসকে তদীয় জননী কিছু মরিচ কিনিতে কোনও দোকানে পাঠাইয়াছিলেন। পথে কোনও সন্ন্যাসী বালককে লক্ষণাক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া ভুলাইয়া লইয়া যান! এদিকে বাটিতে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, বালকের অদর্শনে তাহার পিতা মাতা বড়ই উদ্বিগ্ন হন। ৭ দিন পরে এক বনের মধ্যে নিশ্চল দাসকে দেখিতে পাওয়া যায়। বালক একমনে বৃক্ষ মূলে বসিয়া রামনাম করিতেছে—একজন গ্রামবাসী প্রথমেই ইহা দেখিতে পান। তারপর এ সংবাদ তারুজীকে জানান হয়। তারুজী আসিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া বাটিতে লইয়া যান।

সেই অবধি তারুজী নিশ্চলকে আর কোথাও ছাড়িয়া দিতেন না। গ্রামে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাহারই নিকট নিশ্চল দাস বিদ্যাশিক্ষা করেন। শোক-দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে—জীবের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া নিশ্চল দাস ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু

কিছুতেই তাহার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইল না। শেষে নিশ্চল দাসের মনে উদিত হয়—'জীবের সুখপ্রাপ্তির উপায় আত্মজ্ঞানলাভ।'

নিশ্চল দাসের বয়স যখন এয়োদশ বর্ষ, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সেই শোকে তাঁহার জননীরও লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। ষোড়শ বৎসর বয়সে—প্রাপ্তযৌবনা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলদাস সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

কিছুদিন কাশীবাস করিয়া "কিগডৌলিতে" ফিরিয়া আসেন। সেখানে একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়—ঐ মঠের নাম "গুরুদ্বার। "গুরুদ্বারে" এখনও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী বর্ত্তমান আছেন।

নিশ্চল দাস কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন না। শিষ্যগণকে আত্ম-তত্ত্ব শিখাইবার জন্য তিনি "বিচার সঞ্চার" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ প্রকৃতই বিচার সাগর,—বিচার সাগর আত্মজ্ঞানোপ-যোগী লহরীমালায় তরঙ্গিত। ইহার একপারে "সংসার-সৈকত", অপর পারে—"মোক্ষ উপকূল"। মধ্যে সুগভীর বেদসিদ্ধান্ত সলিলরাশি বিস্তীর্ণ! শান্তির রূপ কাণ্ডারীর কৃপায়—এই সাগর পার হইতে হয়। বাস্তবিক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর আছে কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থের ভাষা সরল, রচনাও মধুর।

নিশ্চল দাস যেমন ঈশ্বর ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি অদ্বিতীয় পণ্ডিতও ছিলেন। শাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, কাব্য ও ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, সকল শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল, তিনি কথকতা করিয়া, সাধারণের কাছে বেদান্ত মত প্রচার করিতেন। "বৃত্তি প্রভাকর" গ্রন্থে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সস্কৃত ভাষায় আত্মজ্ঞান বোধক গ্রন্থের বড় অভাব নাই, কিন্তু সংস্কৃতের ভাষায় আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের একান্ত অভাব। এই অভাব

দূরীকরণের জন্য নিশ্চল দাস—হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। "বিচার সাগর' গ্রন্থে—এ কথা তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন—

সাংখ্য ন্যায় মৈঁ শ্রম কিয়ো, পড়ি ব্যাকরণ অশেষ।
পড়ে গ্রন্থ অদ্বৈতকে, রহ্যো ন একহু শেষ।
কঠিন জু ঔর নিবন্ধ হৈ, জিন মৈ মত কে ভেদ।
শ্রম তৈ অবগাহন কিয়ে নিশ্চল দাস সবেদ॥
তিন ইহ ভাষা গ্রন্থ কিয়া রঞ্চন উপজা লাজ।
তামে ইহ এক হেতু হৈ, দয়া ধর্ম্ম শির তাজ।
বিন ব্যাকরণ ন পঢ়ি সকৈ, গ্রন্থ সংস্কৃত মন্দ,
পঢ়ৈ যাহি, অনায়াসহি, ল হৈ সু পরমানন্দ।

নিশ্চল দাস "কঠোপনিষদের" একখানি টীকাও প্রণয়ন করেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রামসিংহ নামক একজন পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। এই রাজা ও তদীয় মহিষী—নিশ্চল দাসের শিষ্য ছিলেন। ধর্ম্ম প্রাণা রাজ্ঞীকে বেদান্তের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য—"বিচার সঞ্চার" রচিত হইয়াছিল।

মহাত্মা নিশ্চল দাস—প্রকৃত নিরভিমানী, ধর্ম্মপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় এবং পরোপকারী ছিলেন। তিনি একাসনে দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে—ঐ দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কেহ তাঁহাকে আহার করিতে কিম্বা নিদ্রা যাইতে দেখে নাই।

সম্বৎ ১৯২০ সালে, দিল্লী সহরে নিশ্চল দাসের দেহত্যাগ হয়।

———

মহাত্মা তুলসী দাস

(১)

ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজীর তিরোভাব উপলক্ষে, এক বৃহৎ ভাণ্ডারার আয়োজন হইল। যেখানে যত সাধু সন্ন্যাসী মোহান্ত আছেন,—মঠাধ্যক্ষ সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল কাশীবাসী জনৈক সাধুকে নিমন্ত্রণ করা হইল না। এই অনিমন্ত্রিত সাধু একজন যজ্ঞোপবীত ধারী গোস্বামী, পাছে তিনি "ভাণ্ডারায়" সম্মিলিত সাধুমণ্ডলীর সহিত পংক্তি ভোজনে আপত্তি করেন, এই সন্দেহে গোঁসাইজীর নাম নিমন্ত্রণ তালিকায় বাদ পড়িয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে, দেশদেশান্তর হইতে সাধুগণ আসিয়া সম্মিলনীতে যোগদান করিলেন। মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সকলের জন্য আহারের স্থান করা হইল। সাধুগণ পংক্তি ভোজনে বসিলেন, প্রথমে পাতা দেওয়া হইল, তাহার পর রুটী দেওয়া হইল, একজন দাস আনিয়া দিল। সাধুরা "লক্ষ্মী নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিয়া ভোজন গ্রাস মুখে তুলিলেন।

এমন সময় কাশী হইতে সেই অনিমন্ত্রিত গোস্বামী সেখানে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামীকে কেহ চিনিত না, সুতরাং তাঁহার অভ্যর্থনাও হইল না। যেখানে সাধুদিগের পাদুকাদি রক্ষিত ছিল, আগন্তুক সেই স্থানে দাঁড়াইলেন—কারণ মঠ প্রাঙ্গণে আর এক ব্যক্তির জন্যও বসিবার স্থান ছিল না, সকল আসনই অধিকৃত হইয়াছিল।

যিনি রুটী পরিবেশন করিতেছিলেন,—তিনি পংক্তির প্রান্তভাগে—যেদিকে আগন্তুক দাঁড়াইয়াছিলেন—সেইদিকে আসিলে, আগন্তুক হাত

পাতিয়া রুটী চাহিয়া লইলেন। পরিবেশনকর্ত্তা তখন বড় ব্যস্ত এবং অন্যমনস্ক ছিলেন, সুতরাং কে যে রুটী চাহিল সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না; রুটী দিয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। ইহার পর আর এক ব্যক্তি ডাল পরিবেশন করিতে আসিলে, আগন্তুক ডাল চাহিলেন। পরিবেশন-কারী বলিল—"কিসে ডাল লইবে?"—আগন্তুক ভূপৃষ্ঠে রক্ষিত জনৈক সাধুর একপাটী জুতা কুড়াইয়া লইয়া তাহাতেই ডাল দিতে বলিলেন।

আগন্তুকের এইরূপ ব্যবহারে—ডাল পরিবেশনকারী বড়ই বিস্মিত হইল। সে দেখিল যিনি ডাল চাহিতেছেন, তাহার প্রশস্ত জ্যোতির্ম্ময় ললাটে —শ্বেতচন্দনের তিলক, কণ্ঠে তুলসী-মাল্য; বক্ষে যজ্ঞোপবীত দোদুল্যমান। পরিবেশনকারী আগন্তুককে বলিল—"একি! আপনি ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য জুতার উপর ডাল চাহিতেছেন কেন?" তখন গম্ভীরস্বরে আগন্তুক বলিলেন—

"তুলসী যাকে মুখনতে কি ধোখো আয়ত রাম।
তাকে পদকী পানহী, কে মেরে তনকা চাম॥"

অর্থাৎ "যাঁহার মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে রাম নাম বাহির হইয়াছে, তাঁহার জুতার চামড়াকে তুলসী দাস আপনার গায়ের চামড়ার চেয়েও পবিত্র মনে করে।"

আগন্তুকের কথায়, তাঁহার উপর সকল সাধুর দৃষ্টি পতিত হইল। সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব পরিণতি দেখিয়া, সকলের হৃদয় সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—এই বিনয়নম্র মহত্ত্বোজ্জ্বল মূর্ত্তি—মহাত্মা তুলসী দাসের! তুলসীদাস স্বীয় উদারতার গুণে, বিনা আহ্বানেই সুদূর কাশীধাম হইতে, এই সাধুসম্মিলনীর ভাণ্ডারা সার্থক করিতে আসিয়াছেন! তখন চারিদিক হইতে সহস্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল! মঠাধ্যক্ষ তুলসী দাসকে আলিঙ্গন করিয়া, পংক্তির মাঝখানে বসাইয়া দিলেন! ভাণ্ডারার মহোৎসব মহানন্দে সম্পন্ন হইল

(২)

মহাত্মা তুলসী দাস, সম্বৎ ১৬০০ শতাব্দিতে, যমুনাতীরবর্ত্তি রাজা পুরগ্রামে এক পুণ্য প্রথিত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। প্রতিবেশীগণ একটী সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তুলসী দাসের বিবাহ দেন, তাঁহার বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর।

পদার্পিত মাত্র যৌবনা প্রেমময়ী পত্নীকে লইয়া অপর মানবহীন কক্ষে—তুলসী দাস সংসার পাতিলেন। তিনি পত্নীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার তৃষিত নয়নের সাগ্রহ দৃষ্টি—পত্নীর প্রত্যেক, গতি বিধির অনুসরণ করিত। একদণ্ড স্ত্রীকে দেখিতে না পাইলে, সে দৃষ্টি চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইত। যুবতীও স্বামীর ভক্তিভরা ভালবাসার অর্চ্চনার যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিত। কিন্তু ভালবাসায় এই আতিশয্য সমাজের নিকট তুলসী দাসকে "স্ত্রৈণ" বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল।

প্রথম বিকশিত যৌবনে, কোন্ যুবক না কোনও যুবতীকে ভাল বাসিয়াছে? তুলসী দাস তবে পত্নীকে ভাল বাসিয়া অপরাধী কেন? তুলসী দাস একদণ্ড স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না বলিয়া, পত্নী যখন রন্ধন করিত, তুলসী দাস পাকশালার দ্বারে বসিয়া সেই শিশিরসিক্ত মুখখানি লুব্ধ নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেন। ভালবাসার এতটা বাড়াবাড়ি পত্নীরও ভাল লাগিত না। সে স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিত—"তোমার কি আর কোনও কাজ নেই?—যাও না একবার বাইরে বেড়াইয়া এসো না।" তথাপি তুলসীদাস সেস্থান ছাড়িতে পারিতেন না। বুঝি সৌন্দর্য্য সাধনায় অনন্ত জড়তায় তাঁহার চরণযুগল আবদ্ধ হইয়া পড়িত।

কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তুলসীদাসকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। এই সুযোগে তুলসীদাসের পত্নী পিত্রালয়ে গমন করিল। অনেক দিন

রমণী পিতামাতার মুখ দেখে নাই। পাছে স্বামী ছাড়িয়া না দেন, এই ভয়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই রমণী বাপের বাড়ীতে চলিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়ী বড় বেশী দূরে ছিল না।

বাটীতে আসিয়া শূন্য কক্ষ দেখিয়া তুলসীদাসের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি উন্মত্ত কাতরস্বরে পত্নীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন। উত্তরে তাঁহারি বিকৃতি কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি আসিল! তুলসীদাস আর অপেক্ষা না করিয়া একেবারেই শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে ছুটিলেন। পত্নীর ক্ষণবিরহ সহ্য করিবারও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না।

শ্বশুরবাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া তুলসীদাস দেখিলেন—তারকা-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী রোহিণীর ন্যায় সঙ্গিনীগণ পরিবৃতা হইয়া তাঁহার স্ত্রী প্রফুল্লমুখে গল্প করিতেছে। তুলসীদাসকে দেখিয়া সঙ্গিনীগণ লজ্জায় দূরে দাঁড়াইল, তুলসীদাসের স্ত্রী স্বামীর নিকটে আসিল। স্বামী উন্মাদের মত স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিলেন। স্ত্রী বলিল—"কি আশ্চর্য্য! আমি দুই দণ্ডের জন্য মা বাপকে দেখিতে আসিয়াছি, ইহাও তোমার প্রাণে সহিল না? বাটীতে আমায় চ'খে চ'খে রাখিয়াও কি তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই? আবার এখান পর্য্যন্ত আমায় জ্বালাইতে আসিয়াছ? ছিছি! আমার এই সামান্য দেহে তোমার যেরূপ আসক্তি দেখিতেছি, এইরূপ আসক্তি যদি ভগবান্ রামচন্দ্রের উপর থাকিত, তাহা হইলে তোমার ভব-যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইত।"

(৩)

মহিমাময়ী রমণীর একটীমাত্র কথায় তুলসীদাসের সুপ্ত হৃদয়ের লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব তীব্র কশাঘাতে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—তুচ্ছ রমণীপ্রেমে আত্মসম্মান বলি দিয়া এতকাল তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আসিতেছেন! পত্নীর

তিরস্কার বাক্যে তিনি আজ অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য দেখিতে পাইলেন। দুঃখে অনুতাপে, মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল।

তুলসীদাস আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। আজ মুক্ত হইয়া প্রথম নিশ্বাসে তাহার মুখ দিয়া রাম নাম উচ্চারিত হইল। হৃদয়ের কৃত্রিমতা—জীবনের জটিল মোহ আবরণ ছিন্ন করিয়া, তুলসীদাস—রজনীর অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন!

একখণ্ড ক্ষুদ্র উপলে সময় সময় যেমন নির্ঝর নীরবে গতির পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি একটী সামান্য ঘটনায় তুলসী দাসের জীবন স্রোত ভিন্নপথে প্রবাহিত হইল। তুলসী দাস যুবতী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া, শতস্মৃতি জড়িত সাধের গৃহ ভুলিয়া—পরদিন কাশী যাত্রা করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে—পত্নীর প্রীত্যর্থে আর একবিন্দু প্রেমও সঞ্চিত ছিল না।

(৪)

কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট—এক চত্বরে বসিয়া, একজন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তুলসী দাস প্রত্যহ সেখানে গিয়া রামায়ণ শুনিতেন। ব্রাহ্মণের দেবতুল্য রূপ, ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি, আয়ত অথচ কোমলোজ্জ্বল-নয়নদ্বয়, জ্যোতির্ম্ময় মুখচ্ছবি—দেখিতে দেখিতে তুলসী দাসের মনের তন্দ্রা জড়তা ঘুচিয়া যাইত।

শীঘ্রই তুলসী দাসের পরিপুষ্ট যৌবন দীপ্ত মঙ্গল শ্রীতে ভরিয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাসী সাজিলেন। সহসা এক আশ্চর্য্য ঘটনায়—তুলসী দাসের সৌভাগ্য রবি অরুণ আভায় আত্মপ্রকাশ করিল।

তুলসী দাস যে কুটিরে বাস করিতেন, তাহার অনতিদূরে একটী বদরী বৃক্ষ ছিল। প্রতিদিন শৌচান্তে যে জলটুকু কমণ্ডলুতে অবশিষ্ট থাকিত, তুলসী দাস তাহা ঐ বদরী তলে ঢালিয়া ফেলিতেন। একদিন গভীর রাত্রে—নিদ্রামগ্ন তুলসী দাস স্বপ্ন দেখিলেন—কমণ্ডলু জল সিক্ত

বদরী বৃক্ষমূলে—যেন একপ্রেতমূর্ত্তি বসিয়া আছে। ভয়ে তুলসী দাসের শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ প্রেতমূর্ত্তি—ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইল। তা'র পর তুলসী দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বৎস! তোমার প্রদত্ত জলে আমার পিপাসার শান্তি হইয়াছে, সেইজন্য আমি তোমার কিছু উপকার করিব। তুমি প্রত্যহ যে ব্রাহ্মণের কাছে রামায়ণ শুনিতে যাও—তিনি সামান্য মানব নহেন—তিনি ছদ্মবেশধারী পবন কুমার। তুমি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলে, ভগবান্ রামচন্দ্র তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন।" এই কথা বলিয়া প্রেতমূর্ত্তি—অদৃশ্য হইল। তুলসী দাসেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পরদিন প্রভাতে তুলসী দাস সেই ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন—বীণানিন্দিত কণ্ঠে রামের মহিমা গান করিতেছিলেন। সেখানে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তুলসী দাস ব্রাহ্মণের চরণ ধারণ করিয়া মনোবাসনা ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণের দয়া হইল, তিনি তুলসী দাসকে রামনামে দীক্ষিত করিলেন।

সেইদিন হইতে সেই ব্রাহ্মণকে আর কেহ কাশীতে দেখিতে পাইল না। তুলসী দাস নির্জ্জনে বসিয়া জপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অমৃত নির্ঝরিণী রসনায় রামনামের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বারাণসীর ভূভাগ ও আকাশ মণ্ডল পবিত্র হইয়া গেল। সম্বরাধিপতি অমর সিংহ প্রমুখ হিন্দু নৃপতিবৃন্দ—তুলসী দাসকে ভক্তির চ'ক্ষে দেখিলেন।

তা'র পর তুলসী দাস নানা তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। যখন তিনি চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে বহু লোকের জনতা হইয়াছিল। বহুল সম্প্রদায়ের সাধুগণকে একস্থানে একত্রিত দেখিয়া তুলসী দাসের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সাধু সহবাসের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া চিত্রকূটেই বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃস্নানে পবিত্র হইয়া তুলসী দাস—ইষ্ট পূজার জন্য চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় একটী সুন্দর বালক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বালকের সন্ন্যাসীর বেশ, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কান্তি, মস্তকে অপূর্ব্ব জটা শোভিত। বালক তুলসী দাসের নিকটে অগ্রসর হইয়া সুধা মধুর স্বরে বলিলেন—"ভাই! আমার চন্দন পরাইয়া দিতে পার?" বালকের দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া তুলসী দাসের মনে হইল—এ বালক সামান্য নহে। তুলসী দাস করযোড়ে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বালক! শুনহু বিনয় মম এহু,
তুম শ্রীরামচন্দ্র, কি কেহু?

সন্ন্যাসী বালক উত্তর দিলেন—

"সাধু সকল শ্রীরাম অবতারা!"

বালকের কথায় তুলসীদাস সর্ব্বাঙ্গে অশ্রুপুলক, স্বেদকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে তুলসীদাস চাহিয়া দেখিলেন--তাঁহার স্বহস্ত ঘষিত সেই চন্দন, আর সেই নয়নানন্দ অপরূপ বালক, তথায় নাই। তখন তুলসীদাস সেই বালকের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—এ বালক আর কেহ নহে—স্বয়ং নর নারায়ণ রামচন্দ্র!

তুলসীদাস—উন্মাদ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, যাহাকে পথে দেখেন, তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া বলেন—

চিত্রকুট কি ঘাটপর ভই সন্তন কি ভিড়,
তুলসীদাস তাহা চন্দন ঘরষতঃ তিলক দেত রঘুবীর।

এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল; তুলসীদাস স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। তুলসীদাসের প্রতি স্বপ্নেই প্রত্যাদেশ হইল—"বৎস!

আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি একখানি রামায়ণ রচনা কর—রামলীলা প্রকাশের তুমিই যোগ্য পাত্র।"

"রামায়ণ" রচনা করিবার জন্য তুলসীদাস রামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে রামায়ণের রচনা আরম্ভ হয়। বালকাণ্ড লেখা সম্পূর্ণ হইলে, বৈষ্ণবদলের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ বিবাদ হয়। তুলসীদাস সাধের অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া আবার কাশীবাসী হ'ন। কাশীধামে বসিয়া তুলসীদাস রামায়ণ সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার রামায়ণ বড় উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা ভাবুকের পক্ষে ঐশী নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র। যেখানে বসিয়া তুলসীদাস রামায়ণ লিখিয়াছিলেন—সেস্থান বারাণসীর নদীতীরে অবস্থিত ছিল। এখনও লোকে সেই পবিত্র স্থানকে "তুলসী ঘাট" নামে অভিহিত করে।

(৫)

সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া, তুলসীদাস একরকম "ভবঘুরে" হইয়া পরিয়াছিলেন। পাছে কোনও স্থানে ২।৪ দিন থাকিলে সেস্থানের উপর মমতা জন্মে—এই ভয়ে তিনি একপথে থাকিতে চাহিতেন না।

তাঁহার সঙ্গে একটী প্রকাণ্ড ঝুলি থাকিত, ঐ ঝুলিতে মোটা কম্বল হইতে আরম্ভ করিয়া, পূজার ফুলচন্দন—এমনকি রন্ধনের মস্লা পর্য্যন্ত বিরাজ করিত। তুলসীদাস আজ এদেশ, কাল ওদেশ করিয়া বেড়াইতেন। পথ চলিতে চলিতে যেস্থানে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন সেদিনকার মত সেই স্থানেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। তিনি স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণবাটীতে গিয়া মুষ্টিমেয় তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিতেন, কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই অন্ন পাক করিতেন। বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তুলসীদাস কাহারও স্পৃষ্ট অন্ন স্পর্শ করিতেন না, স্বহস্তেই পাক সমাধা করিতেন।

একদিন তুলসীদাস লোকমুখে শুনিতে পাইলেন—কাশীর কিঞ্চিৎ দূরে কোনও গ্রামে একজন সাধু আসিয়াছেন। তুলসীদাস সেই সাধু দর্শনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সাধুকে দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না, সাধুর গৈরিক বেশ ভণ্ডামীর রূপান্তর বুঝিতে পারিয়া তখনি তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

যখন তুলসীদাস কাশীতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন মাথার উপর অনলবর্ষী দীপ্ত দিবাকর। পথশ্রান্ত তুলসীদাস আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। সে বাটীতে এক বর্ষীয়সী রমণী ব্যতীত দ্বিতিয় কেহ ছিল না। রমণী তুলসীদাসের রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

অন্নপাক হইলে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যঞ্জনের জন্য—হরিদ্রা ও লবণ আনিব কি ?" তুলসীদাস বলিলেন—"না, লবণ ও হরিদ্রা আমার ঝুলিতেই আছে।" রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে লঙ্কা আনিয়া দিব কি ?" সেবারও তুলসীদাস বলিল—"উহাও আমার ঝুলিতে আছে।" এইরূপে রমণী যাহা যাহা আনিয়া দিতে চাহিলেন, তুলসীদাস নিজের ঝুলিমধ্যে যে সমস্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিলেন।

তখন রমণী বলিলেন—"ঝুলিতে যখন লঙ্কা হরিদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া লবণ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য স্থান পাইয়াছে, তখন তাঁহার পত্নীকে পরিত্যাগ করা ভাল হয় নাই।" রমণীর কথায় তুলসীদাস সবিস্ময়ে তদীয় সুশ্রূষাপরায়ণার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আর তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না—এ রমণী অন্য কেহ নহেন, ইনি তাঁহারই পরিত্যক্তা পত্নী—কাত্যায়নী দেবী।

এইবার তুলসীদাস বিপদে পড়িলেন; তিনি পূর্ব্বে রমণীকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু—পত্নীর সতর্ক দৃষ্টির কাছে বহু পূর্ব্বেই তাঁহার

সন্ন্যাসীবেশ ধরা পড়িয়াছিল। রমণী আর স্বামীকে একা ছাড়িয়া দিলেন না, তিনি ধর্ম্মে স্বামীর "সহধর্ম্মিণী" হইলেন।

(৬)

তুলসীদাস গৃহত্যাগী হইলে, তাঁহার পত্নীরও চৈতন্য জন্মিয়াছিল। সাধ্বী স্বামীর অদর্শনে অধীর হইয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া—বহুদিন পূর্ব্বে কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। বিধাতার করুণায়—জীবনের শেষভাগে স্বামী স্ত্রীতে আবার মিলন হইল। দম্পতীর মধ্যে এমন যে ভালবাসা হইয়াছিল, তাহাতে লালসার নামগন্ধ ছিল না, সে ভালবাসা ভক্তিতে শ্রদ্ধায়, স্নেহে আদরে—প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল।

১৪২৪ খৃষ্টাব্দে—কাশীধামে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী কূলে, তুলসীদাসের মানবলীলা শেষ হয়। পত্নীও স্বামীর শব বক্ষে ধরিয়া জ্বলন্ত চিতায় সহর্ষে আরোহণ করেন।

তুলসীদাস বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক রামায়ণে যিনি "রাম" নামে উক্ত হইয়াছেন, তিনি শঙ্করাচার্য্যের সেই ব্রহ্ম। এই গ্রন্থ ছাড়া তুলসীদাস অনেকগুলি দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার দোঁহাবলী ভক্তি ও নীতিতে স্নিগ্ধ ও মধুর।

গুণজ্ঞ ডাউজ সাহেব তুলসীদাসের রামায়ণ—ইংরাজি ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তুলসীদাসের জন্ম মূলা নক্ষত্রে। এইজন অতি শৈশবেই তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। এই অশুভক্ষণে জাত অনাথ শিশুকে কোন প্রতিবেশী আশ্রয় দেন নাই। একজন সন্ন্যাসী তুলসীদাসকে প্রতিপালন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীর সঙ্গে তুলসীদাসের বিবাহ হইয়াছিল। দীনবন্ধু উক্ত সন্ন্যাসীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন।

যোগীবর পওহারী বাবা

[১]

জোনপুর জেলার প্রেমার পুরে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী নামে একজন নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক গৃহস্থ বাস করিতেন। অযোধ্যার সাংসারিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না।

লছমী নারায়ণ নামে—অযোধ্যার এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, প্রথম যৌবনেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। লক্ষ্মী নারায়ণ গৃহত্যাগী হইয়া গাজীপুর জেলার কুর্থা গ্রামে—পুণ্যস্রোতা জাহ্নবীর তীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেন, বাটীতে একেবারেই আসিতেন না। তবে মধ্যে মধ্যে ভ্রাতাকে পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অযোধ্যানাথ মধ্যে মধ্যে গিয়া ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিতেন।

অযোধ্যানাথ তাঁহার কোন প্রতিবাসীর এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যানাথের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সময় লছমী নারায়ণ নবজাত ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিবার জন্য একবার বাটীতে আসেন। নব কুমারকে সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ অত্যন্ত প্রীত হন এবং গাজিপুর যাইবার সময় ভ্রাতাকে অনুরোধ করিয়া যান—"বালকের নাম যেন "রাম ভজন" রাখা হয়।"

[২]

তিন বৎসর বয়সে "রাম ভজন" কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন। রোগ—সাংঘাতিক বসন্ত। ৪০ দিন ধরিয়া যমে মানুষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। স্বামী

স্ত্রীতে মিলিয়া অনাহারে অনিদ্রায়—অনবরত পরিশ্রম করিয়া যমদূত গুলাকে তাড়াইয়া দিলেন। যাইবার সময় যমদূতেরা—বালকের সর্ব্বাঙ্গে তাহাদের অস্ত্রচিহ্ন রাখিয়া গেল এবং প্রভুকে লুণ্ঠন দ্রব্য উপহার দিবার জন্য—বালকের একটী চক্ষু হরণ করিয়া লইয়া গেল। অতিকষ্টে বালক রক্ষা পাইল।

এক চক্ষুহীন বালক রামভজনকে পিতামাতা আদর করিয়া "শুক্রাচার্য্য" বলিয়া ডাকিতেন।

পঞ্চম বৎসর বয়সে বালকের উপনয়ন হইল। অযোধ্যানাথ পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অত্যধিক আদরে—শিশুর শিক্ষা তত অগ্রসর হইতে পারিল না।

[৩]

এই সময় সংবাদ আসিল—লছমী নারায়ণ অত্যন্ত পীড়িত। ভ্রাতৃ-বৎসল অযোধ্যানাথ গাজীপুর যাত্রা করিলেন। তাঁহার সুশ্রূষাগুণে লছমী নারায়ণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। কিন্তু একেবারে আরোগ্য হইতে পারিলেন না, মধ্যে মধ্যে পীড়ার প্রকোপ হইত, আবার সারিয়া যাইত। অযোধ্যানাথ অগ্রজকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন—লছমী নারায়ণ সম্মত হইলেন না। কাজেই অযোধ্যানাথ ক্ষুণ্ণ মনে বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমাগত রোগ ভোগ করিয়া, লছমী নারায়ণের চক্ষু দুইটী নষ্ট হইয়া গেল, তিনি অন্ধ হইয়া গাজিপুরে পড়িয়া রহিলেন। অযোধ্যানাথ অগ্রজকে বিপন্ন দেখিয়া অগ্রজের সেবার জন্য—পুত্র রামভজনকে অগ্রজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বালকের বয়স তখন ১০ বৎসর মাত্র।

কুর্থা গ্রামে—সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য বহুপণ্ডিত বাস করিতেন। বালক রাম ভজন—অন্ধ জ্যেষ্ঠতাতের কাছে থাকিয়া. এই সকল পণ্ডিত-দের কাছে শিক্ষা করিতেন। ক্রমে বেদান্ত দর্শনে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিল। লছমী নারায়ণের সাহায্যে থাকিয়া বালক সংসারকে ঘৃণা করিতে শিখিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লছমী নারায়ণ লোকান্তরে গমন করেন। জ্যেষ্ঠ-তাত বিয়োগে রামভজন বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। দেশভ্রমণে যদি মনে শান্তি আসে—ইহা ভাবিয়া রামভজন বহুতীর্থে ভ্রমণ করিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত—ভারতের সমস্ত তীর্থ তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু কোথাও শান্তি পাইলেন না। রামভজন লছমী নারায়ণের নিকট কিছু কিছু যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিলেন,—তীর্থ পর্য্যটন শেষ করিয়া বারাণসী ধামে ফিরিয়া যাইয়া তিনি নির্জ্জনে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলেন।

[৪]

পিতামাতা—বালককে আর সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। রামভজন কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া—লোকে চমৎকৃত হইল। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতে রামভজন অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কোন দিন সামান্য দুগ্ধ পান করিতেন, কোন দিন বা বিল্বপত্র বা অশ্বত্থ পত্রের রস পান করিতেন।

এই সকল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে "পবন আহারী বাবা" বলিয়া ডাকিত। এই নামই লোক রসনায় সংক্ষিপ্ত হইয়া "পওহারী বাবা"য় পরিণত হয়।

কিছুদিন পরে, পওহারী বাবা—বৃক্ষপত্রের রসপানও ছাড়িয়া দিলেন,

তিনি কেবল ৫০টী লঙ্কা বাটীয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া তাহার রস পান করিতে লাগিলেন।

সাধুর থাকিবার জন্য—কোন কোন ভক্ত চাঁদা তুলিয়া একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, পওহারী বাবা—এই গৃহে দ্বারবদ্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এ অবস্থায় তিনি কিছুই খাইতেন না। যোগ সাধনার পর যখন তিনি গৃহের বাহিরে থাকিতেন,—তখন তাঁহার দেহ হইতে এক পবিত্র জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইত। সে সুভোজ্জ্বল জ্যোতির দিকে—লোকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিত না।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে—তিনি তিন দিন মাত্র গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়াছিলেন। সেই সময় অনেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

ইহার পর ১৫ বৎসর কাল—আর তিনি দ্বার খোলেন নাই।—১৫ বৎসর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, সহসা তিনি একদিন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসেন। তারপর এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে ভারতের সকল তীর্থের সন্ন্যাসীগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সাধুগণকে ভোজন করাইয়া পওহারী বাবা আবার দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিলেন ; সে দ্বার আর খোলেন নাই।

[৫]

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে—যোগগৃহের দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—পওহারী বাবা সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে শত শিখায় যজ্ঞাগ্নি জ্বলিতেছে! দর্শকদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।

যোগী কাহারও সহিত কথা কহিলেন না, তিনি ঘৃতাক্ত দেহে—অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব সহস্র শিখায় সে পবিত্র দেহ

বেষ্টন করিল। দেখিতে দেখিতে সাধুর নশ্বর দেহ দগ্ধ হইয়া গেল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে—যোগীবর অনন্তধামে প্রস্থান করেন।

পরদিন প্রভাতে—ভক্তগণ সাধুর ভস্মাবশিষ্ট পবিত্র অস্থি সযত্নে তুলিয়া আনিয়া পূতসলিলা জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

যেখানে পওহারী বাবা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার নির্ব্বাণ স্মৃতিরক্ষার জন্য, সম্প্রতি এক সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ পওহারী বাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাবাকে সংসারে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করিলে, বাবা হাস্যমুখে উত্তর দিয়াছিলেন—"ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া আমি কি নাককাটা সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করিব?"
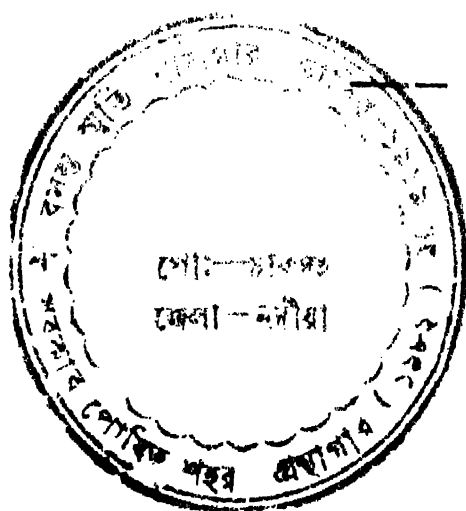
কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন

(১)

সে আজ প্রায় দুই শতাব্দীর কথা—সাহিত্যেতিহাসের কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে, সাধক চূড়ামণি রামপ্রসাদ ললিতমধুর পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন,—সাহিত্য সাগরে সে বিশাল তরঙ্গের কম্পন এখনও অনুভূত হয়।

অনুমান ১৬৪২ শকে * হা'ল সহরের অন্তর্গত কুমারহট্টগ্রামে, কোন বিখ্যাত বৈদ্যবংশে—শক্তি ভক্ত রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাম রাম সেন। তদ্রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষাংশে তিনি যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্ন কালিকা কৃপামই।
সেই বংশ সমুদ্ভূত— ধীর সর্ব্ব গুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনুচির দিনান্তর, জন্মিলেন "রামেশ্বর",
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।
তদঙ্গজ "রামরাম" মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ি, ময়ি—করু দয়া॥

---

* কাহারও মতে ১১২৭ বঙ্গাব্দে—রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহাতে বেশ বুঝা যায়—রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নির্ধন ছিলেন না। এই বংশের আদি পুরুষের নাম—কীর্ত্তিবাস সেন। কর্ত্তিবাসের সুবিস্তীর্ণ জমীদারী ছিল। "রাম রাম সেন" পর্য্যন্ত—সেই জমীদারীর উপস্বত্ব ভোগ করিয়াছিলেন।

(২)

রামপ্রসাদের বিশ্বস্ত জীবনচরিত্র একখানিও নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনের সঙ্গে অনেক কিম্বদন্তী লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। "নব্য ভারতের" কায়স্থ লেখক রামপ্রসাদের জাতী মারিবার চেষ্টা করিয়াছেন; সে ঘটনা ১৩০২ সালের। এই লেখকের নাম—রসিকচন্দ্র বসু। ইনি রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের প্রধান সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রযুক্ত "মধ্যম নারায়ণের" ব্যবস্থায়—রসিকচন্দ্রের "রসিকতা" ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

রামপ্রাদের বাল্যকাল কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছিল—তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু জানা যায়—অন্য বালকের মত তাঁহার প্রকৃতি চঞ্চল ছিল না, তিনি ধূলাখেলা খেলিতে খেলিতেই—কালিকার প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিলন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, পারসী ও বঙ্গ এই তিন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

রাম রাম সেন বড় বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। পুত্র রামপ্রসাদের কোমল স্কন্ধে সংসারের গুরুভার অর্পণ করিয়া, তিনি লোকান্তরিত হইলেন। রামপ্রসাদের একটী ভগ্নী এবং দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। এই ভগ্নীর নাম "অম্বিকা"—পিতা থাকিতেই অম্বিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বালিকা—শ্বশুর বাটীতেই থাকিত। রামপ্রসাদের সহোদরদ্বয়—নিধরাম ও বিশ্বনাথ—রামপ্রসাদের কাছেই থাকিতেন।

পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই রামপ্রসাদ মাতৃহীন হ'ন। এই সময় প্রসাদকে অপ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার কোন প্রবল জ্ঞাতি ষড়যন্ত্র করিয়া,

রামরামের জমিদারীটুকু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া বিপন্ন প্রসাদ ঘোর দারিদ্রের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না।

এই বিপদের সময়—ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস—রামপ্রসাদকে আশ্রয় দান করেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ দরিদ্র ছিলেন, এইজন্য রাম-প্রসাদকে তিনি চাকুরী করিবার পরামর্শ দেন।

(৩)

লক্ষ্মীনারায়ণ কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি চেষ্টা করিয়া ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বাটীতে রামপ্রসাদকে জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীর পদে-চাকুরী করিয়া দেন। তখন রামপ্রসাদের বয়স ১৭।১৮ বৎসর। *

রামপ্রসাদকে মণিবের হিসাবপত্র সব রাখিতে হইত। কিন্তু চাকুরীতে তাঁহার একেবারে অনুরাগ ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তির ভক্ত ছিলেন,—কিশোর বয়সেই রামপ্রসাদের জীবনে শক্তি ভক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। জগন্মাতা কালিকার দাস্যছাড়া, গোকুল ঘোষালের মুহুরীগিরিকে তিনি "ভূতের বেগার" মনে করিতেন।

অল্পদিন চাকুরী করিবার পর, একদিন, রামপ্রসাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হিসাব নিকাশের খাতা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন—খাতার যেখানে একটু স্থান আছে, রামপ্রসাদ সেইখানেই একটী গান রচনা করিয়াছেন। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী রামপ্রসাদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, অর্ব্বাচীন মুহুরীর হাতে পড়িয়া জমীদারের পাকা খাতা একেবারেই মাটী হইয়া গিয়াছে,—কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ সেই খাতাখানি ও তৎসঙ্গে অপরাধী রামপ্রসাদকে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রভু সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া স্বয়ং খাতা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। কর্ম্মচারী খাতাখানি

* কেহ কেহ বলেন—খিদিরপুর কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র রামপ্রসাদের প্রভু ছিলেন।

প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। প্রভু খাতা খুলিয়াই দেখিলেন—নবীন মুহুরীর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"আমায় দেও মা তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী!

প্রসাদের প্রভু হৃদয়হীন ছিলেন না। তিনি গানটী ২।৩ বার পড়িলেন,—তাঁহার নেত্রকোণে ভাবুকতা অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—"প্রসাদ একজন প্রকৃত ভক্ত, তিনি শ্যামামায়ের তবিলদারী চাহেন। তাই, আপনার অবস্থা আপনার সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়া, সরলহৃদয় প্রসাদ তাঁহার আবেগময় হৃদয়ের মর্ম্ম কথা হিসাবের খাতায় লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

সেইদিন হইতেই প্রসাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। সেইদিন হইতেই মানুষের দাসত্ব হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন। শুধু মুক্তি নয়—প্রভু প্রসাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রসাদের চাকুরী জনিত মানসিক নির্ব্বেদ—একেবারেই ঘুচিয়া গেল। তখন পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের মত রামপ্রসাদ কুমারহট্টে ফিরিয়া আসিয়া মুক্তকণ্ঠে শ্যামানামের তা'ন ধরিলেন! সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুধাধারায় আজিও বঙ্গদেশ প্লাবিত!

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে ভাজনঘাট নিবাসী লোকনাথ দাসগুপ্তের কন্যা যশোদাদেবীর সহিত রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুর-কুলের পরিচয় এতদধিক আর কিছুই জানা যায় না।

(৪)

রামপ্রসাদ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। স্বহস্তে মাটি কাটিয়া কুঠির নির্ম্মাণ করিলেন। গুণবতী পত্নীকেও শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিলেন।

ঘোর নিশীথে, তিনি জাহ্নবীতীরে বসিয়া কালিকা নাম্ জপ করিতেন, জগদম্বার করুণ অমিয় দৃষ্টি সিঞ্চনে এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বশক্তি বিকশিত হয়। এই সময় হইতেই তিনি সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ

করেন। তাঁহার সঙ্গীত—সাদা কথায় অপূর্ব্ব ভাবময়, যেন জলদ-জালাচ্ছন্ন সূর্য্যের কিরণ; সে সঙ্গীত যে একবার শুনিত, সে আর ভুলিতে পারিত না।

রামপ্রসাদের পত্নী অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন, স্বামীর আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। একদিন এই মহিয়সী মহিলা স্বপ্ন দেখিলেন—যেন জগদম্বা বলিতেছেন—"তোমার স্বামীকে রামকৃষ্ণমণ্ডপের সিদ্ধপীঠে সাধন করিতে বল, তাহা হইলেই আমি তাহাকে দেখা দিব।" নিশিথের স্বপ্ন বিফল হয় না, এই বিশ্বাসে পতিব্রতা প্রভাত হইবামাত্র পতিকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন। পত্নীর প্রতি মায়ের প্রত্যাদেশ হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয় যেমন আনন্দিত হইল, তেমনি শ্যামামা'র প্রতি একটু অভিমানেরও উদয় হইল। রামপ্রসাদ নিজমুখেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

"ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ যাঁরে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥"

রামপ্রসাদ পত্নীকে আপনার চেয়েও ভাগ্যবতী বলিয়া জানিতেন। পত্নীর কথায় তিনি "সিদ্ধপীঠে" সাধনা করিতে উদ্যোগ করিলেন।

হালি সহরের শিবের গলিতে একটু পতিত জমী ছিল, লোকে তাহাকে রামকৃষ্ণ মণ্ডপ বলিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এইস্থানে লক্ষবার বলি, কোটী বার হোম এবং কোটীবার মহাবিদ্যা জপ হইয়াছিল। রামপ্রসাদ এই "সিদ্ধপীঠে" পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়া সাধনা আরম্ভ করিলেন। সাধনায় সিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইল। দেবী প্রসন্না হইয়া ভক্তকে দর্শন দিলেন।

* হালি সহরের শিবের গলিতে—রামপ্রসাদের সাধনার স্থান এখনও বর্ত্তমান আছে। যেস্থানে তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করেন, সেখানে একটী বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। হালি সহর নিবাসী কতিপয় ভদ্রসন্তান চাঁদা তুলিয়া এই স্থানে দুইটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(৫)

প্রসাদের জন্মভূমি কুমারহট্ট গ্রাম—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র কখনও কখনও কুমারহট্টে আসিতেন। এই সূত্রে প্রসাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া প্রসাদকে বড় ভক্তি করিতেন। রাজা ভক্তকবিকে আপনার নিকটে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু স্বাধীনহৃদয় রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। অযাচিত রাজ-প্রসাদকে প্রসাদ বীরের মত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের প্রতিজ্ঞা—"ক্ষিপ্ত যেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে।" তাই দীনহীন হইয়াও প্রসাদ রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। প্রসাদের তেজস্বীতায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিরক্ত হইলেন না, বরং প্রসাদের প্রতি তাঁহার ভক্তি শতগুণে বাড়িয়া গেল। রাজা প্রসাদকে ১০০/ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। সেই ভূমির দানপত্রে লেখা আছে—"পর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।" পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের মসনদ যখন ইংরাজের বীরচরণে লুণ্ঠিত হয়, তাহার ১ বৎসর পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

অনেকের ধারণা প্রসাদ ভারতচন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্রের একজন সভাসদ ছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তবে রামপ্রসাদের মোহিনী কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দান করেন। প্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িকও ছিলেন।

প্রসাদ পরম শাক্ত ছিলেন, কিন্তু বলিদান প্রথার অনুমোদন করিতেন না। পূজাপ্রাঙ্গণে, বজ্রনিনাদী ঢোল ঢক্কার বাদ্য—কোলাহল ভেদ করিয়া, যখন সেই উৎসর্গীকৃত নীরীহ পশুর মর্ম্মভেদী করুণ কাতর আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিত, তখন প্রসাদের মনে হইত—সেই দুর্ব্বল

অসহায় জীব বুঝি মানবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে! তিনি শুধু সাধক ছিলেন না—তেমন একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত, তেমন নিস্পৃহ প্রেমিক জগতে খুব কম দেখা যায়। প্রসাদের বিশ্বাস ছিল—জাঁকজমকে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিলে, সাধকের মনে অহঙ্কারের উদ্রেক হয়। যিনি সাধক, তিনি উপাস্য দেবতার মনোময় মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বিনা আড়ম্বরে পূজা করিবেন।

(৬)

রামপ্রসাদ ভক্ত নয়—জগদম্বার আদুরে ছেলে। আদুরে ছেলে যেমন জননীর স্নেহাঞ্চল ধরিয়া আবদার করে, প্রসাদ তেমনি শ্যামামা'র কাছে আবদার করিতেন। কথায় কথায় মায়ের উপর তাঁহার অভিমান হইত। তাঁহার অসীম নির্ভর কলুষহারিণী কালিকার অভয়চরণ দুখানিই তাই তিনি স্বভাবসুন্দর সরল শিশুর মত মাতৃচরণে প্রাণভরিয়া কাঁদিয়া গিয়াছেন। সেই অমৃতময় অভিমানভরা কাতর ক্রন্দন, সেই বালকের মত জোরের আবদার আজ আমরা "প্রসাদ পদাবলী"রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে পদাবলীর অক্ষরে অক্ষরে অকপট ভক্তের পূতাশ্রুসিক্ত করুণ নিবেদন! সেই নির্ভর-মিষ্ট সকরুণ নীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে চিরপবিত্র, বাঙ্গালীর অমূল্য রত্ন!!

রামপ্রসাদের রচিত ৪ খানি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। ১। বিদ্যা-সুন্দর, ২। কালীকীর্ত্তন, ৩। কৃষ্ণকীর্ত্তন, ৪। পদাবলী,—এই অমূল্য পদাবলীর জন্য রামপ্রসাদ বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরপরিচিত! এই অমূল্য পদাবলীই তাঁহাকে কালের মুখে চির অমর করিয়া রাখিয়াছে! বর্ণনা-কৌশলে, শব্দচরণ চাতুর্য্যে প্রসাদের পদাবলী বঙ্গজননীর কণ্ঠের রত্নমালা! প্রসাদ পদাবলীর ভক্তিবল—ভারতচন্দ্রের মণ্ডপ আপনা হইতেই অবনত হইয়াপড়ে! আজিও ভিখারীগণ রামপ্রসাদের পদাবলী গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে শক্তির প্রতি ভক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়।

বৈষ্ণব কবির চিরমধুর "পূর্ব্বরাগ", "মান" "মাথুর" "বিরহ" ছাড়িয়া এখনও লোকে প্রসাদী সুরে তন্ময় হইয়া যায়!

কবিতায় রূপক বর্ণনা—অসামান্য শক্তির কাজ, রামপ্রসাদের এ শক্তি যথেষ্ট ছিল। এ শক্তির কাছে নিপুণ কবি ভারতচন্দ্রও পরাজিত। প্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে যে দার্শনিক তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায় জগতে তাহা অতুলনীয়—সরল ভাষায় জটিল বিজ্ঞান—বোধ হয় প্রসাদ ছাড়া আর কোনও কবি বুঝাইতে পারেন নাই।

বাঙ্গালীর খাঁটী কবি ঈশ্বরগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন—প্রসাদ লক্ষ পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্ব্বে রামপ্রসাদ আরও ৭টী মঙ্গল রচনা করেন,—যাহাতে বিদ্যাসুন্দরের অন্তর্নিহিত মানসের ও হাবাবতী উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছিল। এই সপ্ত মঙ্গল এখন লোপ পাইয়াছে। কেবল বিদ্যাসুন্দরের শেষে অষ্টম মঙ্গল আলোচনা করিয়া তাহার আভাষ পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ "অষ্ট মঙ্গলায়" বিদ্যাসুন্দর শেষ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যবংশীয় কবি স্বর্গীয় রাধাজীবন রায় ও তদীয় সুহৃদ্ হুগলী ও পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে এম, এ অনেক অনুসন্ধান করিয়া হালি সহরের কোন ব্রাহ্মণগৃহ হইতে প্রসাদরচিত তিনটী মঙ্গলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাধাজীবনের আকাঙ্ক্ষা অকালমৃত্যুতে সেই তিনটী মঙ্গল সাহিত্য জগতে প্রচারিত হইবার অবকাশ পায় নাই। তাহার পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকেরই দুর্ভাগ্য। অধুনা লুপ্ত "বহুদর্শী" পত্রিকার কোন প্রবন্ধে সতীশবাবু এই তিন মঙ্গলের পরিচয় দিয়াছিলেন।

১১৫৭।৫৮ সালে বিদ্যাসুন্দরের রচনা আরম্ভ হয়। ১৬৬৪ শকে কালীকীর্ত্তন সমাপ্ত হয়। রামপ্রসাদের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৈদ্যসমাজ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী

করিতেন। সেই সামাজিক আন্দোলনের তরঙ্গে পড়িয়া রামপ্রসাদও আপনার কোন কোন গীতের ভনিতায়, আপনাকে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

(৭)

রামপ্রসাদ বীরাচারি শাক্ত ছিলেন, কিন্তু মদ্যপান করিতেন না। তথাপি লোকে তাহাকে "মাতাল" বলিত। এজন্য তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন—"আমায় মদমাতালে মাতাল বলে।" শাক্ত হইলেও তিনি বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না,—শ্যাম শ্যামা তাঁহার চক্ষে অভেদ ছিল। জগৎ জননীকে সকল সমর্পণ করিয়া তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছিলেন। শিববাক্য, ষট্‌চক্রভেদে, তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। সাংখ্য বেদান্তেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। শুচি অশুচিজ্ঞান তাঁহার ছিল না। ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি—ব্রহ্মেই তাহার লয়—ইহাই তাঁহার ধর্ম্মমত ছিল।

রামপ্রসাদের সমকালে কুমারহট্টে "আজু গোঁসাই" নামে তাঁহার এক প্রতিবাসী ছিলেন। আজু গোঁসাই গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। কাজেই গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে প্রসাদের মতভেদ হইত। তান্ত্রিক রামপ্রসাদকে বিদ্রূপ করিয়া গোস্বামী অনেকগুলি গান বাঁধিয়াছিলেন। সেই সকল গানে প্রসাদরচিত সঙ্গীতের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

বার্দ্ধক্যে—রামপ্রসাদের পত্নীবিয়োগ ঘটে। পত্নীবিয়োগে তিনি সন্ন্যাসী হ'ন।

রামপ্রসাদের মৃত্যু—অলৌকিক ঘটনাসংযুক্ত। কথিত আছে তিনি আপনার আসন্নমৃত্যু জানিতে পারিয়া কালীপূজার আয়োজন করেন। সেই প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে গিয়া, আর তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠেন নাই। কালীনাম গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

রামপ্রসাদের প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ সেন। গোপালকৃষ্ণের পুত্র—কালীপদ সেন—উড়িস্যার অন্তর্গত অঙ্গুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন। কালীপদ বাবুর চারিটী পুত্রের মধ্যে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী।

———

সাধু তুকারাম

(১)

বহুশতাব্দীর পরাধীনতায় অবসন্ন মহারাষ্ট্র—স্বজাতির করুণ কণ্ঠের হাহাকারে বিচলিত হইয়া, যখন দাম্ভিক ও বিলাসী যবনের কঠিন হস্ত হইতে, স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য, ধূমান্বিত বহ্নির ন্যায়, ধীরে ধীরে আপনার তেজঃ সঞ্চয় করিতে ছিল—ঠিক্ সেই সময়ে পুনানগরীর অনতি দূরে অবস্থিত দেহুক গ্রামে সাধু শিরোমণি তুকারামের জন্ম হয়।

দেহুক গ্রামে, 'বাহেলাজী' নামে একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন। বাহেলাজী জাতিতে শূদ্র হইয়াও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সরলতা ও সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যের সকল লোকেই তাঁহাকে সম্ভ্রমের চ'ক্ষে নিরীক্ষণ করিত। এই ভগবদ্ভক্ত বাহেলাজীর ঔরসে, ১৫১০ শকাব্দে [১৫৮৮ খৃঃ] "কঙ্কালই" নাম্নী মহিয়সী মহিলার গর্ভে, তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন।

তুকারামের এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম সাওজী। সাওজীর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল। অগ্রজের পূত আদর্শে তুকারামের বাল্যজীবন গঠিত হইয়াছিল। শিশু "তুকারাম" কুলদেবতা "বিঠোবার" পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

একদিন এক জটাবল্কলধারী সন্ন্যাসী বাহেলাজীর ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, এই ধার্ম্মিক পরিবারে অতিথির সেবাযত্নের কোন

ত্রুটি হয় নাই। এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে, পিতামাতা পত্নী ও ভ্রাতার অজ্ঞাতসারে, গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া সাওজী পলায়ন করেন। অনেক অনুসন্ধানেও আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

এই ঘটনায় বৃদ্ধ বাহেলাজীর শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের শোকে, অরুন্তুদ যন্ত্রণায় বাহেলাজী একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন। কাজেই বালক তুকারামের কোমল স্কন্ধে সংসারের সমস্ত ভার পতিত হইল। তুকারাম পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তাহার বয়স তখন ১৩ বৎসর মাত্র।

সংসারে তুকারামের আসক্তি ছিল না। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম পূজা অর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন; ইন্দ্রায়ণী নদী তীরস্থ "বিঠোবার" মন্দিরে তুকারাম দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ব্যবসায় করিয়া তুকারাম যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দরিদ্র সেবায় ব্যয়িত হইত। সংসারের প্রতি পুত্রের এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া, বাহেলাজী তুকারামের বিবাহ দিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে, 'রখুমাই' নাম্নী এক বালিকার সঙ্গে তুকারামের বিবাহ হয়। "রখুমাই"—একে দরিদ্রের কন্যা, তাহাতে আবার চিররুগ্না, সুতরাং বিবাহ করিয়া তুকারাম সুখী হইলেন না। তাঁহার মন একেবারেই দমিয়া গেল, সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মিল; প্রথম যৌবনে—একটা অনন্ত তৃষার আবেগে—তিনি আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় বিবেচনা করিলেন। ব্যবসায়েও আর তাঁহার মন রহিল না। ক্রমে, কমলার কুদৃষ্টিতে তুকারামের আয় একেবারেই কমিয়া গেল। তুকারাম ঋণ করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, আর কেহ তাঁহাকে ধার দিতে চাহেন না—বৃদ্ধ পিতামাতাও রুগ্না পত্নীকে লইয়া তুকারাম বড় বিপদে পড়িলেন। কেমন করিয়া এতগুলি প্রাণীর অন্নের সংস্থান হয়? তুকারাম কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

(২)

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেহুক গ্রামেও কালের ভেরী শ্রবণ ভৈরব রবে বাজিয়া উঠিল। অনাহারে, মনস্তাপে বৃদ্ধ বাহেলাজী সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন। সংসার অচল হইয়া পড়িল। তুকারামের পত্নী—জীবন্মৃতা, তাহার দ্বারা গৃহকর্ম্মের কোন সাহায্যই হইত না। সকল দিক্ ভাবিয়া, আত্মীয়গণের পরামর্শে, তুকারাম 'জীজাই' নাম্নী এক ধনীর দুহিতাকে আবার বিবাহ করিলেন। এই বিবাহে— তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ ঘটিল। সেই অর্থ লইয়া তুকারাম ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তুকারামের প্রতি প্রসন্না হইলেন না, সংসারের অভাবরাশি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তুকারামের চক্ষে অন্ধকার লাগিল।

জীজাই ধনীর কন্যা এবং সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার স্বভাবটা বড় কর্কশ ছিল। একে সংসারের কষ্ট, তাহার উপর স্বামীর বৈরাগ্য ভাব— এই উভয় কারণে জীজাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বণিতার ভর্ৎসনা— তুকারামের গাত্র অলঙ্কার হইল। জীজাই সর্ব্বদাই স্বামীর ত্রুটি বাহির করিয়া কলহ করিতেন, কিন্তু উদার স্বভাব তুকারাম আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা বলে—পত্নী কর্তৃক প্রযুক্ত সমস্ত অশাস্ত্রীয় বিশেষণ গুলি অম্লান বদনে পরিপাক করিয়া ফেলিতেন। কাজেই বিপ্লব আর অধিক দূর অগ্রসর হইত না। ইহাতে কিন্তু জীজাই আরও কুপিতা হইয়া তুকারামকে গালি দিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতেন। তুকারাম, অনুরাগ-স্নিগ্ধ-সান্ত্বনা বাক্যে উত্তেজিত সিংহীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। স্বামী অপরাধ স্বীকার করিলে, দম্পতীর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইত।

অর্থের চেষ্টায় তুকারাম একদিন স্থানান্তরে গমন করেন। সেখানে তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার দেন।

তুকারাম সেই ইক্ষুর বোঝা মাথায় লইয়া বাটী ফিরিতে ছিলেন। পথি-মধ্যে—বালকগণ তুকারামের কাছে ইক্ষু প্রার্থনা করিল, তুকারাম প্রত্যেককে একগাছি করিয়া ইক্ষু দান করিলেন। শেষে আর এক গাছি মাত্র ছিল—তাহা লইয়া তুকারাম বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী—সমস্ত ইক্ষু পথে আসিতে আসিতে বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন—দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী পূর্ব্বেই লোক মুখে এসংবাদ পাইয়াছিলেন। ক্রোধ ও ঈর্ষায় রমণীর প্রত্যেক শিরা উপশিরায় দাবানলের সৃষ্টি হইল! আগ্নেয় গিরির প্রচ্ছন্ন অগ্নি কণা স্ফুলিঙ্গ উদ্গারের আয়োজন করিল! সুন্দরী বেপমান বক্ষে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অপরিত্যজ্য চিন্তাকে সঙ্গিনী করিয়া তুকারাম একখণ্ড ইক্ষু হস্তে বাটীতে প্রবেশ করিলেন! বাঞ্ছিতের বাহুপাশ বিমুক্তা অভিসারিকার ন্যায় ঊষা সুন্দরী তখন পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, তখনও প্রভাত হয় নাই। সেই স্পষ্ট আলোকেই—তুকারাম দেখিতে পাইলেন, গৃহিনীর মুখ কাল মেঘের মত হইয়াছে! তুকারাম কম্পিত পদক্ষেপে স্পন্দিত হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া ইক্ষুদণ্ড গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। সর্ব্বাঙ্গীন পরিশ্রমে তাঁহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তিনি বিশ্রামের উদ্যোগ করিতে-ছেন, সহসা গৃহিণী সেই ইক্ষুদণ্ড তুলিয়া লইয়া, অগ্নি শলাকাবৎ স্থির কটাক্ষ স্বামীর মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিয়া—স্বামীকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। প্রহারের চোটে ইক্ষুদণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

পত্নীর কোমল কর পল্লবের অমৃত স্পর্শে শান্তিলাভ করিয়া, তুকারাম সেই ভূপতিত দুইখণ্ড ইক্ষু তুলিয়া লইলেন। তা'র পর করুণা বিকম্পিত কণ্ঠে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"প্রিয়তমে! আজ জানিলাম—তুমি আমায় যথার্থই ভালবাস। এই আখ গাছটী একা খাইতে ভাল লাগিবেনা বলিয়া, তুমি দুই খণ্ডে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ!" তুকারামের

প্রসন্ন মুখে বিষাদের কোনও নিদর্শন ছিল না। পত্নীর প্রহারে শরীর জর্জ্জরিত, তবুও তাঁহার বদনে সেই স্বভাব শান্ত দিব্য হাসি—তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মধুর, তেমনি অকৃত্রিম! কিন্তু তুকারামের দ্বিতীয় পত্নীর চক্ষুদ্বয় তখনও জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতে ছিল!

(৩)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দাক্ষিণাত্যে সেবার দুর্ভিক্ষের বিপুল বিকাশ! অনাহারে শীর্ণ দেহ নরনারী দলে দলে মৃত্যুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতেছিল। অচিরে, তুকারামের বাটীতেও চির বিদায়ের শোক রাগিণী বাজিয়া উঠিল! তুকারামের বৃদ্ধ পিতা মাতা, ভ্রাতৃজায়া, প্রথমাপত্নী এবং দুইটী সন্তান—একেবারে শমনের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। যাহারা অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডে তুকারামের সহায় বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা সকলেই চলিয়া গেল! তুকারামের উৎক্ষিপ্ত মন—অবলম্বন শূন্য হইয়া পড়িল! যখন সকল বন্ধনই ছিন্ন হইল—তখন তুকারাম সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া আত্ম বিশ্বাসে অগ্রসর হইলেন।

একদিন গম্ভীর রাত্রে, সুপ্তি সুখে মগ্না দ্বিতীয় পত্নীকে ধূলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত হৃদয়ের স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য তুকারাম সংসার আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যুবতী জীজাইয়ের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল। অনুতাপ বিদ্ধা রমণী শীঘ্রই বুঝিতে পারিল—তাহার স্বামী "বিঠোবার" চরণে কিশোর জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন! স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার শক্তি আর তাহার নাই।

বিংশতি বর্ষ বয়সে—তুকারাম সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। কুল দেবতা "বিঠোবার" মন্দিরে, সংসারাশ্রম হইতে অপসৃত তুকারাম পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—গার্হস্থ্য

ধর্ম্মের কর্ম্মতালিকার মধ্যে এমন আর কিছু নাই, যাহা তাঁহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে। তুকারাম বিঠোবার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—

"যাহা ভাল বাসিতাম, ছেড়েছি সকল।
তুমি মোরে ছাড়িও না, দয়াল বিঠ্ঠল!"
হে দেব! অপর কিছু নাহি অভিলাষ।
তব পদে বাঁধা যেন থাকে তব দাস॥"

মাঘ মাসের শুক্লা দশমীর কৌমুদী ফুল্ল রজনীতে, একজন সাধু তুকারামকে 'বিষ্ণুমন্ত্রে' দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

"ভজন পূজন কীর্ত্তনে"—তুকারামের দিন বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। তিনি বিঠোবার একনিষ্ঠ সাধক, কিন্তু তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাসের কোনও বাহ্য বিকাশ ছিল না।

দেহুক গ্রামের ক্রোশ ত্রয় পশ্চিমে "ভাণ্ডারী" পাহাড়; স্থানটী বড় সুন্দর। সহস্র কোলাহল সঙ্কুল নগরের প্রান্ত ভাগে—বনস্পতির শ্যাম শীতল ছায়া বেষ্টিত তটিনীর রজতধারা বিধৌত, বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ মুখরিত এই শান্তিময় পর্ব্বতে, তুকারাম সমস্ত দিবস ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকিতেন, রাত্রে—বিঠোবা মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন।

একদিন কুঙ্কুম রাগ রঞ্জিত অরুণ প্রভাতে, তুকারাম নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময় একজন কৃষক আসিয়া উপস্থিত। কৃষক তুকারামকে বলিল—"শেঠজী! আমি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছি। আমার শস্য ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে—এমন একটী লোক পাইতেছি না; যদি তুমি আমার ক্ষেত্রে বসিয়া ভজনাদি কর—আমার বড় উপকার হয়। আমার ক্ষেত্রটীও আগুসান হয়, তোমারও কিছু লাভ হয়। আমি তোমায় আধমণ করিয়া ছোলা দিব।" যদিও তুকারাম পত্নী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে

পারেন নাই। সুতরাং কৃষকের কথায় তুকারাম সম্মত হইলেন, বলিলেন,—"বেশ, আমি তোমার ক্ষেত্রে বসিয়া হরিনাম করিব, আমার পারিশ্রমিক "দানা" তুমি আমার স্ত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিও।"

(৪)

পরদিন তুকারামের উপর ক্ষেত্র রক্ষার কর্ম্মভার অর্পিত হইল। ক্ষেত্র মধ্যে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত মঞ্চ ছিল,—তুকারাম তাহার উপর বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে নাম জপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শস্য লোভে দলে দলে পক্ষীকুল ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিল তুকারাম দেখিলেন—ক্ষুধার্ত্ত পক্ষীকুল শস্য ভক্ষণ করিতেছে, ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুকারাম পক্ষীগণকে বাধা দিলেন না, তাহারা অকুতোভয়ে শস্য নষ্ট করিতে লাগিল। ক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্তা—মঞ্চোপরি ধ্যান মগ্ন।

এইরূপে একমাস গত হইল। মাসান্তে ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিল। শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র—পক্ষীকুলের বাসস্থান হইয়াছে, দেখিয়া কৃষকের দেহ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। কৃষক তুকারামকে অনবধানতার জন্য যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া গ্রামের কতকগুলি মাতব্বর ব্যক্তিকে ডাকিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল। গ্রামবাসীরা কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার ক্ষেত্রে কত মন শস্য উৎপন্ন হয়?" কৃষক বলিল—দুই খণ্ডী"। তখন সকলের বিচারে স্থির হইল—"তুকারামকে কৃষকের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, দুই খণ্ডী শস্যের মূল্য দিতে হইবে।

সাধু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কিছু ছিল না। যাঁহারা মধ্যস্থ হইয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজনের

একটু বিবেক শক্তি ছিল। তিনি সকলকে বলিলেন—"বিচার তো শেষ হইল, কিন্তু কৃষকের ক্ষেত্রের অবস্থাতো আমরা কেহই দেখি নাই। বিচার কেবল এক পক্ষের কথা শুনিয়া হইয়াছে। তুকারাম আত্ম পক্ষ সমর্থনের জন্য একটী কথাও বলেন নাই। অতএব চল—স্বচক্ষে কৃষকের ক্ষেত্রর অবস্থাটা দেখিয়া আসা যাউক্।" একথা সঙ্গত মনে করিয়া সকলেই কৃষকের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেই শ্যামোজ্জল শস্যালোক শোভন ক্ষেত্রে পক্ষীকুলের অত্যাচারের চিহ্নমাত্রও নাই,—স্বর্ণ শিষ্য শস্য বৃক্ষগুলি মন্দ মন্দ অনিলে কম্পিত হইতেছে! ব্যাপার দেখিয়া কৃষকও অবাক হইয়া গেল! শেষে সকলে মিলিয়া শস্য গুলি একত্র করিয়া মাপিয়া দেখিলেন—যে ক্ষেত্রে মাত্র দুই খণ্ডী শস্য উৎপন্ন হইত, সেই ক্ষেত্রে ১০ খণ্ডী শস্য উৎপন্ন হইয়াছে !!

সেই কৌতুহলাক্রান্ত লোকারণ্যের মাঝখানে, তুকারাম নীরব শান্ত, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াইয়া ইষ্টদেব বিঠোবার এই অপূর্ব্ব করুণার লীলা দেখিতেছিলেন, কৃষক অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুন্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন তুকারামের প্রতি অনেকেরই ভক্তি বাড়িয়া গেল।

যাঁহারা তুকারামের অপরাধের বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার বিচার করিলেন। ক্ষেত্রাধিকারী কৃষককে দুইখণ্ডী শস্য দিয়া অবশিষ্ট শস্য তুকারামকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। তুকারাম শস্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না, সেই উদ্বৃত্ত শস্য একজন ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত রহিল।

কেহ কেহ বলেন—এই শস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থে "বিঠোবার" ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার করা হইয়াছিল।

রজনী শেষ যামে উপনীতা—তথাপি সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল না। মন্মথের ইঙ্গিতানুবর্ত্তিনী অভিসারিকা আর কতকক্ষণ অপেক্ষা করিবে? নিজের অযাচিত মাধুরী সেই বিজন আঁধারের হৃদয়ে হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া, —রমণী ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে ক্ষিপ্র আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিল। কিন্তু সাধু দেহ স্পর্শ মাত্র—হতভাগিনী অরুন্তুদ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! তুকারাম আর একবার মাত্র সেই স্বৈরিণীর প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন,—সে দৃষ্টিতে কি নীরব তীব্র তীরস্কার! সে দৃষ্টিতে কামিনী মর্ম্মের উপর নিদারুণ আঘাত পাইল। তাহার সেই লালসা মাখা ওষ্ঠাধরের গোলাপ ফুল্লতা শুখাইয়া গেল—চ'খে মুখে হতাশ্বাস ফুটিয়া উঠিল। রমণী ছিন্ন মূল লতিকার ন্যায় মাটীতে পড়িয়া গেল। তুকারাম অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

আশ্রম সন্নিহিত বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া কতকগুলি গ্রামবাসী—তুকারাম ও রমণীর ব্যবহার দেখিতেছিল। বলা বাহুল্য—মম্বাজী ইহাদিগকে সাধুর নষ্ট চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছিল। তুকারামের প্রস্থানের পর গ্রামবাসীরা রমণীর নিকটে আসিল। জনসমাগমে রমণীও উঠিয়া বসিল। তাহার মূর্ত্তি—নিশ্চল রক্তহীন—যেন ভাস্কর প্রেয়সী মর্ম্মর মূর্ত্তি! সেই অরবিন্দ সুন্দর মুখখানিতে পাণ্ডুরতার ছায়া ভাসিতেছে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন নিমেষ মধ্যে আপনার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া লয়, তারপর বধমঞ্চ দেখিয়া শিহরিয়া উঠে—রমণীর অবস্থা তখন ঠিক সেই প্রকার! অনুতাপে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, অভাগিনীর পাষাণ প্রাণে—বিশ্বপ্রেমের প্লাবন আসিয়াছিল। অভিসারিকার অন্তরাত্মা তাহাকে সহস্র ধিক্কার দিতেছিল।

রমণী অসঙ্কোচে—সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল—তাহার এই নির্লজ্জ ব্যর্থ উদ্যম, মম্বাজীর অর্থলোভে!! মম্বাজীর অনুরোধেই সে

—সাধুবরকে কলুষিত করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সে হাতে হাতে পাপের প্রতিফল পাইয়াছে, সাধু অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহার দেহ তপ্ত লৌহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

গ্রামবাসীরা এ ঘটনার প্রথম হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা তুকারামের জিতেন্দ্রিয়তার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাইয়াছিল। রমণীর কথার তখন তাহারা বুঝিতে পারিল—পাপিনী, মম্বাজী কর্ত্তৃক প্রেরিতা; একজন নিষ্কলঙ্ক সাধুর মহান্ চরিত্রে—একটা প্রতারকের কথায় তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া সকলেই লজ্জিত হইল। সাধারণের কাছে এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হওয়ায়—মম্বাজীরও লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল না।

এই ঘটনায়, অগ্নি পরীক্ষিত কাঞ্চনের ন্যায় তুকারামের সাধুতা, সরলতা, সহিষ্ণুতা ও নিস্পৃহতা—আরও অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। লোকে তাঁহাকে আরও শ্রদ্ধা করিতে শিখিল।

তুকারামের মৃতসঞ্জীবনী একটী মাত্র দৃষ্টিতে রমণীর পাপ বাসনা নিভিয়া গিয়াছিল। সে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দরিদ্রগণকে বিলাইয়া দিয়া —সন্ন্যাসিনী সাজিয়া, তুকারামের পদযুগল অশ্রু ধৌত করিল। তুকারাম—সেই মানব সমাজের অস্পৃশ্যা পতিতা অবলাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সাধু হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ ও দেব প্রসাদ লাভ করিয়া রমণী সিদ্ধ যোগিনী হইল। লোকে বুঝিল—তুকারামের আশ্রম—তাপিত মানবাত্মার শান্তিময়ী বিশ্রাম ভূমি!

—তুকারাম কামকে জয় করিয়াছিলেন!!

(৭)

তুকারামের প্রতিপত্তি অনেকেরই নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

বিঠোবা মন্দিরের পার্শ্বে, সাহুজী নামক এক ব্রাহ্মণের একটী বাগান ছিল, বাগানের চারিদিকে কণ্টক বৃক্ষের বেড়া। একাদশী তিথিতে

সাধু তুকারামের শিষ্য শিবজী

বিঠোবা মন্দিরে প্রতিবৎসর একটী উৎসব হইত। একদা এই উৎসব উপলক্ষে—মন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইল। তুকারাম দেখিলেন—সাহুজীর উদ্যানের একদিকের বেড়া না কাটিয়া দিলে, সাধারণের দেবদর্শনে ব্যাঘাত জন্মিতেছে। তুকারাম স্বহস্তে সেই সকল কণ্টক বৃক্ষের শ্রেণী উৎপাটন করিয়া দিলেন, অনেক লোক বাগানে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্ত্তি দর্শনের সুযোগ পাইল।

উৎসবান্তে তুকারাম—সাহুজীর বাগানে বেড়া বাঁধিয়া দিতেছেন, এমন সময় সাহুজী আসিয়া উপস্থিত। ভগ্ন বেড়া দেখিয়া সাহুজীর আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তুকারাম সাহুজীকে বলিলেন—"লোকে ঠাকুর দেখিবার জন্য দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছিল না, তাই আমি তোমার বাগানের বেড়া কাটিয়া দিয়াছিলাম। আজ সেই বেড়া আবার বাঁধিয়া দিতেছি। ভাই! তুমি রাগ করিও না, ইহাতে তোমার কিছুই ক্ষতি হয় নাই। পাছে এই ভাঙ্গা বেড়া দিয়া কোনও পশু প্রবেশ করিয়া তোমার গাছ পালার ক্ষতি করে—সেইজন্য আমি কাল সমস্ত রাত তোমার উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম।"

তুকারামের সরল কথায় সাহুজীর ক্রোধ শান্ত হইল না। সহসা তাহার মুখমণ্ডলে বিদ্যুতের মত কি একটা জ্বলিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই মাথায় কঠিন আঘাত অনুভব করিয়া তুকারাম মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

নৃশংস সাহুজী করধৃত দণ্ডদ্বারা সাধুকে প্রহার করিয়াছিল।

(৮)

শিষ্যগণের সদয় সুশ্রূষার গুণে শীঘ্রই তুকারামের চেতনা ফিরিয়া আসিল। একজন শিষ্য সাহুজীকে প্রতিফল দিতে চাহিল, তুকারাম নিষেধ করিলেন, বলিলেন—"আমায় তো বেশী লাগে নাই, কেন তোমরা

ব্রাহ্মণের উপর প্রতিশোধ লইবে? আমিই তো বেড়া কাটিয়া দিয়া তাহার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।"

পরদিন তুকারাম সাহুজীর বাটীতে গিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন!!

শীঘ্রই সাহুজীর এক পুত্র সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইল। রোগ সংক্রামক, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া তুকারাম বালকের শুশ্রূষার ভার লইলেন। তুকারামের যত্নেই সে যাত্রা বালক যমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল। অনুতপ্ত সাহুজী তুকারামের চরণে লুণ্ঠিত হইল! তুকারাম তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন!

তুকারামের কীর্ত্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের বিষদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছিল। বাঘোলী গ্রামের রামেশ্বর ভট্ট—তুকারামের বিরুদ্ধে এক অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিল। দেহুর পাটেলের নিকট হইতে রামেশ্বর এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিল—ঐ অনুজ্ঞাপত্রে তুকারামকে দেহু গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ ছিল।

তুকারাম বড়ই বিপদে পড়িলেন। গ্রাম পরিত্যাগ করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি আশৈশবের আরাধ্য "বিঠোবা" প্রভুকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও সম্মত ছিলেন না। তুকারাম মন্দিরে অনশনে অনিদ্রায় ত্রয়োদশ দিন পড়িয়া রহিলেন। রামেশ্বর, তুকরাম রচিত অভঙ্গগুলি ইন্দ্রায়নীর জলে নিক্ষেপ করিল। তুকারাম কবিতার শোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, শক্রদের আর উল্লাসের সীমা রহিল না। তাহারা সগর্ব্বে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল—"শূদ্র তুকারামের মুখে আর আমাদের ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে হইবে না, তাহার কবিতার খাতাপত্র সমস্তই জলমগ্ন হইয়াছে।"

কিন্তু তিন দিন পরে লোকে দেখিল—তুকারামের খাতাপত্র ইন্দ্রায়নীর জলে ভাসিতেছে। একজন শিষ্য গিয়া সেগুলি কুড়াইয়া আনিল,

(৫)

শীঘ্রই তুকারাম দৈব অনুগ্রহ লাভ করিলেন। তাঁহার ভাগ্যে কবি প্রতিষ্ঠা লাভের মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত হইল। "গৃহলক্ষ্মীর" পরিবর্ত্তে—"কলালক্ষ্মী" তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন।

বিঠোবার প্রেমে বিভোর হইয়া তুকারাম কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল কবিতা "অভঙ্গ" নামে পরিচিত। তুকারামের "অভঙ্গ" মহারাষ্ট্রবাসী বৈষ্ণবগণের কাছে—বেদের মত সম্মানার্হ। জনসাধারণও সেগুলিকে পবিত্র ভাবিয়া আদর করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র, কথক শ্রাবক—সকলের মুখেই তুকারামের "অভঙ্গ"। তুকারাম ধর্ম্মোপদেষ্টা,—তাঁহার জীবনে জীবন্ত ধর্ম্ম প্রতিভাত ছিল, পক্ষান্তরে তিনি একজন স্বভাব কবি—নীতি ও ভক্তিপূর্ণ বলিয়া তাঁহার কবিতা আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। এখনও প্রতিবর্ষের আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে বিটোবা মন্দিরে লক্ষ লোক সমবেত হইয়া তুকারামের "অভঙ্গ" গান করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে পণ্ডরীপুরে একটী বড় মেলাও বসিয়া থাকে।*

তুকারাম ভক্তিমার্গকে মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ সোপান মনে করিতেন। ধর্ম্মসাধনে বাহ্যাড়ম্বরকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। স্বরচিত কোন একটী অভঙ্গে তিনি সন্ন্যাসীর লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

কথা অতি মিষ্ট, আর মন ভাল যা'র,
নাই বা রহিল কণ্ঠে ফুল মালা তার।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভ ক'রেছে যেজন—
নাই বা সে শিরে জটা করিল ধারণ।

আসক্তি নাহিক যার পরনারী প্রতি,
ভস্ম যদি না মাখে সে, কিবা তাহে ক্ষতি?
নিন্দায় যে মূক, যেবা অন্ধ পরধনে
তুকা বলে সন্ন্যাসী জানিও সেই জনে ৷”

ঈশ্বরে তুকারামের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বলে—তিনি ধর্ম্মপ্রচারের আসন গ্রহণ করিলেন। অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইল, মহারাষ্ট্র দেশ তাঁহাকে জাতীয় কবি বলিয়া গ্রহণ করিল। অনেকেই বলিতে লাগিল—“তুকারাম অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন—দেবতার অবতার।”

তুকারামকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে দেখিয়া, মহারাষ্ট্র প্রদেশের কতকগুলি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন। চিঞ্চবাদ গ্রামের চিন্তামণি দেব —তুকারামের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেহু গ্রামের মন্বাজী গোঁসাই—সর্ব্ব সাধারণকে বলিতে লাগিলেন—“তুকারাম একজন ভণ্ড, রাত্রে তাহার আশ্রমে—একজন বেশ্যার গতিবিধি হয়।” যাঁহারা মন্বাজীর কথা বিশ্বাস করিলেন না, মন্বাজী তাঁহাদিগকে প্রতক্ষ্য প্রমাণ দেখাইতে স্বীকৃত হইলেন।

একদিন ভাণ্ডারী পর্ব্বতের উপকণ্ঠে—তুকারাম ভজন গাহিতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার নয়ন সম্মুখে এক নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। রমণী অসামান্য সুন্দরী, জ্যোৎস্নালোকের মত তাহার অতীন্দ্রিয় রূপ,—প্রসাধনে পরিমার্জ্জিত হইয়া তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। নির্জ্জন প্রদেশে মূর্ত্তিমতী দুষ্প্রবৃত্তির মত রমণীর আগমনে, তুকারাম রমণীর দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন, সেই হাস্যকে আপনার কামনার অনুকূল করিয়া বিনয় মধুর বচনে নারী আপনার প্রার্থনা জানাইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তুকারাম কোন কথা কহিলেন না। তিনি ধ্যান মগ্ন হইলেন।

তুকারামের মুখে হর্ষের উজ্জ্বল প্রভা ফুটিয়া উঠিল। তুকারামকে ঐশী শক্তিশালী জানিয়া. কর্তৃপক্ষ নির্ব্বাসন দণ্ড রহিত করিয়া দিলেন।

(৯)

পুনায় অনঘড় নামক এক ফকীর বাস করিতেন। এই ফকীর সাধারণের উপকারার্থে একটী কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এই কূপের জল বড় স্নিগ্ধ ও স্বাদু ছিল,—অনেকেই ইহার জলে স্নান করিতেন, প্রত্যেক গৃহেই এই জল পেয়রূপে ব্যবহৃত হইত।

কোন কার্য্যোপলক্ষে রামেশ্বর একদিন পুণায় গিয়াছিল। মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড ময়ূখমালার সন্তাপে ক্লান্ত হইয়া রামেশ্বর ফকীরের কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় স্নান করিয়া তাহার দেহ স্নিগ্ধ হইল না, বরং অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরেই রামেশ্বরের শরীরে একরকম স্ফোটক বহির্গত হইল, এই সকল স্ফোটকের যন্ত্রণায় হতভাগ্য মৃতকল্প হইয়া পড়িল। কোন ঔষধেই ব্যাধির প্রতীকার হইল না; তুকারাম লোকমুখে এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন।

পুনা নগরী প্রান্ত সীমায়—এক জীর্ণ পর্ণকুটীরে, আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত রামেশ্বর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, তুকারাম দেবদূতের মত সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর—সাধুর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিল না, সে কাঁদিতে লাগিল। তুকারাম সস্নেহে তাহাকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। রোগী দেখিল—সে স্পর্শ কি কোমল, কি উন্মাদন, কি অভাব্য, কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রদ। রামেশ্বরের অর্দ্ধেক যন্ত্রণা সেই মুহূর্ত্তে উপশম হইল। তুকারামের যত্নে অল্পাদনের মধ্যে—তাহার শরীরে ব্যাধির আর চিহ্নমাত্র রহিল না।

মহাপুরুষের উদার করুণায় মুগ্ধ হইয়া রামে'র তুকারামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। বিদ্বেষ—অনুতাপে পরিণত হইল!

(১০)

লোহগ্রামের একজন কাংশ্যকার তুকারামের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িল। সে কাজকর্ম্ম কিছুই করিত না, দিনরাত বিঠোবা মন্দিরে পড়িয়া থাকিত। কাংশ্যকার-পত্নী, স্বামীর এইরূপ বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া তুকারামের উপর রুষ্ট হইল। রমণী সঙ্কল্প করিল—সাধুকে একদিন জব্দ করিবে।

একদিন রমণী তুকারামকে স্বগৃহে পান ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। তুকারাম শিষ্যপত্নীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে—সাধুজী কাংশ্যকারগৃহে উপস্থিত হইলেন।

প্রথমেই তুকারাম স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, রমণী গৃহান্তরে গিয়া খানিকটা জল গরম করিল, তা'রপর সেই উষ্ণজল—তুকারামের মাথায় ঢালিয়া দিল। জল এত গরম ছিল যে, সাধুর সর্ব্বাঙ্গ একেবারেই পুড়িয়া গেল। জ্বালা নিবারণের জন্য—তুকারাম বিঠোবার স্তব করিতে লাগিলেন।

এই অগ্নি পরীক্ষা কালে তুকারামের অসামান্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া,—কাংশ্যকার পত্নীর কঠিন হৃদয় গলিয়া গেল। সে সাধুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তুকারাম—তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সেই অবধি রমণী পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া সাধুসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

—তুকারাম ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন।

অকৃত্রিম দেবভক্তির জন্য পুণ্যাত্মা তুকারামের নাম মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। আর কেহ তাহাকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতে

সাহস হইল না। যা'রা তুকারামের শত্রু ছিল, মন্ত্রবলে রুদ্ধ বীর্য্য ভুজঙ্গমের মত তাহারা সকলেই সেই অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষের পবিত্র চরণে নতশিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই সময় মহারা কেশরী ধার্ম্মিক চূড়ামণি ছত্রপতি শিবজী সাধু তুকারামকে আমন্ত্রণ করিলেন। সাধুজীকে আনিবার জন্য যথারীতি রথ, অশ্ব, পত্র ও রাজদূত প্রেরিত হইল। কিন্তু তুকারাম রাজ-আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না, তিনি দূতের হস্তে শিবজীকে একখানি ছন্দোময়ী লিপি প্রেরণ করিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই লিপিপাঠে বুঝা যায় তুকারাম লোভকে জয় করিয়াছিলেন।

বিশাল সংসারে আমি নিতান্ত একাকী।
লোকাচার হ'তে সদা দূরে দূরে থাকি।
বসন, ভূষণ, ধন, রত্ন সিংহাসন,
কিছুতে আমার আর নাহি প্রয়োজন;
আমি বনবাসী দীন—আসক্তিবিহীন—
অন্নাভাবে তনুক্ষীণ—কোটীতে কৌপীন;
যশঃ মান, কীর্ত্তি—নাহি কোন আকিঞ্চন,
তবে কেন ডাকিয়াছ—আমারে রাজন্!
রূপ নাই, গুণ নাই দশা অতি মন্দ,
আমায় দেখিলে তুমি পাবে না আনন্দ।
তোমার নিকটে গিয়ে আমার কি লাভ?
ভিক্ষা ক'রে খাব, হ'লে অন্নের অভাব।
ছিন্ন বস্ত্র কত থাকে পথেতে পড়িয়া,
লজ্জা নিবারণে তাহা লব কুড়াইয়া।
বৃক্ষতল শয্যা হবে এলে বিভাবরী,
কিসের প্রত্যাশা রাজা! তবে আমি করি?

রাজগৃহে শুধু মহতের অধিকার,
ক্ষুদ্র আমি,—কখনই যোগ্য নহি তা'র।
অতি পুণ্যবান্, তুমি—হে পাণ্ডরি নাথ!
চেয়েছ আমার সঙ্গে করিতে সাক্ষাৎ।
সংসার কামনা আমি ছেড়েছি সকল,
আমার আরাধ্য ধন—ঠাকুর বিঠ্ঠল।
বিঠোবারে হেরি আমি বিশ্বে সব ঠাঁই।
তোমার মধ্যেও তাঁরে দেখিবারে পাই।

মানবের ভাগ্য সূত্র আছে তব হাতে,
"শিব" এই পুণ্যনাম সার্থক তোমাতে।
নিয়ত প্রসন্ন রাজা! তোমায় শ্রীহরি!
তোমার নিকটে আমি এই ভিক্ষা করি,
রাখিতে নারিনু কথা করিও না রোষ,
পুত্রসম প্রজা পালো' পাইবে সন্তোষ।
নরমাঝে নরাধিপ! "নারায়ণ" তুমি,
পবিত্র—তোমার জন্মে—মহারাষ্ট্র ভূমি।

তুকারামের পত্র পাঠে শিবজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, আপনিই তুকারামের আশ্রমে উপস্থিত হ'ন। তুকারামের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে—শিবজী সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। শিবজীর মাতা পুত্রের এইরূপ রাজ্যে অনাসক্তি দেখিয়া ব্যাকুলভাবে তুকারামকে জানাইলেন—"শিবজী আমার একমাত্র পুত্র, সে সংসারে না ফিরিলে—মহারাষ্ট্র দেশের উদ্ধারের আশা নাই—আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উপায় করুন।"

তুকারাম জিজা বায়ের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। অবসর বুঝিয়া তিনি শিবজীকে বলিলেন—"যাহার যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মপালন না করিলে

প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। তুমি ক্ষত্রিয়—প্রজা পালন তোমার ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।" সাধুর পবিত্র উপদেশে—রাজধর্ম্মের প্রতি শিবজীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল।

স্বাধীন রাজা হইয়াও শিবজী তুকারামকে ভুলিতে পারেন নাই। একবার পুনায় তুকারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শিবজী বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শিবজী যখন সাধুদর্শনে গিয়াছিলেন, চাকনদুর্গের রক্ষক একজন মুসলমান সর্দ্দার সন্ধান পাইয়া, শিবজীকে ধরিবার জন্য পাঠান-সৈন্য প্রেরণ করেন। তখন তুকারাম ভজন গাহিতেছিলেন, অনেক লোক আগ্রহভরে তাহা শুনিতেছিল। অতলোকের মধ্যে কে শিবজী মুসলমান সৈন্যগণ তাহা স্থির করিতে পারে নাই। এই অবসরে তুকারামের ইঙ্গিতে শিবজী তথা হইতে সরিয়া পড়েন।

মহারাষ্ট্রবাসীগণের বিশ্বাস—তুকারামের প্রার্থনাবলে ভগবান্ বিঠোবাই সে যাত্রা শিবজীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী

(১)

সে বড় বেশীদিনের কথা নয়। তখন প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজের সহিত অন্তসার শূন্য মহারাষ্ট্র শক্তির সংঘর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। বর্গীর নৃশংস অত্যাচারে—বিশৃঙ্খল দেশে অশান্তি ও অরাজকতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতে তখন ন্যায় ও নীতির শাসন শিথিল—স্বার্থপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য—জ্বলন্ত চিতায় জ্যোতির্ম্ময় শিখায়—শত শত অবলা জীবন্ত দগ্ধ হইতেছিল, সেই পূত ভস্মরাশি অঙ্গে মাখিয়া বাদ্য বাদনে পল্লী সচকিত করিয়া,—বলদর্পী পিশাচগণ—আনন্দে নৃত্য করিতেছিল! ভারতের বর্ষজ্যোতিঃ নির্ব্বানোন্মুখ হইয়াছিল! এই অপধর্ম্মের মলিনতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে—সর্ব্বলোক লোচনের সমক্ষে—বীরের মত দাঁড়াইয়া, কেবল একজন মহাপুরুষ—প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন—তাঁহার নাম রাম মোহন রায়।

এই সমাজ বিপ্লবের সময়—১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবারের মর্ভি নগরে—উদীচ্য ভক্ষণ কুলে স্বামী দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

দয়ানন্দের পিতা শিবের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। পিতার ধর্ম্মনিষ্ঠা—পুত্রের জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময়—দয়ানন্দের বর্ণজ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পিতার চেষ্টায়—এই মুকুলিত জীবনেই বেদযন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহুস্থান—দয়ানন্দের অভ্যস্থ হইয়াছিল। অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি ব্রহ্মচিহ্ন

দয়ানন্দ সরস্বতী
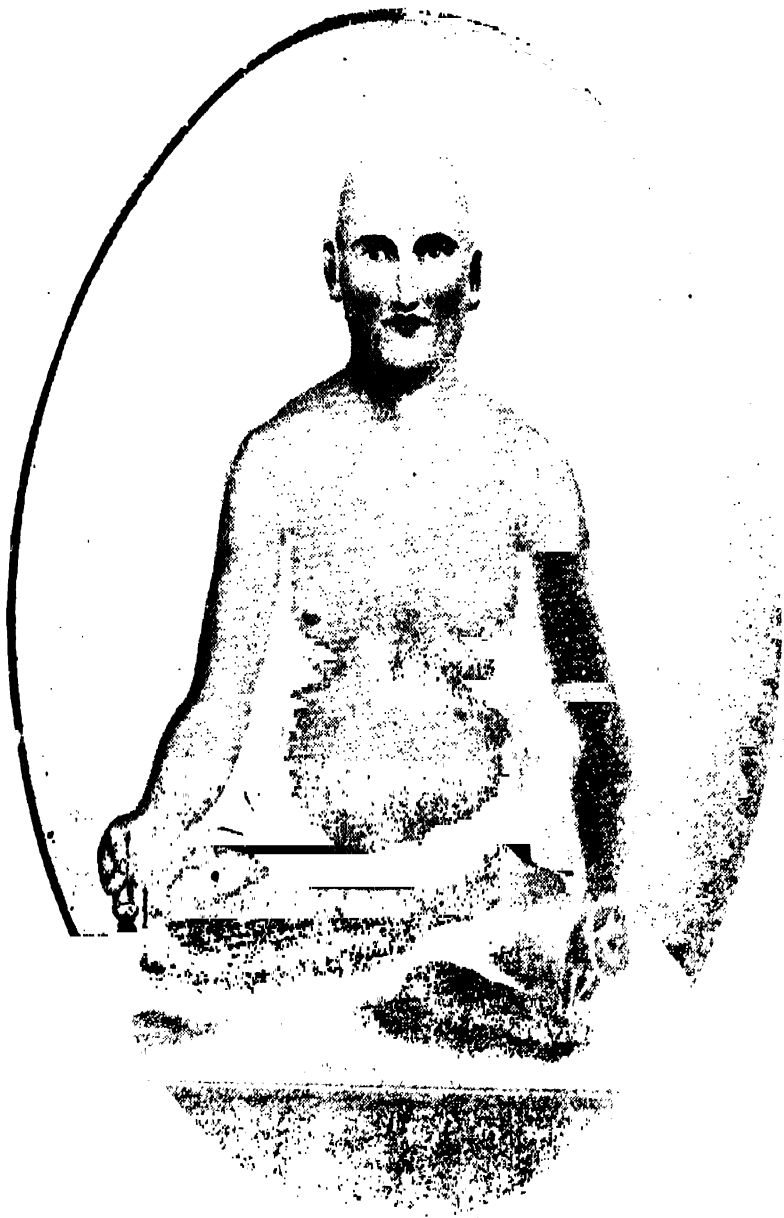
যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে—তিনি বেদবিৎ বিপ্র বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

(২)

দয়ানন্দের পিতা প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন। একদিন শিবের নৈবেদ্যের উপর কতকগুলা মূষিক বিহার করিতেছিল, দয়ানন্দ ইহা দেখিতে পান। এই ঘটনা হইতেই তাঁহার জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল। দয়ানন্দ ভাবিলেন—এই ত্রিশূলধারী শিব স্বচক্ষে স্বীয় নৈবেদ্য মূষিক কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইতে দেখিয়াও—স্থির হইয়া রহিয়াছেন। যিনি—কৈলাস নাথ, সংহারময়ী শক্তি যাঁহার সহচরী—তাঁহার দেহে কি মূষিক তাড়াইবারও শক্তি নাই! তবে তো এ দেবমূর্ত্তি প্রাণশূন্য জড় পদার্থ মাত্র।

শিবের প্রতি দয়ানন্দের আর ভক্তি রহিল না। মূর্ত্তি পূজার উপর তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিল। কিন্তু পিতার ভয়ে—তিনি মনোভাব গোপন করিলেন।

দয়ানন্দের এক ভগ্নীছিল—এই বালিকার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। তাহার কিশোর দেহে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস ছিল। এই রূপবতী বালিকা সহসা একদিন জ্বরাক্রান্ত হইল। সেই জ্বর ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বালিকার সেই প্রদোৎ প্রভাময়ী বিজলীর মত রূপ—রোগের যন্ত্রণায় মসি-মলিন হইয়া উঠিল। পিতামাতা বহু চেষ্টা করিয়াও—হৃদয়ের স্নেহ আকর্ষণে, বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। সহসা একদিন আত্মীয় স্বজনের হাহাকারের মধ্যে বালিকা নীরবে প্রাণ ত্যাগ করিল।

দয়ানন্দ এ কয় দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভগ্নীর সুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মরণাহতা বালিকার অব্যক্ত মৃত্যু যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়া—তাঁহার শোকমথিত বেদনা প্লুত বক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিল! মৃত্যুর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে মুক্তি পিপাসা প্রবল হইল। মানব

জীবন এত ক্ষণস্থায়ী? সংসার সুখ এত নশ্বর?—দয়ানন্দ স্থির চিত্তে—মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

সংসারে দয়ানন্দের আর আস্থা রহিল না। পিতা—পুত্রের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন;—তিনি দয়ানন্দের বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন। দয়ানন্দ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; পিতা কোন কথা শুনিলেন না। কাজেই নিরুপায় হইয়া সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া, দয়ানন্দ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে—সকলের অজ্ঞাত সারে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৩)

পিতা নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে, অনেক অনুসন্ধানের পর—এক সন্ন্যাসীর মঠে ধরিয়া ফেলিলেন। দয়ানন্দ আর পলায়ন করিতে পারিলেন না; পিতার সঙ্গে তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হইল। পিতাও এবার পুত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। প্রহরী বেষ্টিত গৃহে—দয়ানন্দকে অপরাধীর মত বন্দী থাকিতে হইল।

কিন্তু বড় বেশী দিন তাহার বন্দীদশা থাকিল না। একদিন প্রহরীগণকে নিদ্রিত দেখিয়া—দয়ানন্দ পলায়ন করিলেন। এবার আর নিকটস্থ কোন স্থানে না গিয়া তিনি একেবারে—সুদূর বরদারাজ্যে গমন করিলেন। সে স্থান হইতে আহম্মদাবাদ ও ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়া, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বারের কুম্ভ [illegible] লোকের সমাগম হয়। দয়ানন্দ সেই সকল সর্ব্বশ্রেণীর [illegible]—মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন।

[illegible] দেশে যাইতেন, তখন সেই দেশের অধিবাসীগণ [illegible] তাঁহার সৌম্যশান্ত সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইত। তিনি সকলকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেন—

কেবল মূর্ত্তি পূজার নিন্দা করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইল: প্রচলিত "মূর্ত্তি পূজার" বিরুদ্ধে আন্দোলন করায়—অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি কেহ কেহ দয়ানন্দের প্রাণ সংহার করিবার জন্যও সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ষড়যন্ত্র কারীদের জ্বালায়—তিনি একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেন না।

(৪)

এই ভাবে ঘোর অশান্তিতে কিছু কাল অতিবাহিত হইল। দয়ানন্দ পরমানন্দ পরমহংসকে আপনার বিপন্ন অবস্থায় কথা খুলিয়া বলিলেন। পরম হংস তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—"মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বলিও না।" কিন্তু দয়ানন্দের সন্ন্যাসাশ্রমের দীক্ষাগুরু পূর্ণানন্দ পরম হংস—তাঁহাকে আন্দোলন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়—ব্যাসাশ্রমের যোগানন্দ, বারাণসীর সচ্চিদানন্দ, কেদার ঘাটের গঙ্গাগিরি, শিবানন্দ এবং জোয়ালাইন্দ প্রভৃতি যোগীগণের সহিত দয়ানন্দের পরিচয় হয়। এই সকল মহাত্মার উপদেশে—দয়ানন্দ যোগ শিক্ষা আরম্ভ করেন।

আর্য্যাবর্ত্তের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিরজানন্দ তখন মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, দয়ানন্দ বিরজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সেই ৮১ বৎসরের বৃদ্ধের তর্কশক্তি দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হন এবং বিরজানন্দের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। দয়ানন্দের বয়স তখন ৩৫ বৎসর।

ইহার অল্পদিন পরে, তাহাকে কোন কার্য্য উপলক্ষে ফরক্কাবাদে যাইতে হয়। এই ফরাক্কাবাদে দয়ানন্দ একটী বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময় তাঁহার যত্নে—পঞ্জাবের নানা স্থানে "আর্য্য সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সংবাদ পত্রের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত, লাজপৎ রায় এবং ভারতী সম্পাদিকা সুলেখিকা শ্রীমতী সরলাদেবীর

স্বামী—শ্রীযুক্ত রামভুজদত্ত চৌধুরী মহোদয়—দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত "আর্য্য সমাজের" সভ্য হইয়াছিলেন। লাজপত মাংসাশী দলের, এবং রামভুজ নিরামিষ ভোজী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তা'রপর দয়ানন্দ কাশীতে উপস্থিত হইয়া আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি—মূর্ত্তি পূজার ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মে—তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না। এ হেন দয়ানন্দের আবির্ভাবে, কাশীতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কাশীবাসীরা দয়ানন্দের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসে (কার্ত্তিক, শুক্লা দ্বাদশীর দিন) কাশীস্থ পণ্ডিতগণ মিলিয়া—এক মহা সভা আহ্বান করিলেন। সভার উদ্দেশ্য—মূর্ত্তি পূজার সমর্থন করা। সভাপতি হইলেন—স্বয়ং কাশীর মহারাজ। এই সভায় দয়ানন্দও উপস্থিত ছিলেন। দয়ানন্দের সহিত পণ্ডিত মণ্ডলীর যথেষ্ট বাদ বিতণ্ডা হয়। কিন্তু পরিনামে—দয়ানন্দই জয়ী হইলেন। পণ্ডিতগণের অনেকেই—দয়ানন্দের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। পণ্ডিতগণ—বিচারনীতির অপমান করিয়া দয়ানন্দেরই অমূলক পরাজয় বার্ত্তা সাধারণের কাছে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

দয়ানন্দ যত দিন কাশীতে ছিলেন, তিনি প্রায়ই পণ্ডিতগণকে তর্কক্ষেত্রে আহ্বান করিতেন, কিন্তু কোন পণ্ডিতই তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেন না।

(৫)

ইহার পর দয়ানন্দ কলিকাতায় আসেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ব্রাহ্ম সভায় দয়ানন্দ—একেশ্বর বাদ পক্ষে এবং জাতিভেদ ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে, দয়ানন্দ "ঈশ্বর ও ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দেঃ জানুয়ারী মাসে—মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ—দয়ানন্দের প্রতিকুলাচরণ করিবার জন্য—সেনেট হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন করেন। তখন দয়ানন্দ কলিকাতায় বর্ত্তমান ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়—দয়ানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের শত্রু—তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই শাস্ত্র বিরুদ্ধ!

উত্যক্ত হইয়া দয়ানন্দ সাহাপুর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সেখানে, তদ্দেশীয় নৃপতিগণ দয়ানন্দকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যোধপুরে—দয়ানন্দ পীড়িত হন এবং রোগ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ১৫ই অক্টোবর প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ—দগ্ধ করা হয়।

বেদোক্ত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ—ইহাই দয়ানন্দের ধর্ম্মমত ছিল।

যোগীবর ত্রৈলিঙ্গ স্বামী

(১)

দাক্ষিণাত্যের বিজানাগ্রাম জেলায়, হেলিয়া নামক নগর আছে। ঐ গ্রামে নৃসিংহ ধর শর্ম্মা নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। নৃসিংহ দেবের বিপুল বিভবের উত্তরাধিকারী হইয়া, ১৫২৯ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে, তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নীর পুণ্যগর্ভে যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহারই নাম ভারতবিখ্যাত ত্রৈলিঙ্গ স্বামী।

বড়মানুষের ঘরের আদরের ছেলে হইয়াও ত্রৈলিঙ্গ ধরের সুকুমার শৈশব—কেবল ধূলাখেলায় পর্য্যবসিত হয় নাই। বিদ্যাচর্চ্চায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, অল্প বয়সেই তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুখসম্পদের গৌরবে তাঁহার জীবনের প্রভাত আকাশ লোহিত লালসায় রঞ্জিত হয় নাই। তাঁহার জীবন মধ্যাহ্নও আকাঙ্ক্ষা তপনের কোটি জ্বালা চৌদিকে বিকীর্ণ করিয়া বহ্নিময় হইয়া উঠে নাই। সুখের কোলে লালিত হইয়াও, তিনি সংসারের ভোগবিলাসকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলেন। নৃসিংহ ধর অনেক চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে দারপরিগ্রহে সম্মত করিতে পারেন নাই। ত্রৈলিঙ্গ ধর কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, সত্যসাধনায়, ব্রহ্মচর্য্যপালনে এবং পরোপকার-ব্রতে যুবকের আত্মগৌরব তৃপ্ত হইত।

* ইঁহার গুরুদত্ত নাম—গণপতি স্বামী। কিন্তু সে নামের পরিবর্ত্তে সকলেই তাঁহাকে "ত্রৈলিঙ্গ স্বামী" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

যোগীবর ত্রৈলিঙ্গ স্বামী

সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী কালের আহ্বানে—নৃসিংহ ধর যখন ইহসংসার হইতে চির অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন ত্রৈলিঙ্গ ধরের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। ত্রৈলিঙ্গ ধর তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা শ্রীধরকে পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত অর্পণ করিয়া, আপনি কঠোর বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পাছে জননীর প্রাণে আঘাত লাগে এই ভয়ে সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারিলেন না।

শ্রীধর নৃসিংহ ধরের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি অগ্রজকে বিষয় কর্ম্ম পরিদর্শন করিবার জন্য অনেক অনুনয় করিলেন, তাঁহার দ্বারা এত বড় সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করা একেবারেই অসম্ভব—একথা বারংবার বুঝাইলেন, তথাপি ত্রৈলিঙ্গধর দৃঢ়সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না।

নৃসিংহ ধরের মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে, তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নী লোকান্তর গামিনী হইলেন। মাতৃশোক ত্রৈলিঙ্গধরকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ৫২ বৎসর বয়সে তিনি মাতার জন্য বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, শবদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। মাতার অগ্নি-সংস্কার করিতে ত্রৈলিঙ্গ ধরকেও সঙ্গে যাইতে হইল। কিন্তু তিনি আর গৃহে ফিরিলেন না, মাতার ভস্মাবশেষ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, সেই শ্মশানেই বাস করিতে লাগিলেন।

(২)

ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর অনেক চেষ্টা করিয়াও অগ্রজকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না; অগত্যা সেই শ্মশানের উপরেই ভ্রাতার বাসযোগ্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। কিন্তু ত্রৈলিঙ্গধর সে গৃহে পদার্পণও করিলেন না। তিনি কৌপীনধারী, ফলমূলাহারী, সন্ন্যাসী সাজিয়া, এক বৃক্ষতলে বাস করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহার বিশবর্ষ কাল সেই ভীষণ শ্মশানেই অতিবাহিত হইল।

এই সময় ভগীরথ স্বামী নামে একজন যোগী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আগমন করেন। ইনি শ্মশানে ও চৈত্য বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে ভাল বাসিতেন, লোকালয়ে যাইতে চাহিতেন না। একদিন স্নান করিবার সময়, ভগীরথের সহিত ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর অল্প পরিচয় হয়। এই আলাপে উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারেন। ভগীরথ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করেন।

পুষ্করে অবস্থান কালে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ভগীরথের নিকট যোগের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া যোগাভ্যাসে রত হন।

ভগীরথ স্বামীর অনেক বয়স হইয়াছিল। পুষ্কর তীর্থেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। গুরুর লোকান্তর গমনে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর আর পুষ্করতীর্থে থাকিতে ভাল লাগিল না। স্বামী-জী তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন।

রামেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে সুদামাপুরী, এই সুদামা পুরীর কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী একদিন অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি সস্ত্রীক স্বামীজীর সাধ্যমত পরিচর্য্যা করেন। ব্রাহ্মণ দম্পতীর ভক্তিতে প্রীত হইয়া ত্রৈলিঙ্গ স্বামী তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করেন।

ব্রাহ্মণ-দম্পতী নিঃস্ব ও নিঃসন্তান ছিলেন। স্বামীজীর বরে—অচিরেই তাঁহারা পুত্রধন প্রাপ্ত হইলেন। চিরদরিদ্রের গৃহে কমলার পদার্পণ ঘটিল। ব্রাহ্মণের পুণ্য ভবন শীঘ্রই শিশুর কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

স্বামীজীর এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, অনেক লোক তাঁহার শরণাগত হইল। কেহ ধনের আশায়, কেহ পুত্রের আকাঙ্ক্ষায়, কেহ বা রোগমুক্তির আশায়, স্বামীজীর চরণে কামনা করিতে লাগিল। এইরূপ বিপুল জনতায় বিরক্ত হইয়া স্বামীজী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া

দেবতাত্মা হিমালয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশীদিন থাকিতে পারিলেন না, লোকে স্বার্থসিদ্ধির কামনায় তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল।

(৩)

এইবার স্বামী-জী নর্ম্মদাতীরে মার্কণ্ডের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এখানে অনেক যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মার্কণ্ডের আশ্রমে—একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহার নাম "খাকী বাবা"। খাকী বাবা একদিন গভীর রাত্রে শৌচার্থ্যে নর্ম্মদাতীরে গমন করেন। সেই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার নয়ন-সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। খাকী বাবা দেখিলেন—নর্ম্মদার সমস্ত জল দুগ্ধে পরিণত হইয়াছে, সেই দুগ্ধ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতেছেন। কিন্তু খাকী বাবা নিকটস্থ হইবামাত্র—নর্ম্মদা দুগ্ধরূপ পরিত্যাগ করিয়া জলরূপ ধারণ করিল। তখন খাকী বাবা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া একথা সকলের কাছে প্রকাশ করিলেন। সুতরাং এখানেও আর স্বামীজীর থাকা হইল না। তিনি গুপ্তভাবে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন।

কাশীধামে আসিয়া স্বামী-জী তুলসী দাসের বাগানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই বাগানে একজন কুষ্ঠরোগী বাস করিত, স্বামী-জী তাহাকে সমাজের পাংশু স্তূপ হইতে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার নির্ব্বেদ নিরাপদ আলিঙ্গনে—পাপী রোগমুক্ত হইয়া স্বামী-জীরই সেবা করিতে লাগিল।

কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গেল। এই দৃষ্টান্তে সকলেই স্বামীজীর "ঋষিত্ব" ও "দেবত্ব" চিনিতে পারিল। স্বামীজীর ঋষিত্ব—কুষ্ঠরোগীর সহবাসে বলীয়ান্ বিসর্জ্জনের প্রতিষ্ঠা! তাঁহার দেবত্ব—পাপঘৃণ্য, কিন্তু পাপী ঘৃণ্য নহে!!

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সংবাদ বারাণসীর চতুঃসীমায় এক জাগ্রত কৌতূহলের মহাপ্লাবন উপস্থিত করিল। সাধনার বিঘ্ন হইবার আশঙ্কায় স্বামীজী বেদব্যাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে এক ভুবনমোহিনী মারহাট্টা যুবতী, তাঁহার স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার আশায় ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়েন; কিন্তু স্বামীজীর উলঙ্গ ভৈরবমূর্ত্তি দেখিয়া যুবতী লজ্জিতা হইয়া প্রস্থান করিল। শেষে যুবতী স্থির করিল—স্বামীর ব্যাধিমুক্তির জন্য সে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিবে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া যুবতী দেখিল—অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের রত্নসিংহাসনে সেই উলঙ্গ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর বিরাটমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে! এতক্ষণে যুবতী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। অনেক স্তব স্তুতিতে স্বামীজীকে প্রসন্ন করিয়া, যুবতী পতির প্রাণরক্ষা করিল।

কাশীবাসী সকলেরই মনে বিশ্বাস হইল—স্বামীজী বিশ্বেশ্বরেরই অবতার। তাহারা স্বামীজীকে দেবতার মত ভক্তি করিত। স্বামীজী বড় একটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সেই স্থাণুর মত নিশ্চল মূর্ত্তির পাদমূলে কত রাজ্যেশ্বরের রত্নভূষিত শির সম্ভ্রমে নত হইত। স্বামীজী পৌষের দারুণ হিমাণীতে গঙ্গার শীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া থাকিতেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁহাকে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। শীতাতপ সহিষ্ণু স্বামীজী কখনও কাহারও কাছে আহার্য্য চাহিতেন না, যাত্রিগণ স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার মুখে খাদ্য তুলিয়া দিত। আহারকালে স্বামীজীর মনে জাতিবিচার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের অনুশাসন স্থান পাইত না। হাতে তুলিয়া যে যাহা দিত, স্বামীজী তাহাই ভক্ষণ করিতেন।

স্বামীজীকে জব্দ করিবার জন্য একদা এক দুর্ব্বৃত্ত খানিকটা চূণ তাঁহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, স্বামীজী অম্লানবদনে তাহা খাইয়া

ফেলিয়া, তাহারি সম্মুখে বিষ্ঠাত্যাগ করেন। সেই বিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত চুণ বাহির হইয়াছিল। এই অলৌকিক ঘটনায় লোকটা ভীত হইয়া স্বামীজীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে। রিপুজয়ী স্বামীজী দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহাকে অভয় দান করেন।

(৪)

ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সরলতা ঠিক শিশুর মত ছিল। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতেন না, সর্ব্বদাই উলঙ্গ থাকিতেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রে সাহেব—স্বামীজীর উলঙ্গমূর্ত্তিকে স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতার হানিকারক ভাবিয়া স্বামীজীকে বস্ত্র পরিধান করিবার আদেশ দেন এবং বস্ত্র পরিধান না করিলে তিনি স্বামীজীকে নিজের খানা খাওয়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন—"তুমি আমার খানা খাইতে পার ? তাহা হইলে আমিও তোমার খানা খাইব।" সাহেব তখন স্বামীজীর খানা কি রকম, তাহা জানিতে চাহিলেন। স্বামীজী সাহেবের সম্মুখে তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ করিলেন এবং সাহেবের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া সেই বিষ্ঠা প্রফুল্ল বদনে খাইয়া ফেলিলেন।

স্বামীজীর নিকট চন্দন ও বিষ্ঠার পার্থক্য ছিল না। এই অমানুষিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, সাহেব আর স্বামীজীকে বস্ত্র পরিধান করিবার অনুমতি দিতে সাহস করিলেন না।

একদিন এক রাজা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কাশীধামে সস্ত্রীক উপস্থিত হ'ন। অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুলবধূর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, রাজার বাসভবন হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পথের দুই ধার পর্দ্দা ফেলিয়া সুসংস্কৃত করা হয়। মহিষী ও রাজা স্নান করিয়া সিক্ত বেশে পথে আসিতে আসিতে দেখিতে পান—যবনিকার ভিতরে মহিষীর সম্মুখে উলঙ্গ বেশে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী দণ্ডায়মান ! উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিয়া মহিষী লজ্জায় অধোমুখী

হইলেন, একটা পুরুষ রাজ-অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট করিল দেখিয়া রাজা স্বামীজীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ন। রাজা স্বামীজীকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া স্বামীজীর এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেন—স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না। ইহাতে রাজা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। লোকে রাজসমক্ষে স্বামীজীর যোগ বিভূতির বিষয় নিবেদন করিল। রাজা কাহারও কথা শুনিলেন না, তিনি স্বামীজীকে বেত্রাঘাত করিবার জন্য দুইজন অনুচরকে আদেশ করিলেন। সর্ব্বলোক লোচনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে স্বামীজী সেই নিদারুণ বেত্রদণ্ড সহ্য করিলেন! সাধুর এই অপমানে অনেকেই দুঃখিত হইল।

সেইদিন রাত্রেই এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেন স্বয়ং কাশীশ্বর উন্মুক্ত ত্রিশূলহস্তে—রাজাকে সেই দণ্ডেই কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছেন! পারিষদবর্গ রাজার মুখে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া চমকিত, বিত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের পরামর্শে অনুতপ্ত রাজা স্বামীজীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। স্বামীজী রাজাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু কাশীতে থাকিতে রাজার আর সাহস হইল না। পরদিন প্রভাতে রাজা কাশী পরিত্যাগ করিলেন।

(৫)

স্বামীজীর যোগবল সম্বন্ধীয় অনেক জনশ্রুতি লোকসমাজে প্রচলিত আছে। সে সকল কথা স্বল্পাবসরে বলিবার নহে। যোগবলে তিনি অদৃশ্য হইতে পারিতেন।

একদা এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কোন নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নৌকা-যোগে কাশীতে আসিতেছিলেন। সাহেবের সঙ্গে একটী বাঙ্গালী কর্ম্মচারীও ছিল। নৌকাখানি মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

এই সময় ত্রৈলিঙ্গস্বামী গঙ্গার জলের উপর ভাসিতেছিলেন। ইংরাজের বিদ্যুৎচকিত দৃষ্টি স্বামীজীর উপর পতিত হইল। বাঙ্গালী বাবুটী স্বামীজীর যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া, সাহেবকে স্বামীজীর মহিমা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সাহেবের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি স্বামীজীকে নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বাঙ্গালী বাবুটীও অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। তখন স্বামীজী নিরাপত্তিতে নৌকায় উঠিয়া সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামীজী দেখিলেন—সাহেবের পার্শ্বে একখানি তরবারি রহিয়াছে। স্বামীজী তরবারি খানি উঠাইয়া লইয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিলেন। তারপর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া একটু ভীতি ভাব প্রকাশ করিয়াই সহসা তরবারিখানি গঙ্গার অগাধ জলে নিক্ষেপ করিলেন। স্বামীজীর এই ব্যবহারে সাহেবের ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। বাঙ্গালী বাবুটী সাহেবকে বলিলেন—"আপনি যোগীর প্রতি ক্রোধ করিবেন না, ঘাটে উঠিয়া আমি ডুবুরি দিয়া আপনার তরবারি তুলিয়া দিব।" সাহেব কিন্তু স্বামীজীকে শাস্তি দিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিতেছিলেন।

স্বামীজী সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ প্রাণঘাতী অস্ত্রখানা কি সাহেবের বড়ই আবশ্যকীয়?" বাঙ্গালী সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। তখনি স্বামীজী গঙ্গার জলে হস্ত প্রসারণ করিয়া তিন খানি তরবারি উত্তোলন করিয়া, সাহেবকে নিজের তরবারি বাছিয়া লইতে বলিলেন। সাহেব তো অবাক্,—তিন খানি তরবারিই দেখিতে একরকম, সাহেব নিজের তরবারি চিনিতে পারিলেন না। তখন স্বামীজী হাস্যমুখে একখানি তরবারি সাহেবের হাতে দিয়া অপর দুইখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। এইবার সাহেবের চমক ভাঙ্গিল,

তিনি স্বামীজীর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া স্বামীজীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী প্রসন্ন-মুখে সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গায় অবতরণ করিয়া, সর্ব্বলোক লোচনের সমক্ষেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

একজন ব্রাহ্মণের অল্পবয়স্ক একটী পুত্রের পঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়, বহু চিকিৎসাতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। ব্রাহ্মণ স্বামীজীর শরণাগত হইলে,—স্বামীজী তাহার পুত্রকে একটু মৃত্তিকা খাইতে দেন। ইহাতে সেই দিনেই বালক প্রকৃতিস্থ হয়।

(৬)

স্বামীজীর মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য, প্রত্যহ সন্ধ্যায় অনেক লোক স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইত।

একদিন এক শোকার্ত্ত ভদ্রলোক মনের অশান্তি দূর করিবার জন্য স্বামীজীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে দিন বড় বর্ষা। রাত্রি ৯টা ১০টার সময় সকলে বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, ভদ্রলোকটীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে ইঙ্গিতে যাইতে নিষেধ করিলেন। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল।

বৃষ্টি থামিলে, ভদ্রলোকটী আবার প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন। সেবারেও স্বামীজী নিষেধ করিলেন। অবশেষে ভদ্রলোকটীকে দুটী এলাচ খাইতে দিয়া, তাঁহাকে আশ্রমের পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইতে বলিলেন।

বাহিরে রজনী ঘোরান্ধকারময়ী। সম্মুখের পথঘাট পর্য্যন্ত জমাট-অন্ধকারে লিপ্ত। মুহুর্ম্মুহুঃ গম্ভীর মেঘগর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে-ছিল। গগনের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ বিস্ফারিত হইয়া আঁধারের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল।

ভদ্রলোকটী যে মুহূর্ত্তে পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সম্মুখদ্বারের অনতিদূরে একটা গাছে উপর্য্যুপরি দুই বার বজ্রাঘাত হইল।

ভদ্রলোকটী তখন স্বামীজীর নিষেধের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভদ্রলোক দেখিলেন—আঁধারের ভীম আলিঙ্গনে আকাশ, পৃথিবী, অনন্ত শূন্য কবলিত করিয়া রহিয়াছে! মাঝে মাঝে কেবল দামিনীর চকিত বিলসন! ভদ্রলোক দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হইলেন। সহসা তাঁহার অগ্রভাগে তিনি এক উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন—হৃদয়ে অস্পষ্ট ভীতির ছায়া। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু এক ফোটা জলও ভদ্রলোকটীর গায়ে পড়িতেছিল না।

ভদ্রলোক বাটী পঁহুছিয়াই দেখিলেন—তাঁহার গাত্র বা গাত্রবস্ত্র কিছুই ভিজে নাই—কেবল পদদুটী সিক্ত হইয়াছে মাত্র। তখন তিনি বুঝিলেন—স্বামীজীর উদার করুণায় সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইলেন।

* * * *

স্বামীজী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। সুখ দুঃখের অতীত হইয়া তিনি পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পৌষমাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে, সায়ংকালে স্বামীজী কাশী ধামে যোগাসনে আসীন থাকিয়া নশ্বর দেহত্যাগ করেন। সে সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ২৮০ বৎসর হইয়াছিল।

যোগীবর ভাস্করানন্দ স্বামী

(১)

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাণপুরের অন্তর্গত মৈথেলাল পুর গ্রামে মিশ্রিলাল নামে এক সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল না। সংসারে তিনি নিজের অনুরূপা প্রেমময়ী সহধর্ম্মিনী পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের সংসারে আর কোনও অভাব ছিল না, এক অভাব ছিল—তাঁহার পুত্র হয় নাই। কিন্তু সেজন্য দ্বিজদম্পতীর প্রফুল্ল মুখে—এক দিনের জন্যও চিন্তার রেখাপাত হয় নাই। শাস্ত্রালাপে, ধর্ম্ম সাধনায়, অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাদের জীবনের অবসর পরম সুখে অতিবাহিত হইত।

এই পুণ্য প্রথিত গৃহস্থের হৃদয়ের যে অংশটা নিতান্ত খালিছিল, বিধাতার করুণ আশীর্ব্বাদে অচিরেই সে শূন্যস্থান টুকু পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। যৌবনের শেষ সীমায় ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইলেন। ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। জীবনের সম্মুখে আশার উজ্জ্বল রাজ্য স্থাপন করিয়া—ব্রাহ্মণ ভাবী বংশধরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল উপাস্থত হইল। এমন সময় কোথা হইতে তিন জন সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথি সৎকারের ত্রুটি করিলেন না। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব সন্ন্যাসীত্রয় ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"আজ মধ্য রাত্রে তোমার এক পুত্র ভূমিষ্ট হইবে।" সে দিন শুক্লাপঞ্চমী তিথি।

ভাস্করানন্দ স্বামী

তখন আশ্বিন মাস,—শরদাগমনের শুভ মুহূর্ত্তে—ভারতের বিশাল বক্ষে মহামহোৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, সিংহবাহিনীর সন্তাপ হারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া জন্ম সফল করিবার জন্য—কোটী কোটী নরনারী মাতিয়া মাতৃ পূজার বিরাট আয়োজন করিয়াছে!

(২)

বঙ্গাব্দের ১২৪০ সালের শুভ আশ্বিন মাসে, মিশ্রলালের পুণ্য ভবনে দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল।

সেই দিব্য জ্যোৎস্নাস্নাত নক্ষত্র কিরীটিনী যামিনীতে, ঠিক দুই প্রহরের সময়—ব্রাহ্মণী এক পুত্র প্রসব করিলেন! জগদতীত আনন্দ প্রবাহের লহরী তুলিয়া শুভশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ত্রিনয়ন আলোক পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণী আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য উৎসঙ্গে ধরিয়া দেব সৌন্দর্য্যে দেবী প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন।

হৃদয়ের সমস্ত অবসাদ—সমস্ত শৈথিল্য নিমেষে দূরে ফেলিয়া, মিশ্রলাল—সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে সেই তিন জন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা—সদ্যজাত শিশুর মঙ্গলোদ্দেশে—সূতিকাগৃহে হোমের অনুষ্ঠান করিলেন। হোমের তিলক শিশুর ললাটে শোভিত হইল। তৃষ্ণাতুর মিশ্রিলাল—ভুজবল্লী সাগ্রহে প্রসারিত করিয়া নব কুমারের মুখে—এক অপার্থিব প্রেমচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তিনি যখন বাহিরে আসিলেন—তখন সন্ন্যাসীত্রয় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে কোন্ পথে অদৃশ্য হইয়াছে—কেহ তাহা বলিতে পারিল না।

বালকের জাতকর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল। শুভদিনে মিশ্রিলাল—পুত্রের নাম রাখিলেন—"মতিরাম"।

অষ্টম বর্ষীয় শিশুর উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইলে, মিশ্রিলাল বালককে গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। সেখানে—"সারস্বত চণ্ডিকা" "ব্যাকরণ ও রঘুবংশ" মহাকাব্য পাঠ করিয়া বালক বেদান্ত পড়িতে লাগিল। বেদান্ত

পাঠে বালকের চ'খের সম্মুখে—বিশ্বের অপার অনন্ত রহস্যরাজি—ফুটিয়া উঠিল। বালক, অনন্তের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া, বুঝিতে পারিল—অবিদ্যার দুর্ভেদ্য কুয়াসায় সংসারের সমস্ত জিনিষ মলিন, নশ্বর, অস্পষ্ট! অতএব মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য—সত্যের সাধনা, বৈরাগ্যের আশ্রয়।

মিশ্রিলাল পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণী বক্ষের ধনকে আপনার করিবার জন্য—পুত্রবধূর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অপরিণত বয়সে—মতিরামের বিবাহ হইয়া গেল। পিতা মাতা আশায় বুক বাঁধিলেন।

বিবাহের পর মতিরাম বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কাশী যাত্রা করিলেন।

অপরিমিত জ্ঞান সম্পদ সঞ্চয় করিয়া "মতিরাম" যখন দেশে ফিরিলেন—তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর। ১৭ বৎসরের বালক—এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত।

(৩)

এইবার মিশ্রিলাল পুত্র বধূকে গৃহে আনিলেন। মতিরামের পত্নী অসামান্য সুন্দরী ছিল। উৎফুল্ল যৌবন—তাহার সুকুমার অঙ্গে অরুণের আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যুবতী শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি কতই সুখ স্বপ্ন রচনা করিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য—স্বামী তাহার আপনার হইল না। সে দেখিল—কি এক মহাবহ্নি স্বামীর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে,—বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—অশ্লথ গতিতে অনন্য দৃষ্টি লইয়া তিনি অভীষ্ট সত্যের অনুসরণ করিতেছেন! তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবার স্বামীর আর অবসর নাই। হায়! প্রথম যৌবনে—যুবতীর জীবন কেবল দুঃখ যন্ত্রণার ইতিহাস হইল।

মতিরামও বুঝিলেন—পত্নীকে তিনি সুখী করিতে পারিবেন না। সংসারের ভোগ আকাঙ্ক্ষায় তিনি তো মুগ্ধ নহেন—এ নারী, এ যুবতী সংসারীর বিলাসসাধন, এতো আত্মার সঙ্গিনী নহে।

এইরূপে প্রণয়হীন পরিণয়ের জয়পরাজয় লইয়া, স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্বচঞ্চল প্রাণের উপর দিয়া বসন্ত চলিয়া গেল। যুবতীর গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বন্ধনের উপর বন্ধনের আয়োজন দেখিয়া মতিরাম ক্ষুন্ন হইলেন। যুবতী ভাবিল—এই গর্ভস্থ শিশুই একদিন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিবে। আশার আগ্রহে রমণীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অচিরভাবী পৌত্রমুখদর্শনের লোভে মিশ্রিলাল ও তাঁহার পত্নী উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

শ্বশুর শ্বাশুড়ীর আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে যুবতী এক কমল কোরকোপম শিশু প্রসব করিল। মিশ্রিলালের পুণ্যভবন আলোকমালায় সুসজ্জিত হইল। কিন্তু সেই রাত্রে প্রসূতি রমণী ও সদ্যজাত শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া, মতিরাম নিরুদ্দেশ হইলেন। মিশ্রিলালের উৎসব-ভবন—শোকের হাহাকারে পূর্ণ হইল।

(৪)

পিতা মাতা, পত্নী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থি জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া মতিরাম বিবুধজননী উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

উজ্জয়িনী কবি কালিদাসের লীলাভূমি—রাজা বিক্রমাদিত্যের সাধের রাজধানী। এখানে একদিন অভিসারিকা অনুরাগে মেঘমন্দ্রে অবহেলা করিয়া ঘনান্ধকারা রজনীতে বিদ্যুৎপ্রভায় পথ খুঁজিয়া প্রিয় সমাগমে চলিত, সুরভি পবন কুসুমিত উপবন কাঁপাইয়া শীকর সম্পর্কে শীতল হইয়া রহিত! কুলবধূ—বকুলের মালা গলায় পরিয়া ককুভমঞ্জরীতে কর্ণাভরণ রচিয়া স্বামীর মনোহরণ করিত! মেঘগম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি

মুখর অভ্রভেদী প্রাসাদমালায়—নাগর নাগরী বিহার করিত! সরোবরে—নিত্য শতদলে শতদল ফুটিত, শশিকরে চন্দ্রকান্তমণি ঝরিয়া বিরহীর অনঙ্গ জ্বালা নিবারণ করিত। কনককদলী বেষ্টিত ক্রীড়াশৈলে—কুরুবক মণ্ডিত মাধবীমণ্ডপে—মণিখচিত স্ফটিক ফলককাঞ্চনের বাসযষ্টিতে বসিয়া ময়ূরী শিঞ্জিণীর তালে নৃত্য করিত!

এখন উজ্জয়িনীর আর সে শোভা নাই, কৃতী মানুষ শোভার উপর শোভা চাপাইয়া, রুচি বাসনা কল্পনা অনুসারে যাহাকে সমৃদ্ধিময়ী করিয়া তুলিয়া ছিল, সে উজ্জয়িনীর এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত। কিন্তু সে শান্তিময়, বিষাদময় ভগ্নাবশেষ এখনও কবির পুণ্য স্মৃতিতে বিজড়িত! মতিরাম উজ্জয়িনীতে বাস করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর মধ্যভাগে একটী সুবৃহৎ মন্দির আছে, মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম—"কালেশ্বর"। মতিরাম দিবাভাগে এই মন্দিরেই থাকিতেন, শিবের অর্চ্চনা করিতেন, রাত্রে—নগরের সীমান্তে অবস্থিত কোনও শ্মশানে ধ্যানমগ্ন হইয়া আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেন।

এই সময় দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যোগী—পরমহংস পূর্ণানন্দ সরস্বতী উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হ'ন। একদিন স্বামীজীর সঙ্গে মতিরামের পরিচয় হয়। স্বামীজী মতিরামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে যোগ-বিদ্যায় দীক্ষিত করেন।

মতিরাম অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত যোগ শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ করেন। শিষ্যকে যোগবিভূতিতে অলঙ্কৃত দেখিয়া, স্বামীজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'ন এবং শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া গুজরাটে গমন করেন।

গুজরাটের মঠে থাকিয়া মতিরাম বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

(৫)

কিছুদিন গুজরাটে বাস করিয়া মতিরাম সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তা'র পর গুরুর উপদেশে—নিজের নাম, জাতি, যজ্ঞসূত্র—সমস্তই

পরিত্যাগ করিলেন। রেবানদী তীরস্থ কোন শ্মশানে তাঁহার আশ্রম স্থাপিত হইল। এই সময় তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর মাত্র।

পুত্র গুজরাটে বাস করিতেছেন—লোকমুখে মিশ্রিলাল এ সংবাদ পাইলেন। একদিন তিনি গুজরাটে উপস্থিত হইলেন। মতিরাম পিতার মুখে শুনিলেন—তাঁহার একাদশ বর্ষীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। বরং পিতাকে বুঝাইলেন—"মরণং প্রকৃতি শরীরীণাং"—শোক সংসারীজীবের পরীক্ষা মাত্র। জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ মিশ্রিলাল পুত্রের সিদ্ধমূর্ত্তির অনায়াস গাম্ভীর্য্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, সে যাত্রা মতিরামকে গৃহে ফিরিতে হইল।

মতিরাম আজ একাদশ বৎসর গৃহত্যাগী, একাদশ বৎসর পরে আজ তিনি পিতার সঙ্গে মৈথেলাল পুরে প্রবেশ করিতেছেন—মতিরামকে দেখিবার জন্য পথে লোকে লোকারণ্য হইল। সকলের সঙ্গে হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিতে করিতে মতিরাম বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

মতিরামের মাতা তখন—রোগ শয্যায় শায়িতা। মতিরাম একাদশ বর্ষ পরে সেই চিরপরিচিত গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহ নিস্তব্ধ—ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে গুমটের মত যেন কোন দারুণ দুর্ঘটনার পূর্ব্ব লক্ষণ স্তব্ধতায় গৃহ সমাচ্ছন্ন! মতিরাম রোগিণীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া স্থির চ'ক্ষে মাতার রোগপাণ্ডুর মুখ দেখিতে লাগিলেন। তা'র পর প্রাণের আবেগে ডাকিলেন—"মা"। সে স্বরে কোমলতা ছিল,—অশ্রুর উচ্ছ্বাস ছিল না। বুঝি সে স্বর মুমূর্ষুর স্নেহময় হৃদয়ের রুদ্ধপ্রায় স্পন্দন তন্ত্রীতে ধীরে ধীরে আঘাত করিল! বৃদ্ধার বিলুপ্ত প্রায় মানসী শক্তি একবার সচেতন হইয়া উঠিল—মাতা পুত্রকে দেখিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয়—একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কিন্তু মুখে আর কথা ফুটিল না! পুত্রের সম্মুখে—নীশব্দে বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

দীর্ঘপ্রবাসের পর—প্রত্যাখ্যানকারী পতির সন্দর্শন লাভ করিয়া মতিরামের পত্নী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বর্ষাজল তাড়িত তট ভূমির মত—মিলনাশা অন্তর্হিত হইয়াছে—রমণীর সেই গভীর উচ্ছ্বাস হৃদয় ব্যাপী প্রেম—স্বামীর চরণে লীন হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে প্রবল করিয়া তুলিল। বিরহ বিষাদ বিকল্প লুকাইয়া—রমণী যৌবনে যোগিনী সাজিলেন।

মতিরাম সংসারের মোহে আর জড়ীভূত হইলেন না, বৃদ্ধ পিতাকে ও শোকাতুরা সহধর্ম্মিনীকে সময়োচিত সান্ত্বনা করিয়া আবার তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

(৬)

ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া পদব্রজে ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মতিরাম বিখ্যাত যোগী অনন্ত রাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এখানে—সাধন তত্ত্বের নিগূঢ় উপদেশ গ্রহণ করিয়া শেষে কাশীধামে সংস্থান করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর।

পবিত্র কাশীধামে—ত্রিপথ গামিনী জাহ্নবী তীরে ভক্তগণ মতিরামের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। মতিরাম বিশ্বনাথের আরাধনা করিয়া হৃষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এ সময় তাঁহার মুখে—কেবল "বিশ্বনাথের" নাম—মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হইত, প্রেমের আবেগে তিনি কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন। প্রেমোন্মত্ত মতিরামের ভাবুকতা দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে দেবতার মত সম্মান করিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য—তাঁহার আশ্রমে নানা দেশের লোক সমাগত হইতে লাগিল। জনতা বহুল আশ্রমে থাকিতে না পারিয়া মতিরাম—অযোধ্যা প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেখানেও জনতা বৃদ্ধি দেখিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবার কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন।

কাশীতে, অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত আমেটীর শাসনকর্ত্তা রাজা লালমাধব সিংহের একটী মনোহর উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যানটীকে লোকে "আনন্দবাস" বলিত। উদ্যানটী নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত দেখিয়া মতিরাম ঐ উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজা সাধুকে সমাদরের সহিত আহ্বান করিলেন। সাধুর সেবার জন্য ৮ জন ভৃত্য নিযুক্ত হইল। আনন্দবাগে মতিরাম সদানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় গুরুদত্ত নামে তিনি পরিচিত হইলেন। লোকে তাঁহাকে "ভাস্করানন্দ স্বামী" বলিয়া অভিহিত করিল।

(৭)

এইবার স্বামীজীর মহাপরীক্ষা আরম্ভ হইল। দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কতকগুলি বেশ্যা স্বামীজীকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পাপীয়সীদের আশা ফলবতী হইল না। তাহারা যখন অভিসারে আসিত, তখন দেখিত ভাস্করানন্দের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি শত প্রভাকরের প্রদীপ্ত প্রভায় উজ্জ্বল, আর সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ কালসর্প গর্জ্জন করিতেছে। তখন বেশ্যাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইত, তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া অধোমুখে চলিয়া যাইত। এই সকল উৎপাতে বিরক্ত হইয়া রাজা লালমাধব "আনন্দবাগে" সাধারণের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

"আনন্দবাগে" ভূগর্ভমধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্রগৃহে স্বামীজী বাস করিতেন। এই গৃহে তিনি ক্রমাগত ২।৩ মাস কাল অনাহারে, এমনকি জলটুকু পর্য্যন্ত পান না করিয়া সমাধিমগ্ন থাকিতেন। এই সময় তিনি কৌপীন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসার ও সমাজের কাছে তাঁহার চাহিবার কিছুই ছিল না।

সমাধিগৃহ হইতে স্বামীজী যখন বাহির হইতেন তখন অনেকেই তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আনন্দবাগে উপস্থিত হইতেন। ভারতের বহু

নৃপতি—রেওয়া, নাটোর, ভিঙ্গা, ডুমরাওন, বেড়িয়া দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি রাজগণ, এমনকি হাইদ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ ও রামপুরের নবাব প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণ সকলেই স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন। অসূর্য্যম্পশ্যা রাজমহিষীগণও স্বামীজীর চরণ দর্শন করিবার জন্য শিবিকারোহণে আনন্দবাগে উপস্থিত হইতেন। ভারতের বড়লাট, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট, ভারতের প্রধান সেনাপতি—ইহারাও আগ্রহের সহিত স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন। স্বামীজী সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

(৮)

জন্মাবধি দেহত্যাগ পর্য্যন্ত স্বামীজীর ইহলৌকিক জীবন—অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সে সকল কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার স্থান ইহা নহে। আমরা কেবল স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

দাক্ষিণাত্যের কোন রাণী বৈষয়িক গোলযোগে বিপন্ন হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ তাহার নামে মামলা উপস্থিত করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য রাণীর হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থায় অসহায়া রাণী স্বামীজীর শরণাগতা হ'ন। স্বামীজী রাণীকে মোকদ্দমায় জয় হইবে বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বিচারশেষে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। বিজয়লাভ করিয়া রাণী স্বামীজীকে দেড় লক্ষ টাকা দিতে চাহেন,—স্বামীজী সে টাকা লইতে অস্বীকার করেন। শেষে রাণী এই টাকায় আনন্দবাগে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। ঐ শিব-মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডের উপর একটী অতিথিশালা নির্ম্মিত হয়। রাণী অতিথিশালার মধ্যে স্বামীজীর মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। একদা মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কাশীধামে

উপস্থিত হ'ন। সাক্ষাতের পর দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিলে, স্বামীজী নিষেধ করেন। এদিকে গুরুতর রাজকার্য্যের অনুরোধে মহারাজের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মহারাজ স্বামীজীকে স্বদেশ গমনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে, স্বামীজী বলিলেন,—"তুমি যদি নিতান্তই যাও—তবে যে গাড়ীতে যাইবার মনস্থ করিয়াছ সে গাড়ীতে যাইও না, পরের গাড়ীতে যাইও।" মহারাজা স্বামীজীর আদেশ পালন করিলেন। কিন্তু ষ্টেসনে গিয়া শুনিলেন—তিনি কাল যে গাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন—সে গাড়ী জোনপুর ষ্টেশনে অন্য একখানি গাড়ীর সহিত সংঘর্ষণে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এই দুর্ঘটনায় বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এতক্ষণে মহারাজ বুঝিতে পারিলেন—স্বামীজী কেন তাঁহাকে সে গাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার ভবানীচরণ দত্তের গলিস্থ ডাক্তার ভাদুড়ী ১৪ বৎসর অম্লশূল রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। স্বামীজী ডাক্তারের যন্ত্রণা দেখিয়া, ডাক্তারের উদরের উপর একবার মাত্র স্বীয় কর সঞ্চালন করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ডাক্তারের সকল কষ্ট দূর হইল। আর একদিনের জন্যও শূল রোগ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এক জমীদার সস্ত্রীক স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা তিনি স্বামীজীকে দেখিবার আশায় আনন্দবাগে উপস্থিত হ'ন—তাঁহার স্ত্রীও সঙ্গে আসেন। জমীদার-পত্নী পূর্ণগর্ভা ছিলেন, আনন্দবাগে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রসববেদনায় কাতর হইয়া পড়েন। বিদেশে পত্নী কোথায় প্রসব হইবেন, ইহা ভাবিয়া জমিদার বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী সমস্ত বুঝিয়া জমীদারকে বলিলেন—"তুমি বাটী ফিরিয়া যাও,—১০ দিন পরে তোমার স্ত্রী প্রসব

হইবে।" স্বামীজীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল—দেশে গিয়া ঠিক্ ১০ দিন পরে জমীদার-পত্নী এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কাশীর মহারাজ ঈশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর স্বামীজীর প্রতি ভক্তিমান হইয়া তদীয় রামনগরের রাজভবনে স্বামীজীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

(৯)

স্বামীজীর যশঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি মহাদেশ হইতে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক এমন কি য়ুরোপের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কত লর্ড লেডি, কাউন্ট ব্যারণ, মার্কুইস, জেনারেল, কর্ণেল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে দেখিতে "আনন্দবাগে" উপস্থিত হইতেন।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সালের ২৫শে আষাঢ় রবিবার মধ্যরাত্রে স্বামীজী সমাধিস্থ হইয়া মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি এ সংবাদ শিষ্যগণের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরম ভক্ত গয়াপ্রসাদ, এলাহাবাদের মহাদেব প্রসাদ, অযোধ্যাধিপতি, কাশীরাজ, নাগোধের অধিপতি যাদবেন্দ্র সিংহ, মৈনপুরের মহারাজ তেজসিংহ এবং আরও অনেক জমীদার, তালুকদার, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি—স্বামীজীকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন।

এখনও স্বামীজী প্রণীত "দশোপনিষদ্" গ্রন্থ—দার্শনিকগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

বদরিকাশ্রমে জীবন্মুক্ত পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মিশ্রলাল তনুত্যাগ করেন। কাশীধামে স্বামীজীর সাধ্বী পত্নীর মৃত্যু হয়।

———

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(১)

শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর পবিত্র বংশে—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে, ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে, মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম হয়, মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। বিজয়কৃষ্ণ পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন।

আনন্দ গোস্বামীর এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন—তাঁহার নাম গোপী-মাধব। বিজয়কৃষ্ণ যখন অত্যন্ত শিশু, তখন আনন্দ গোস্বামীর মৃত্যু হয়। গোপীমাধব বিধবা ভ্রাতৃবধূকে অনেক কষ্টে সম্মত করিয়া বিজয়-কৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন বিজয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজগোপাল জীবিত ছিলেন।

গোপীমাধব ভ্রাতুষ্পুত্রের বাল্যশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে পাঠশালার গুরু মহাশয়ের নিকট বিজয়কৃষ্ণের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিজয়ের ধীশক্তি প্রখরা দেখিয়া, গোপীমাধব বিজয়কে টোলে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অসামান্য প্রতিভাশালী বিজয়-কৃষ্ণ, সকলকে যুগপৎ বিস্মিত ও প্রীত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে সমগ্র ব্যাকরণ-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, গোপী মাধবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রেরিত হইলেন।

এই সময় যোগ্য হস্তের পরিচালনায়—কলিকাতার ভদ্র সম্প্রদায়ের ভিতর ব্রহ্মধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী—একে একে নব সংস্কারপূত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন। সংস্কৃত

কলেজে পড়িতে পড়িতে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বিজয়কৃষ্ণও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁহার ভাল লাগিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভারতের যুগোপযোগী ধর্ম্ম বলিয়া যুবক বিজয়কৃষ্ণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সরল হৃদয়ে জাগ্রত কৌতুকে, আত্মার আকুল তৃষ্ণা শান্তির আশায় প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসভায় যোগদান করিলেন। এই ঘটনার মধ্যে গোপীমাধব লোকান্তরিত হইলেন।

(২)

বিজয়কৃষ্ণের পিতৃ পিতামহগণ গুরু ব্যবসায়ী ছিলেন। অদ্বৈত বংশের গুরু গৌরবে ভুলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত বিজয়কৃষ্ণের পিতা ও জ্যেষ্ঠ তাতের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শিষ্যগণের নিকট হইতে প্রণামী স্বরূপ তাঁহারা অনেক অর্থলাভ করিতেন।

উত্তরাধিকারী সূত্রে বিজয়কৃষ্ণ এই সকল শিষ্য সেবকের ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন—এজন্য শিষ্যগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ব্রজগোপালেরও মৃত্যু হইল। বিজয়কৃষ্ণ বৃহৎ গোস্বামী-পরিবার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

গোস্বামীদের সংসারটী আয়তনে বড় সামান্য ছিল না। নানা সম্পর্কের নরনারী আত্মীয়তার নজির দেখাইয়া বহুদিন হইতেই গোস্বামী পরিবারে আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের অকর্ম্মণ্য অলস জীবন, গোস্বামীদের অন্নে পুরুষানুক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়া, শিষ্যগণ যখন মনক্ষুণ্ণ হইল, কেহ কেহবা অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল,—তখন বিজয়কৃষ্ণের আগের মাতাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বিজয়কৃষ্ণ কি করিবেন? আত্মীয়গণের মধ্যে কাহাকে বিদায় করিবেন? আর বিদায় করিলেইবা

তাঁহারা এমন নিশ্চিন্ত জীবনের সুখের আশ্রয় পরিত্যাগ করিবেন কেন? কাজেই বিজয়কৃষ্ণ এই সুবৃহৎ পরিবারের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া কাতর হইয়া পড়িলেন। কিসে সংসার চলিবে এই চিন্তাই তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনে বিজয়কৃষ্ণের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। বিজয়ের ভবিষ্যৎ আশ্বাসে উজ্জ্বল, তাঁহারা গোস্বামীকে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের পরামর্শ দিলেন। বিজয়ও বুঝিলেন—গুরুগিরি ছাড়িয়া, ডাক্তারী করিতে পারিলে, সমাজ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। সংসারপালনের জন্য অর্থাগমেরও অপ্রতুল হইবে না। বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায় বিজয়কৃষ্ণকে অচিরে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র বলিয়া পরিচিত করিল। বিজয়কৃষ্ণ তিন বৎসর মেডিকেল কলেজে শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা করিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি তাঁহাকে সকলের প্রিয়দর্শন করিয়া তুলিল। সকলেই বলিতে লাগিল—বিজয়কৃষ্ণ দেহতত্ত্ববিদ্ অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইবেন। কিন্তু অদৃষ্টদেবী অন্তরালে বসিয়া বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিড়ম্বনার ক্রূর হাসি হাসিলেন। বিজয়ের আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বে কলেজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার একটু বচসা হইয়াছিল, সেই বচসা ক্রমে ভীষণ মনোবাদের মূর্ত্তি ধারণ করিল। ন্যায়নিষ্ঠ বিজয় আত্মাভিমানের আবেগে কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বিপদে ব্রাহ্মসভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। বঙ্গ, বিহার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ভারতের নানাস্থানে তাঁহার

কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইল। তিনি সাধারণের কাছে ব্রাহ্মধর্ম্মের গূঢ় রহস্য প্রচার করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা করিবার তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা শ্রোতার দেহে তড়িৎ সঞ্চার করিতে পারিত।

(৪)

বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম যাজন করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না, অতৃপ্তধর্ম্ম পিপাসা লইয়া তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এই দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে একদা এক পরমহংসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। পরমহংস বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে—বিজয়কৃষ্ণকে যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সাধু সহবাসের অপূর্ব্ব মহিমায় বিজয়কৃষ্ণের প্রাণের অভাব পূর্ণ হইল। তিনি উপেক্ষিত হিন্দুশাস্ত্রকে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। পূত অঙ্গে পরমহংসের পদধূলি মাখিয়া বিজয়কৃষ্ণ আবার হিন্দুধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইল। শেষে তিনি একজন আদর্শ হিন্দু হইয়া, হিন্দুনরনারীকে যোগশিক্ষায় দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। যে সকল শিষ্য হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আবার তাহারা বিজয়কৃষ্ণের স্নেহের অঙ্কে ফিরিয়া আসিল।

বিজয়কৃষ্ণ ভারতের বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, সাম্যমৈত্রীর লীলাভূমি পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। তখন পুরীর স্বায়ত্বশাসনের কর্ত্তৃপক্ষ বানরহত্যার আজ্ঞা প্রচার করিয়া আপনাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীর হস্তে নিত্য নিত্য অসংখ্য বানর নৃশংস ভাবে হত হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ স্বচক্ষে বানর-হত্যা দেখিতেন, অসহায় পশুগুলির মৃত্যুকালীন আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহার করুণহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া মিউনিসিপালিটীর

কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। পুরীবাসী নরনারী বিজয়কৃষ্ণের করুণার ঘোষণা করিতে লাগিল।

পুরীবাসীর দুঃখদর্শনে বিজয়কৃষ্ণ বিচলিত হইলেন। তিনি দরিদ্রের দুর্দ্দশা মোচনের অভিপ্রায়ে মুক্তহস্তে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিলেন। উড়িষ্যার নরনারী তাঁহাকে কল্পতরু দেখিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা উপহার দিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে সেই করুণার দান গ্রহণ করিল।

বিজয়কৃষ্ণ দেশের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় মহত্বের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। তাঁহার মহান্ উদার প্রাণে, জীবদুঃখের করুণা প্রস্রবন লুক্কায়িত ছিল। চৈতন্যের প্রেমপ্লাবন বিজয়কৃষ্ণের মানব-জীবনকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। লোকহিতৈষণার প্রভাবে তিনি ভারতবাসীর আত্মার অধিক আত্মীয় ছিলেন।

* * * *

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি ৯টার সময় বিজয়কৃষ্ণ পৃথিবীর মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। এখনো অনেক শিষ্য তাঁহাকে দেবতার অবতার ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকে।

রাজা রামমোহন রায়

(১)

জাতীয় জীবনে মহৎ উদ্দীপনা জাগাইবার জন্য—দুর্জ্জয় সংকল্প, অপরিমেয় সাহস ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন; মহত্ব লাভের এই তিনটী উপাদান—রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

হুগলি জেলার, থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধা নগর গ্রামে—১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—রামকান্ত রায়। রায় মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন। সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দেশের সর্ব্বত্রই পারস্য ভাষার আদর ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলকেই পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। রামকান্ত, দ্বাদশবর্ষীয় বালক পুত্র রামমোহনকে পাটনার এক বিখ্যাত মৌলবীর নিকট প্রেরণ করেন। সুশান্ত বুদ্ধি রামমোহন তিন বৎসরের মধ্যে সেই মৌলবীর নিকটে দুরূহ পারস্য ভাষা এবং আরব্য ভাষা শিক্ষা করেন।

তারপর সংস্কৃত শিখিবার জন্য রামমোহনকে কাশীতে পাঠান হয়। সেখানে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

রামমোহনের পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, পিতা বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি

রাজা রামমোহন রায়

দেখিলেন—বেদান্ত ও উপনিষদ্ পড়িয়া রামমোহন একেশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, একেশ্বর বাদ প্রচার করিবার জন্য—রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তিনি যেখানে সেখানে হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন।

রামকান্ত পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক শাসন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে পিতা বিরক্ত হইয়া অবাধ্য পুত্রকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

(২)

তখন ভারতবর্ষে রেল ষ্টীমার হয় নাই, লোকের যাতায়াতের বড়ই কষ্ট ছিল। এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে হইলে যাত্রীকে অনেক সময় দস্যু হস্তে প্রাণ হারাইতে হইত, অথবা বন্য পশুর করাল কবলে আত্ম সমর্পণ করিতে হইত।

গৃহ তাড়িত রামমোহন মাতৃচরণে বিদায় লইয়া শৈশব স্বপ্ন জড়িত সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি উদ্যোগী পুরুষ—পদব্রজে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন দেশের ভাষা, আচার ও রীতি নীতি অবগত হইয়া—দেশের অভাব অভিযোগ বুঝিতে পারিলেন। ভারতের নরনারীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দেশের দুর্গতি বিনাশের জন্য—তিনি স্বার্থ চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। রামমোহন বুঝিলেন—ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি না হইলে ভারতের আর উন্নতির আশা নাই।

রামমোহন প্রথমেই হিন্দুর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলেন। এই বিচার প্রবৃত্তি এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে রামমোহন এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিতেন না। দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া তথাকার পণ্ডিত-

মণ্ডলীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিতেন। ইহাতে সাধারণের ধারণা হইল—রামমোহন হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষ্টা—তাঁহার মত আর্য্য ঋষিদিগের মতের বিরুদ্ধ, সুতরাং রামমোহন হিন্দুর মহাশত্রু!

বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অবগত হইবার জন্য রামমোহন তিব্বত যাত্রা করিলেন। সেখানে ধর্ম্মযাজক লামাগণের সহিত তাঁহার অনেক বাক্-বিতণ্ডা হইল। তিনি লামাগণকে স্পষ্টই বলিলেন—"বৌদ্ধধর্ম্ম কুসংস্কার পূর্ণ"। ইহাতে লামাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামমোহনের প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করিলেন।

এই সময় রামমোহনের বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। তিব্বতের চক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়া রামমোহন অভিমন্যুর মত বিপন্ন! বিদেশে কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? কিন্তু ভারতের উন্নতি ও উত্থানের বীজ যাঁহার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে, ভগবান্ তাঁহার মৃত্যুবাণ রচনায় মহাকালকে ইঙ্গিত করিবেন কেন? তিনি এক অভাবনীয় উপায়ে রামমোহনকে রক্ষা করিলেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—"সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" রামমোহন অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুকুমার দেহে যৌবনের প্রথম উন্মেষ; তিব্বতের রমণীবৃন্দ লালসার দৃষ্টিতে রামমোহনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। রামমোহনের জীবন নাশের ষড়যন্ত্র শুনিয়া—নারীগণ রামমোহনকে লুকাইয়া রাখিল। তারপর ষড়যন্ত্রকারীদের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সরাইয়া দিল। রামমোহন গোপনে পলায়ন করিলেন।

(৩)

রামমোহন দেশে ফিরিলেন। পুত্রকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া রমাকান্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামমোহন আবার জনক-

জননীর স্নেহনীড়ে আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। রামকান্ত যখন দেখিলেন—হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে পুত্রের মত কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তখন তিনি পুত্রকে বাটী হইতে আবার দূর করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রামকান্তের মৃত্যু হয়। রামমোহনের মাতা পুত্রকে আবার বাটীতে আহ্বান করেন; রামমোহন মাতৃ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, মাতার নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় খৃষ্ট ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার জন্য রামমোহনের বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ইংরাজী জানিতেন না; বাইবেল পড়িবার জন্য ২২ বৎসর বয়সে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, ৬ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রঙ্গপুর কলেক্টরের দেওয়ান হন। এই পদে ১৩ বৎসর অধিষ্টিত থাকিয়া রামমোহন লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করেন। কালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেব রামমোহনকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন। সুতরাং অন্যান্য আমলাদের মত রামমোহনকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইত না, অথবা কথায় কথায় মনিবের হুকুম মান্য করিয়া চলিতে হইত না। রামমোহন যথেষ্ট অবকাশ পাইতেন এবং ফরাসী, গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু ভাষার অনুশীলন করিয়া অবকাশকাল যাপন করিতেন।

(৪)

রামমোহনের মাতার নাম তারিণী দেবী। লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া "ফুল ঠাকুরাণী" বলিত। বাস্তবিক, এই ধর্ম্মমতী পতিপ্রাণা সাধ্বী মহিলা—ফুলের মতই পবিত্র ছিলেন।

রামমোহনকে গৃহে স্থান দিয়া তারিণী দেবী বড় বিপদে পড়িলেন। রামমোহন হিন্দুধর্ম্মের উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছিলেন;—

লোকে তারিণী দেবীর কাছে ক্রমাগত অনুযোগ করিতে লাগিল। একদিকে স্নেহের নিধি—পুত্র, অপর দিকে—ধরণীর প্রধান অবলম্বন—সমাজ। তারিণী দেবী সমাজকেই বড় ভাবিলেন। কর্ত্তব্যের কাছে পুত্রস্নেহও তিষ্ঠিতে পারিল না। তারিণী দেবী—পুত্রকে বলিলেন—"এবাটীতে তোমার আর থাকা হইবে না, তুমি হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতেছ—লোকের কাছে আমি মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। আমি সমাজ ছাড়িতে পারিব না। অতএব আমার অনুরোধ—তুমি রঘুনাথপুরে নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া সেই বাটীতে অবস্থিতি কর।"

রামমোহন মাতৃ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু গ্রামে অধিক দিন থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। শীঘ্রই তিনি জনকোলাহলময়ী কলিকাতা নগরীকে আপনার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন ধর্ম্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন। সংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচার তর্ক করিয়া, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল। হিন্দুসমাজ বাতাহত কদলী কাণ্ডের মত কাঁপিতে লাগিল। ধর্ম্মনাশের ভয়ে—অনেকেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শুধু হিন্দুধর্ম্মের উপর নহে,—খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধেও রামমোহন দণ্ডায়মান হইলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে যীশুখৃষ্টের উপদেশাবলী সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় অনুদিত করিয়া রামমোহন পাদরীগণের সম্মুখে—সগর্ব্বে প্রকাশ করিতে লাগিলেন—"যীশু কেবল ধর্ম্ম প্রচারক মাত্র, তিনি লোক শিক্ষক—তাঁহাতে কোন দেবত্ব ছিল না।"

তখন শ্রীরামপুরে পাদ্রিগণের অত্যন্ত প্রভাব। তাঁহারা সদলবলে আসরে নামিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ঘোষণা করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে—রামমোহনের সঙ্গে তাঁহাদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এ যুদ্ধে যদিও এক বিন্দু শোণিতপাত হইল না—কিন্তু উভয়পক্ষে—অনেক

কাগজ, কলম ও কালী ব্যয় হইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই প্রবন্ধ লিখিয়া উভয় পক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পাদ্রিগণের ভ্রম প্রদর্শনের জন্য রামমোহন স্বতন্ত্র একখানি পত্রিকা বাহির করিলেন। রামমোহন ঘোষণা করিলেন--"পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা—এই ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানেরা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব—এই ত্রিত্ববাদী হিন্দুদের মতই পৌত্তলিক।" রামমোহনের তীব্র ভাষায় পাদ্রী সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল।

এই তর্ক যুদ্ধের ফলে—এডাম্ নামক জনৈক পাদ্রী রামমোহনের মত গ্রহণ করিয়া "একেশ্বর বাদী" হইয়া পড়িলেন।

(৫)

রামমোহনের মতের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া অনেকেই তাহা গ্রহণ করিল। রামমোহন সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—প্রকৃত হিন্দুরা একেশ্বর বাদী, তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। বেদান্ত এবং উপনিষদই প্রকৃত হিন্দু শাস্ত্র।

ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে—রামমোহন আর একটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহা—সতী দাহ নিবারণ। স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় আরোহণ করা, সেকালের হিন্দু রমণীগণের বাঞ্ছনীয় ছিল। বৈধব্য-অনলে চিরকাল দগ্ধ হওয়ার চেয়ে স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মরা ভাল—সাধ্বীগণের ইহাই ধারণা ছিল। অনেক নারীই হাস্যমুখে পতির অনুগমন করিতেন। কিন্তু চিতার অগ্নি অনেকের পক্ষেই আবার সুখস্পর্শ শীতল বলিয়া মনে হইত না। সেই সকল নারীগণ—পুড়িয়া মরিতে ভয় পাইত। কেহ কেহ বা শিশু পুত্রকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে, এই ভয়ে—চিতারোহণে ইতস্ততঃ করিত। অনুগমনে যাহাদের ইচ্ছা থাকিত না, সমাজ তাহাদিগকে জোর করিয়া জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিত। পাছে অভাগিনীদের কাতরোক্তি শুনিয়া লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয়, সেই জন্য—বিধবার চিতারোহণ কালে—ঢাক ঢোল বাজাইবার ব্যবস্থা ছিল।

রামমোহন এই সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রবন্ধের দিকে—বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া, ভারতে এই সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়। ১৮২৯ খৃঃ ৪ঠা ডিসেম্বর—সতীদাহ নিষেধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

(৬)

ইংরাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি জানিবার জন্য, অনেক দিন হইতেই রামমোহনের বিলাত যাত্রার ইচ্ছা ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

বিলাসিতা ও অত্যাচারের ক্রীড়াভূমি—দিল্লী নগরী যখন নষ্ট গৌরব হারাইয়া মুসলমানের কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, পদচ্যুত সম্রাট্ তখন ইংরাজের করুণাদৃষ্টির পানে তাপদগ্ধ চাতকের মত চাহিয়াছিলেন। সম্রাটের কোন কোন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সম্রাটের অনুরোধে—এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র লইয়া ১৫ই নবেম্বর তারিখে—পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়—এবং রাম হরির সঙ্গে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। এই সময় দিল্লীর পদচ্যুত সম্রাটই রামমোহনকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

রামমোহন—অনেকগুলি উপনিষদ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সেই সকল অনুবাদ পড়িয়া বিলাতের অনেক সাহেবই রামমোহনের—প্রতিভার সমুচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। য়ুরোপের অনেকের কাছেই রামমোহনের নাম—সম্মানের সহিত পরিচিত ছিল। সুতরাং শ্বেতদ্বীপের পবিত্র মৃত্তিকায় রামমোহন পদার্পণ করিবা মাত্র বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—তাঁহাকে সমাদরের সহিত
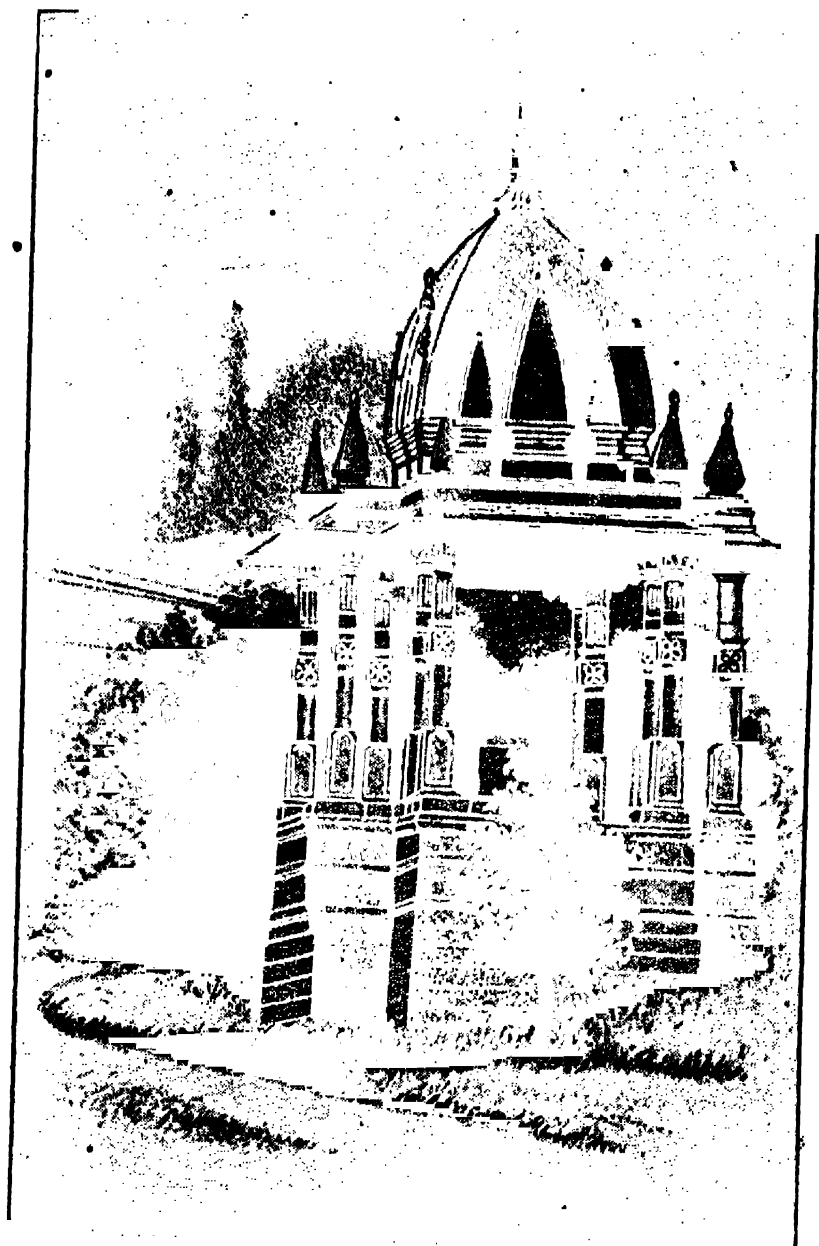
রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি (ব্রিষ্টলে)

অভ্যর্থনা করেন। বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্টের সাহায্যে রামমোহন রাজসরকারে পরিচিত হন। ইংলণ্ডে—রাজদূতগণের আসনের সঙ্গে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রামমোহনের সম্মানার্থ—বিলাতে এক মহাভোজের আয়োজন হয়। ভারতবর্ষে—বিচার ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাচিত হয়—এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবার জন্য রামমোহন পার্লামেণ্টে আহূত হন। ভারতবর্ষ হইতে—সতীদাহ আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে যে আপীল হইয়াছিল, সেই আপীল শুনানির দিন হাউস অফ কমন্স—রামমোহনকে আহ্বান করিয়াছিলেন। রামমোহন ও আপীলের বিরুদ্ধে একখানি দরখাস্ত দাখিল করেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ফ্রান্স যাত্রা করেন। ফরাসী রাজ ফিলিপ রামমোহনের সঙ্গে একত্র আহার করিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। সেপ্টেম্বর মাসে—কার্পেণ্টরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ব্রিষ্টলে গমন করেন। কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, সেপ্টেম্বরের ১০ই তারিখে রামমোহন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। বহু সুবিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাতেও সে জ্বর ভাল হইল না। সকলকার প্রাণপণ শুশ্রূষা নিষ্ফল করিয়া, জ্বরাসুর রামমোহনের আত্মাকে মহাকালে বিলীন করিয়া দিল। বিলাতের অনেক বড়লোক সম্মানের সহিত রাজার শবদেহ সমাহিত করেন।

১০ বৎসর পরে রাজার দেহাবশেষ উত্তোলিত করিয়া, ব্রিষ্টল নগরে নীত ও সমাহিত করা হয়। এই সমাধির উপর ৺ দ্বারকা নাথ ঠাকুর একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

রাজা রামমোহন—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক। ইংরাজী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে—[শকাব্দা ১৭৫১, ১১ই মাঘ] চিৎপুর রোডের পার্শ্বে রাজা

প্রথম ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করেন। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ—ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া থাকে।

রাজা রামমোহনের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে, তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। সত্য সত্যই—ধর্ম্মজগতে রাজা রামমোহন একজন মহাপুরুষ ছিলেন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে আর একবার ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। ঐতিহাসিক মাত্রেই সে তত্ত্ব অবগত আছেন। এই বিপ্লবের শেষভাগে—ভারতের অলীক কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া বিপন্ন আর্য্যধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য,—এই অবতার বাঙ্গালীর দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতের ভাগ্যদেবতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। রামমোহনের অতুলনীয় প্রতিভা সে সময় অত্যাচারপীড়িত ভারতে "একেশ্বরবাদকে" নূতন আকার প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সে বিরাট সাধনায় রামমোহন সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তাঁহার মহত্ত্বের সমাদরও করে নাই। দেশবাসীর অবহেলায় "মহাপুরুষ" সপ্ত সমুদ্রের পারে গিয়া নির্ব্বাসিত অপরাধীর মত নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

যে ভারতে ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া রামমোহনের মত ধর্ম্মবীরকেও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, সেই ভারতে ঈশ্বর প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব! রামমোহনের অনুষ্ঠিত মৃতপ্রায় সত্যকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্ম। তখন বহু কুসংস্কার, বহু অত্যাচার ধর্ম্মের নামধারণ করিয়া ভারতকে ব্যথিত ও মথিত করিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া খৃষ্টিয়ান পাদ্রীগণ আর্য্যধর্ম্মের উপর কলঙ্ক আরোপ করিতেছিলেন; "ডিরোজী" নামক জনৈক নাস্তিক সাহেবের শিষ্যগণ গুরুর প্ররোচনায় দেশীয় আচার পদদলিত করিয়া স্বাধীন প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছিলেন; সুরা রাক্ষসীর তাণ্ডবনৃত্যে

মহানগরী কম্পিত হইতেছিল, যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বাধীনচেতা, তাঁহারা দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া য়ুরোপের আচার ব্যবহারের যশঃকীর্ত্তন করিতেছিলেন। ভারতের এই বিপদের সময় শুভক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কৃতীত্ব ভারতের উপধর্ম্ম ও বিপ্লব দূরীভূত করিয়া, জগতে আর্য্য আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছিল।

(২)

এই বিলাস-কলুষিত কলিযুগে ধার্ম্মিকগণের চরিতাভিধানের প্রথম স্থান যদি কাহারও প্রাপ্য থাকে—তাহা দেবেন্দ্রনাথের। তিনি ছিলেন ধর্ম্মজগতের নিভৃত সাধক, কর্ম্ম জগতের অনাড়ম্বর কর্ম্মী। চরম নিপুণতার সহিত তাঁহার চরিত্রের সকল দিক ফুটাইয়া তুলিতে পারি, আমাদের সে শক্তি নাই। আমরা কেবল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। সেই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই পাঠক! বুঝিতে পারিবেন—এই পরিবর্ত্তন সমাকুল লোকারণ্যের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তুঙ্গ শৃঙ্গ মহীরুহের মত চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিবেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—১৭৩৯ শকের [১৮১৭ খৃঃ] ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা নগরীতে ভূমিষ্ঠ হ'ন। তিনি স্বনামধন্য মহাত্মা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথম সন্তান।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন যে সময় বিলাত যাত্রা করেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন বালকমাত্র। রামমোহনের বিদ্যালয়ে, দেবেন্দ্রনাথ তখন ছাত্র; কিন্তু এই অদ্বিতীয় মণীষাসম্পন্ন বালকের প্রতিভাদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া, রামমোহন তাঁহার বন্ধুগণকে বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে বলিয়া গিয়াছিলেন—"এই শিশুই আমার গদি অধিকার করিবে।" যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের জীবন চরিতের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সহিতও

পরিচিত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন—রাজা রামমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফল হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে নিত্য শালগ্রামের সেবা হইত, প্রতি বৎসর দুর্গা পূজার উৎসব হইত। ইহাতে বালক দেবেন্দ্রনাথ বড় আনন্দিত হইতেন। অতি শৈশবেই বালকের সরল মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা। সমস্ত ঠাকুরই সেই ঈশ্বর। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে দেবেন্দ্রনাথ প্রণাম করিতেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর চাহিতেন।

অল্প বয়সেই দ্বারকানাথ পুত্রের উপনয়ন দিয়াছিলেন। উপনয়নের পর হইতেই বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া উঠে; ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠেন। একদা ভ্রমণকালে সহসা আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। আকাশের সুনীল সৌন্দর্য্যের অনন্ত বিকাশ দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্রনাথের মনে হইল—এই যে কৌমুদীসুন্দর শশধর, এই যে অগণিত তারকাবলী, ইহাদের স্রষ্টা কে? আমাদের বাটীর শালগ্রাম কি মা দুর্গা, কিম্বা ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী ইহারাই কি চন্দ্র তারকার সৃষ্টি করিয়াছেন? এইবার দেবেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ধারণা হইল—শালগ্রাম ও দুর্গা, ইহারা প্রস্তর ও মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, ইহারা কখনও স্রষ্টা হইতে পারেন না, অতএব এ জগতের একজন প্রকৃত স্রষ্টা আছেন, তিনিই অনন্ত শক্তিশালী—ঈশ্বর।

সেই হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(৩)

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, দেবেন্দ্রনাথ শবের অনুগমন করেন। শ্মশানের উদাসীন চিত্র তাঁহার নয়ন-

সম্মুখে সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মরণোৎসবের মাঝখানে কে যেন তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাব জাগাইয়া তুলিল। সংসারের নশ্বরতায় দেবেন্দ্রনাথ ব্যথিত হইয়া পড়িলেন।

রাজা রামমোহনের বিলাতযাত্রার পর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদগ্রহণ করেন। তৎকালে পণ্ডিত বলিয়া বিদ্যা-বাগীশের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ধর্ম্মপিপাসু দেবেন্দ্রনাথ, প্রথম যৌবনের কামনার অঙ্কুর পদদলিত করিয়া, সমস্ত সাংসারিক প্রলোভনের হাত এড়াইয়া, বিদ্যাবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাবাগীশও দেবেন্দ্র নাথকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

বিদ্যাবাগীশের কাছে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। রামমোহনের "একেশ্বরবাদ"—দেবেন্দ্রনাথের নির্ম্মল হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিল। ভগবানের অনুপ্রেরণাশক্তি সংসারের স্বার্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথকে পৃথক্ করিয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বুঝিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যে আর্য্যধর্ম্ম বড় বিপন্ন, হিন্দুসন্তান খ্রীষ্টান পাদ্রীর বক্তৃতায় বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিতেছিল। ভারতের সেই অতি বড় দুঃসময়ে পদস্খলিত ভারতবাসীকে পৈতৃক গৌরব বুঝাইয়া, দেবেন্দ্র নাথ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত পাঞ্চজন্য শঙ্খে ফুৎকার প্রদান করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতবাসীর নৈতিক জীবন গঠিত হইল। লোক-লোচনের সমক্ষে মহর্ষির অলৌকিকত্ব প্রচার হইয়া পড়িল। ভারত তাঁহাকে "মহর্ষি" আখ্যা প্রদান করিল।

"ঋষি শব্দের অর্থ—মন্ত্র দ্রষ্টা। বেদমন্ত্র ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত হইয়া যাঁহাদের হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছিল, তাঁহারাই ঋষি। মন্ত্রের অন্তর্ভূত সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন ঋষিত্বের একমাত্র নিদান। এই অর্থ দেবেন্দ্র

নাথের মহর্ষি আখ্যা সার্থক হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন।

স্বলিখিত 'আত্মজীবন চরিতের' দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—"আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম—কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব? এই স্পৃহা আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদয় কামনা পরিতৃপ্ত হইল; এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। আমি এতোটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম—জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়মন্দিরের দেবতা হইলেন; যাহা কখনও আশা করি নাই তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফললাভ করিলাম; পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম।"

এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই তাঁহাকে নূতনভাবে গঠন করিয়া নূতন শক্তি দিয়াছিল।

(৪)

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য মহর্ষি "তত্ত্ব-বোধিনী" সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এই সভা তাঁহার নিজ বাটীর এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই আহূত হইত। সভার তখন মাত্র ১০ জন সভ্য ছিলেন, এবং তাঁহারা নিজ আয়ের প্রত্যেক টাকা হইতে তিন পয়সা চাঁদা দিতেন, তাহাতেই সভার খরচ চলিত। অল্পদিনের মধ্যেই

মহর্ষির উদারতায় মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গভাষার অন্যতম অধিনায়ক অক্ষয়চন্দ্র দত্ত এই সভার সভ্য হ'ন।

১৭৬৩ শকে "তত্ত্ববোধিনী" সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হয়। এই সম্মিলিত সভা ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য ১৭৬৫ শকে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রচার করেন। এই সময় ডফ্ সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ছলে হিন্দুধর্ম্মের অনর্গল নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মহর্ষি, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া, প্রবন্ধ লিখাইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা করেন। মহর্ষির চেষ্টায় ডফের সকল যুক্তিতর্ক ভাগিয়া যায়। শিক্ষিত যুবকদল খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া মহর্ষির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

লোকে তখন বিস্মিত হইল, দেখিল—আবর্ত্তময় ভীষণ তরঙ্গ বাণের প্রভাবে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। মহর্ষির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া রাজা রাধাকান্ত দেব দশের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন—

"দেবেন্দ্রনাথই জাতীয় ধর্ম্মের রক্ষক।"

১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্র মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের "প্রধান আচার্য্যের" পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। পৌত্তলিক রীতি নীতির কোন অনুষ্ঠান না করিয়া দেবেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মমতে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

(৫)

মহর্ষির বিশেষত্ব তাঁহার মনে কখনও হিংসা ছিল না। তাঁহার হৃদয়টী ছিল শরতের শুভ্র শিশির কণার মত। তর্কের সময়েও তাঁহার মুখ দিয়া কখনও কঠোর কথা বাহির হয় নাই। আত্মহারা হইয়া অতি বড় মহাশত্রুকেও তিনি প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিতেন।

ধনসম্পদের মধ্যে জন্মিয়াও তাঁহার গতি হইয়াছিল বিষয় বিরাগের দিকে। দুস্তর মহাসাগরে নাবিক যেমন ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

অভীষ্টপথে অগ্রসর হয়, দেবেন্দ্রনাথ তেমনি ধ্রুবতারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসারসমুদ্রে জীবনতরণী চালাইয়া গিয়াছেন। তিনি সংসারে বাস করিতেন পদ্মপত্রস্থিত বারির মত নির্লিপ্ত হইয়া। রাশি রাশি ঐশ্বর্য্য, চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই।

সংসারের গোলমাল হইতে দূরে থাকিবার জন্য ১৭৭৭ শকে তিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন এবং সেখানে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন; কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের আন্দোলন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আবার তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়।

তাঁহার অনুপস্থিতি এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত মতানৈক্য হওয়ায়—নব্য সম্প্রদায় দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহারি ফলে—কেশব বাবুর নব বিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা।

জীবনের শেষভাগে—মহর্ষি বীরভূম জেলায় বোলপুর নামক স্থানে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করেন এবং আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তিও দান করেন। ১৮০৯ শকের ফাল্গুন মাসে এই আশ্রম সাধারণের ব্যবহারার্থ অর্পিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ৭ই পৌষ তারিখে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই দীক্ষা দিবসের স্মৃতি রক্ষার্থ প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ বোলপুর আশ্রমে উৎসব হইয়া থাকে।

দেবেন্দ্রনাথ—যেমন ধার্ম্মিকের চূড়ামণি ছিলেন তেমনি পণ্ডিতেরও শিরোমণি ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "আত্মতত্ত্ব বিদ্যা," "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস," "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি," "পরলোক ও মুক্তি" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি—সরল উপদেশে পূর্ণ। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল, গীতা উপনিষদ ও হাফেজের কবিতা—আগাগোড়া তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উপাসনায় মগ্ন থাকিতেন, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে নীরবে

ধ্যান মগ্ন থাকিতে দেখা যাইত। মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর "ডিসট্রিক্ট চেরি-টেবল সোসাইটীতে" লক্ষমুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু ইহার সাক্ষী ছিল না, পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ—সোসাইটীর জন্য লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

বঙ্গাব্দ—১৩১১ সালের ৬ই মাঘ—মহর্ষি পরলোক গমন করেন। ইহার আট পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে—রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাঁহার চরিত্রের মৌলিকতা জানিতে হইলে—তদীয় আত্ম জীবন পাঠ করা উচিত। বঙ্গভাষায় উহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

কেশবচন্দ্র সেন

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

(১)

২৪ পরগণা জেলায় "গরিফা" একখানি গণ্ডগ্রাম। এখন যেমন গরিফা জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ছিল না। অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য, লাবণ্য, কর্ম্মক্ষমতা, প্রসন্নতা এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রকাশ।—এই মানচিত্রে নগণ্য গরিফাকে একদিন মহানগরীর সমৃদ্ধি দান করিয়াছিল। গরিফায় গমন করিলে, এখন আর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম রেখাপাতও দৃষ্টিগোচর হয় না, সে শোভন লালিত্য এখন কালের কুক্ষিগত হইয়াছে।

যে সকল মহাত্মা "মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বলকারী" বলিয়া নব্যবঙ্গের ইতিহাসে সম্মানের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এই গরিফা গ্রাম তাঁহাদের অনেকের জন্মভূমি। স্বর্গীয় রামকমল সেন, এই গরিফার এক বৈদ্য-বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চাকুরীর খাতিরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রাম-কমল কলিকাতা প্রবাসী হ'ন।

রামকমলের চারিপুত্র—হরিমোহন, প্যারিমোহন, বংশীধর ও মুরলী-ধর। হরিমোহন জয়পুরাধিপতির প্রধান সচিব ছিলেন। প্যারীমোহন টাকশালের দেওয়ানী করিতেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই প্যারী-মোহনের দ্বিতীয় পুত্র।

রামকমল সেন কলিকাতার কলুটোলায় নিজের বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কলুটোলাস্থিত ভবনে, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়।

প্যারীমোহনের স্বভাব নম্রমধুর আবেগে পূর্ণ ছিল। তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি শত্রুর মনেও ভক্তির উদ্রেক করিত। তিনি সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিতেন, বিষ্ণুপূজা না করিয়া জলগ্রহণও করিতেন না। পিতার অণুকরণ করিয়া কেশবচন্দ্রও শিশুকাল হইতে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কেশবের বয়স যখন ৬ বৎসর, তখন রামকমলের মৃত্যু হয়। কেশবের বয়স যখন ১১ বৎসর, তখন প্যারীমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন।

(২)

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বর্ষীয় বালক কেশবকে তদীয় অভিভাবকগণ হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তিনি বড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—কোনও কারণে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহাকে পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পরই তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিই তাঁহার ভবিষ্য জীবনকে গৌরব মণ্ডিত করিয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে—বিখ্যাত পাদ্রী "লং" সাহেবের সঙ্গে কেশবের আলাপ হয়। পাদ্রীর সহিত মিলিত হইয়া কেশব একটী সভা স্থাপন করেন। ঐ সভার নাম—"ব্রিটীস ইণ্ডিয়া সোসাইটী"। সভা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নিজ বাটীতে একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যেই—কেশব যোগদান করিতেন। এই সূত্রে—মহর্ষি দবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবের পরিচয় হয়। মহর্ষি—তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, কেশব ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হ'ন। বলা বাহুল্য এই সময় হইতে উভয়েই একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মহর্ষির সহিত পরামর্শ করিয়া কেশবচন্দ্র "ব্রাহ্ম বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষা ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রগণকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া।

(৩)

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০৲ বেতনের একটী কাজ খালি ছিল; অভিভাবকগণের একান্ত অনুরোধে কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন।

এই শুভ মুহূর্ত্তে ভারতের নরনারীকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কেশব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। প্রথম যৌবনেই অত্যন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতিধ্বনি তাঁহার বেদনাময় বক্ষে আপনার অস্তিত্ব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কেশবচন্দ্র আপনার আনন্দের বেগে আপনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুযোগ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল—স্বাধীন বুদ্ধি সূক্ষ্ম বিচার, বিনয় শ্রদ্ধা ও পর্য্যবেক্ষণ; কেশবের উপর ভগবানের করুণা-দৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে লাগিল। সে বক্তৃতা শুনিবার জন্য নরনারী ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কেশবের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কেশবকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বরণ করিলেন। মহর্ষির উদার উন্মুক্ত করুণার ধারায় অভিষিক্ত হইয়া এই সময় কেশবচন্দ্র বোম্বে ও মান্দ্রাজ প্রদেশে গমন করেন এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসী-গণকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মহত্তর আত্মার গভীর-

ভর সত্য প্রেরণা ছিল, লোকে দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কেশবের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেশবচন্দ্র দ্বিগুণ উৎসাহে ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, পূর্ব্বে যে সকল আচার্য্য ও উপাচার্য্য ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন, হিমালয়-ভাগীরথির মত তাঁহাদের বক্ষে উপবীত লম্বিত থাকিত। কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন—"এবার হইতে আচার্য্য ও উপাচার্য্যগণকে উপবীত ত্যাগ করিতে হইবে।" মহর্ষি, কেশবচন্দ্রের কথার মর্ম্ম বুঝিলেন। উপবীত থাকিলে মনে জাতীয় অহঙ্কার থাকে। কেশব যে'দিন উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব করিলেন, মহর্ষি সেইদিন হইতেই উপবীত গ্রহণ নিষেধ করিয়া দিলেন। শুধু নিষেধ নহে, মহর্ষি দুইজন উপবীতত্যাগীকে উপাচার্য্যপদে নিযুক্ত করিলেন।

(৪)

দেশবাসীর সান্দগ্ধমনে বাস্তবানুভূতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য কেশবচন্দ্র প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার উত্তর সাধক হইলেন—স্বনামধন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য, কেশবচন্দ্র ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কেশবের মুখে ভারতের নরনারী মিলনের মহামন্ত্র শুনিতে পাইল। পূর্ণ যুগচক্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইয়া আপামর সাধারণকে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় দীপ্তিত করিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণকে একপ্রাণ ও সমস্ত চৈতন্যকে এক অখণ্ড চৈতন্যরূপে পরিণত করিবার জন্য কেশব জাতিভেদের মুখে কঠোর আঘাত করিলেন।

কেশবচন্দ্র জগতের দৃঢ় মায়াবরণ ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যে নির্ম্মল সত্যের আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই সত্যের

আলোকে সকলেই টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার সাব্যস্ত হইল। অবরোধ প্রথার মূল অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িল।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে ব্রাহ্ম সমাজের যে উৎসব হয়, সেই উৎসব দেখিবার জন্য চিরাবগুণ্ঠিতা রমণীগণ ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইলেন। স্ত্রী, পুরুষ একত্র বসিয়া উপাসনা করিতে লাগিল। সমাজে ধর্ম্মবিপ্লবের কম্পন উপস্থিত হইল। শত্রুপক্ষ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু কেশব কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তদুপলক্ষে কলিকাতায় এক মহা নগরসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইল। কেশবের ব্রাহ্ম শিষ্যগণ দলে দলে পথে বাহির হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাইক জাতবিচার।"

(৫)

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা—আলো অন্ধকারের সন্ধি স্থানে অরুণোদয়ের গান! তাঁহার উপাসনা—জীবাত্মার পরমাত্মার বিচ্ছেদ হীন মহামিলন! শুধু ভারতবর্ষ কেন, সুদূর সাগর পারের লোকও কেশবের বাগ্মীতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—বিলাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কেশব বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। ৬।৭ মাস সেখানে থাকিয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও কেশবকে সম্মান প্রদর্শন করেন। মহারাণী কেশবের সঙ্গে এক টেবিলে ভোজন করিয়া প্রজাপ্রীতির উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন!

কেশবচন্দ্রের আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মবিবাহ সংক্রান্ত একটী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ আইনও আইন নামে খ্যাত হয়।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়ায় কেশবের সহিত ব্রাহ্মসমাজের এক বিরোধ হয়। কেশবচন্দ্র পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া বাসের জন্য একটা নূতন বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম রাখিলেন—"কমলকুটির।"

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজার সঙ্গে কেশবের অপ্রাপ্তবয়স্কা একটী কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের তিনটী যুক্তি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম বিরোধী ছিল। (১ম) কেশব জাতিচ্যুত, সুতরাং কন্যাকর্ত্তার কাজ করিতে পারিবেন না। (২য়) এই বিবাহে কোচবিহারের রাজ-পুরোহিতগণই পৌরহিত্য করিবেন। (৩য়) এই বিবাহে ব্রাহ্ম উপাসনা চলিবে না। কিন্তু কেশবচন্দ্র কোনও বাধাই মানিতে চাহেন নাই, ব্রাহ্মগণের সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বয়ং কুচবিহারে গিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের বহু সভ্যই কেশবের উপর বিরক্ত হ'ন এবং কেশবকে আচার্য্য পদ হইতে অপসৃত করিবার চেষ্টা করেন। অধিকাংশ সভ্যই কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন করেন। ঐ ব্রাহ্মসমাজই "সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ" নামে পরিচিত। কেশবচন্দ্রও কতকগুলি বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন সাধন ভজন লক্ষণাক্রান্ত নববিধান সমাজ স্থাপন করেন। এই নূতন প্রতিষ্ঠিত সমাজের উন্নতি কল্পে ১৮৭৮ খৃঃ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়—তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত রোগে অশেষ কষ্টভোগ করিয়া কেশবচন্দ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

কেশবচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের গৌরবকাহিনী, "জীবন-চিত্রের" দুই চারি পৃষ্ঠায় লিখিত হইবার নহে, নব্য বঙ্গের ইতিহাসে ব্রাহ্ম প্রচারের সঙ্গে, তাহা চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

———

কলী পাবন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

(১)

যে মহাত্মার স্মৃতি চর্চ্চার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা—তিনি অজ্ঞেয়, অত্যদ্ভুত, অশেষ লীলাময়। তাঁহার জীবনের কথা, অনেক দিনের পুরাতন কথা, হয়তো আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই জানা কথা; কিন্তু মনুষ্যত্বের পূজা পুরাতন হইয়াও চির নূতন, তাই অকিঞ্চন হইয়াও ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনী পাঠকগণকে আমরা উপহার দিতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত অদ্ভূত ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরম হংস রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অন্যতম।

হুগলী জেলার কামার পুকুর গ্রামে—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক যোগবল সম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ক্ষুদিরামের ঔরসে, ১৭৫৬ [ইং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে] ১০ই ফাল্গুণ বুধবার শুক্ল দ্বিতীয়ার পবিত্র প্রভাতে—ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। রামকুমার ও রামেশ্বর নামে—তাঁহার আর দুই সহোদর ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামকুমার সর্ব্বশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া কলিকাতার একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছিলেন। ঝামাপুকুর নামক স্থানে এই চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রামকৃষ্ণ বাল্যকালে লেখাপড়া শিখেন নাই,—লেখা পড়ায় তাঁহার আস্থাও ছিল না। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই, প্রকট রাজ্যের রহস্য বুঝিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত বালক রামকৃষ্ণ অপ্রকট রাজ্যের অতীন্দ্রিয় শোভার কাছে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কামার পুকুর গ্রাম—তখন দ্বাপরের বৃন্দাবন,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

শৈশব সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে গিয়া রামকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলার অভিনয় করিতেন। বালকগণের মধ্যে কেহ শ্রীদাম, কেহ সুবল, কেহ বা সুদাম সাজিত,—রামকৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণ সাজিতেন। পথিকেরা ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইত।

রামকৃষ্ণের বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, তখন তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হয়। উপনয়নের পর ক্ষুদিরাম পুত্রকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় একটী টোল খুলিয়াছিলেন। এই টোলে রামকৃষ্ণের শিক্ষা আরম্ভ হইল। কিন্তু পড়াশুনা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। বেদান্তের মায়া, ব্রহ্ম, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনিয়া—রামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—টোলের বিদ্যার পরিণাম—কেবল আতপ তণ্ডুল কাঁচকলা ও কয়েক খণ্ড রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহ মাত্র! রামকৃষ্ণ তাঁহার অগ্রজকে স্পষ্টই বলিলেন—তিনি পণ্ডিত বলিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অনিচ্ছুক।

(২)

চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কার্য্য ব্যতীত, রামকুমার আর একটী কার্য্য করিতেন। লোক প্রসিদ্ধা রাণী রাসমণি সহরের ক্রোশত্রয় উত্তরে অবস্থিত "দক্ষিণেশ্বর" নামক স্থানে—প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া, শুদ্রের নামে "কালিকা দেবী" ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন, রামকুমার রাণী প্রতিষ্ঠিত এই দেব মন্দিরের পৌরহিত্যে নিযুক্ত হ'ন। জ্যেষ্ঠের সহিত রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। জ্যেষ্ঠের কাজ থাকিলে রামকৃষ্ণকে বিগ্রহের পূজা করিতে হইত।

এক সময় রাম কুমার পীড়িত হইয়া পড়েন, এই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হয়। রাণী—রামকৃষ্ণের উপরই বিগ্রহ পূজার ভারার্পণ

করেন। সেই অবধি পূজারীরূপে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ—শুধু ফুল বিল্বদল দিয়াই দেবতার পূজা করিতেন না, কালীর প্রতিমাকে তিনি নিজের জননী জ্ঞানে পূজা করিতেন, শিশুর মত মায়ের কাছে আবদার করিতেন। লোকে দেখিত—পূজারী ঠাকুর আত্ম বিহ্বল হইয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে "মা! মা!" বলিয়া রোদন করিতেছেন;—যাহারা মানুষ তাহারা বুঝিত—"এ রোদন' সংসার ত্যাগীর শেষ মায়ার রোদন।" আর যাহারা হৃদয় হীন, তাহারা রামকৃষ্ণকে "পাগল" নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করিত! হায়, তখন কেহই জানিত না—বামুন ঠাকুরের মহজ্জীবনের নির্লিপ্ত বৈরাগ্য একদিন বিশ্ব জগৎকে আশার তূর্য্যধ্বনি শুনাইবে।

দেব পূজায় রামকৃষ্ণের এই ঐকান্তিকী ব্যাকুলতায়, যখন স্বার্থপর সংসার তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিল—সেই সময় এই নবীন সাধক আপনাকে একান্তে মানব চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন।

ঠিক্ এই সময়েই—ক্ষুদিরাম ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। উদাসীনকে সংসারে বাঁধিবার প্রধান রজ্জু—রমণী। রামকৃষ্ণের অভিভাবকগণ আর সময় নষ্ট করিতে চাহিলেন না। শীঘ্রই, জয়রাম বাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সারদা দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল।

(৩)

আজন্ম বৈরাগী রামকৃষ্ণ—বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিলেন না, কেবল অভিভাবকদের মতানুবর্ত্তী হইয়াই বিবাহ করিলেন। প্রেম মানুষকে নবীন করে, কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবনে পত্নী প্রেম কোনও তরুণতা আনিতে

পারিল না নব দম্পতীর এ মিলনে প্রণয়ের তেমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস ও দেখা গেল না।

বিবাহের পর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার উন্মত্ততা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করিতেন—"মা! একবার দয়া ক'রে দেখা দে।" তাঁহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া গগন স্পর্শ করিত। রজনী শেষে যখন প্রাভাতিক শঙ্খ বাজিয়া উঠিত, তখনও দেখা যাইত রামকৃষ্ণ মঙ্গলারতি না করিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইত। কিন্তু সন্তানের রোদন মা ভিন্ন কেহ কি নিবারণ করিতে পারে? যাহারা কামনার দাস—তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে যে একটী ব্যাকুল আত্মা কি পিপাসায় অধীর হইয়া নিজ উপাস্যের কাছে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেছে। যাহারা রামকৃষ্ণকে কাঁদিতে দেখিত, তাহারা কানাকাণি করিত—"এব্যক্তি পাগল হইয়াছে।" আবার কেহ বা বলিতে লাগিল—"এ এক রকম রোগ, ইহার চিকিৎসা করান উচিত।" ইহাদের মতানুসারে—কিছুদিন ধরিয়া রামকৃষ্ণের চিকিৎসাও চলিল, কিন্তু সে অদ্ভুত রোগের কোনও প্রতীকার হইল না। দাশরথি বলিয়া গিয়াছেন—"হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য কি তার জানে বিধি?" রুক্ প্রতিক্রিয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চিকিৎসকগণের অজ্ঞতার অহঙ্কার ঘুচিয়া গেল। অভিভাবকগণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবোন্মত্ত ঠাকুর—জগজ্জননীর দেখা না পাইয়া আত্ম হত্যার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় অনেকক্ষণ তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতেন। ছয় মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়াছিল। তা'রপর একদিন—রাত্রে স্বপ্নে মা তাঁহাকে দেখা দিলেন। সন্তান বৎসলা জননী—সন্তানের কামনা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু—ইহাতেও রামকৃষ্ণের তৃপ্তি হইল না, তিনি প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য

ব্যাকুল হইলেন। মনের যখন এইরূপ অবস্থা—তখন আর তাঁহার দ্বারা বিগ্রহের নিয়মিত পূজা কেমন করিয়া হইবে? বিশেষতঃ অনেক সময় দেখা যাইত—রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় উর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন! ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না! রাণী—রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়কে পূজারী নিযুক্ত করিলেন।

(৪)

এইবার রামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা। ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন—ভগবানকে পাইতে হইলে দীর্ঘকালের সাধনার আবশ্যক। মানুষের "আমি" ক্ষুদ্র হইয়াও প্রবল শক্তিশালী—তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে হইলে পরের সঙ্গে আপনার বিনিময় করিতে হয়। আমরা তাহা পারি না, আমরা এই ক্ষুদ্র "আমি" লইয়া অভিমানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি। তাই আমাদের চতুর্দ্দিকে এত চরম অনর্থের সৃষ্টি! বিধাতার সমৃদ্ধিময় জগতে—পরম দারিদ্র্য ভোগ করিয়া আমরা পদে পদেই বিড়ম্বিত। এই সর্ব্বনাশকর আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া রামকৃষ্ণদেব কালীর সাধনায় ব্রতী হইলেন। তিনি নানাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল তপস্যা করিতে লাগিলেন।

লোকে বুদ্ধদেবের কাহিনী পুস্তকেই পাঠ করিয়াছে—তাঁহাকে কেহ চাক্ষুষ দর্শন করে নাই। সাধনাস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখিয়া তাহারা জীবন্ত বুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিল।

ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন—"কামিনী ও কাঞ্চন" হইতেই সকল পার্থিব পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ; কামিনা হইতে সন্তানাদির উৎপত্তি—একে মন স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ—তাহার উপর আবার পুত্রাদির প্রতি বাৎসল্য রসে অভিভূত—মনের এরূপ অবস্থায় তাহার দ্বারা কি ঈশ্বর চিন্তা হইতে পারে? এই জন্যই ঠাকুর পত্নীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন নাই।

এক এক দিন দেখিতে পাওয়া যাইত—ঠাকুরের এক হস্তে মৃত্তিকা, অপর হস্তে রৌপ্য মুদ্রা। এই উভয় পদার্থ লইয়া ঠাকুর বিচার করিতেছেন—"টাকা জড় পদার্থ—ইহা দ্বারা হাতী ঘোড়া ক্রয় করা যায়, আহার্য্য সংগ্রহ করা চলে, কিন্তু টাকাতে তো সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। টাকা থাকিলে মনও আসক্তি বিহীন হয় না। আর এই মৃত্তিকা—ইহাতে শস্য উৎপন্ন হয়, সেই শস্যে জীবন রক্ষিত হয়,—কিন্তু ইহাও টাকার মত সহজ পদার্থ! অতএব দুইটীই এক জাতীয় পদার্থ! টাকা—মাটী, মাটী—টাকা!" এই সকল কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর টাকা ও মৃত্তিকা উভয়ই এক সঙ্গে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতেছেন! দেড়শত টাকা মূল্যের শাল উপহার পাইয়া ঠাকুর তাহা পদদলিত করিয়া বলিতেছেন—"যখন এখানে ব্রহ্মলাভ হয় না, তখন এতে আর ছেড়া ন্যাকড়াতে প্রভেদ কি ?"

এই সকল ঘটনাই লোক সম্মুখে ঠাকুরকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

(৫)

সাধনাবস্থায়—ঠাকুরের নেত্র নিদ্রাশূন্য, প্রাণের মধ্যে কি যেন ঝড় বহিতেছে, আহার বন্ধ প্রায়। ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়—এক এক দিন অনেক কৌশল করিয়া কিছু আহার করাইতেন, নহিলে অধিকাংশ দিনই অনাহারে কাটিয়া যাইত। জগন্ময়ী মাতাকে দেখিবার জন্য—ঠাকুর বাহিরের বন্ধন সমস্তই ছিন্ন করিয়াছিলেন। সত্যের আলোক তাঁহার অন্তরাকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি কেবল বলিতেন—"মা! মানুষগুলো কেবল ভুল শেখায়, আমি তোমা ভিন্ন অপর গুরু চাই না"। এক এক দিন—চাকর মেথরদের গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিতেন—"আমি ব্রাহ্মণ, আমি বড়, ইহারা ছোট—এ ভেদ বুদ্ধি একেবারে ঘুচাইয়া দাও মা! ইহারা যে তোমারি ভিন্ন মূর্ত্তি!

সাধনা চলিতে লাগিল। ঐকান্তিকতায় ও ব্যকুলতায় চিত্ত দৃঢ় ও নির্ম্মল হইতে লাগিল। এই সময় সৌভাগ্য ক্রমে—এক যোগিনীর সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় হইল। যোগিনী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, সঙ্গীত রসে অভিজ্ঞা, বিচিত্র বিভূতি ভূষণা এবং মধুরভাষিণী ছিলেন। যোগিনীর অপূর্ব্বশ্রী দেখিয়া ঠাকুরের মাতৃভক্তি উথলিয়া উঠিল। এই মহিমাময়ী মাতাজীর নিকটেই ঠাকুরের যোগ শিক্ষার আরম্ভ।

যোগ শিক্ষার কিছুদিন পরে একজন দার্শনিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঠাকুর পরিচিত হ'ন। সন্ন্যাসীর নাম—তোতাপুরী। ঠাকুর ইহার কাছে বেদান্তের নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করেন।

তোতাপুরী—পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভক্তি তত্ত্ব একেবারেই বুঝিতেন না। রামকৃষ্ণের কালী ভক্তিকে কুসংস্কার মনে করিয়া তোতা-পুরী অনেক বিদ্রূপ করিতেন। একদিন ঠাকুর তোতাপুরীকে ভক্তি তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। শিষ্যের অলোক সামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, তোতাপুরী পরাজয় স্বীকার করেন।

তন্ত্রোক্ত সাধনার পর—রামকৃষ্ণ দেব বৈষ্ণব কর্ত্তাভজা, আউল বাউল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় সম্মত সাধন করেন। মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম—কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। শেষে, নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া সাধনায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়।

ঠাকুরের সাধনার ফল যেদিন জন সমাজে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে দিন স্ত্রী পুরুষ সকলেই কোষমুক্ত প্রজাপতির মত তদীয় চিত্ত সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

(৬)

আমরা হতভাগ্য বিলাসের দাস, আমরা সাধুর মহিমা বুঝি না; সাধনার কথা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহি না। তাই আমাদের মত—

অধঃপতিত জাতির সম্মুখে একদিন ত্যাগী সন্ন্যাসী—সাক্ষাৎ বেদান্তের অবতার রামকৃষ্ণ দেবকেও জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণদেব এমন অনেক কাজ করিতেন—যাহা সাধারণে বুঝিতে পারিত না, তাহাদের ধারণা হইয়াছিল তাঁহার বুঝি মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে। এমন কি রাণী রাসমণিও—রামকৃষ্ণ দেবকে প্রথমে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। আর্য্য মহত্বের শেষ চিহ্ন যখন অস্তাচলবিলম্বী তপনের রশ্মিজালের মত অতি দ্রুত অদৃশ্য হইতেছিল, সে সময় রামকৃষ্ণের মত স্বভাব সাধুর অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য লোকে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই। এই জন্যই সাধারণ সংসারীর কাছে—ভগবান রামকৃষ্ণদেবের পরীক্ষা! রাণী রাসমণির জ্ঞাত সারে—এক ব্যক্তি রামকৃষ্ণের জিতেন্দ্রিয়তা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন। ঘটনাটী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বসন্তের এক স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে একটী নির্জ্জন গৃহে রামকৃষ্ণদেব বসিয়াছিলেন। এমন সময় সজীব বসন্ত ছবির মত কোনও পুষ্পময়ী কামিনী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তাহার দেহযষ্টি মনোজ্ঞ যৌবন কুসুম ভারে সজ্জিত; অধর নব কিশলয়ের অরুণ রাগে লোহিত—তাহাতে নেশার মত একটা চাঞ্চল্য! বাহুদ্বয় পেলব শাখা সৌকুমার্য্যে সুকোমল; রসিক পবন—চূর্ণ কুন্তল লইয়া রূপসীর কপালের উপর ক্রীড়া করিতেছিল! রমণীর ইচ্ছা—আজ সে হৃদয়াবেগের সহিত নিবিড় বাহু বন্ধনে ঠাকুরকে বেষ্টন করিবে। কিন্তু কুহকিনীর আশা পূর্ণ হইল না। অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শে সমস্ত দেহ যেমন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, রমণী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর নিজেকে তেমনি অশুচি মনে করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, রমণীর প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না। "এমন মহাপুরুষকেও অপরের প্ররোচনায় কলুষিত করিতে আসিয়াছি"—ইহা ভাবিয়া বেশ্যা আপনার ঘৃণিত যৌবনকে সহস্র ধিক্কার প্রদান করিল।

সেই দিন হইতেই রাণী রাসমণি—ঠাকুরের অপূর্ব্ব মহিমা বুঝিতে পারিয়া মলয়তরু বিগলিতা চন্দন তরুর ন্যায় ঠাকুরের পদমূলে লুণ্ঠিতা হইলেন। রাণীর কর্ম্মচারীগণও বুঝিল—পরমহংসদেব সামান্য সন্ন্যাসী নহেন—তাঁহার মধ্যে অসাধারণত্ব আছে।

মথুর বাবু নামে এক ব্যক্তি কালী মন্দিরের ভার প্রাপ্ত প্রধান কর্ম্ম-চারী ছিলেন। এই মথুর বাবুও একবার রামকৃষ্ণ দেবের জিতেন্দ্রিয়ত্তা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করেন।

লছমী বাই নাম্নী কলিকাতা নিবাসিনী এক বারবনিতার সঙ্গে—মথুর বাবুর আলাপ ছিল। এক দিন কৌশল করিয়া মথুর বাবু—পরমহংস দেবকে এই বেশ্যার বাটীতে লইয়া যান। তার পর ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে আপনি তথা হইতে সহসা অদৃশ্য হ'ন।

মথুর বাবুর শিক্ষা মত—১৫।১৬ জন বেশ্যা রামকৃষ্ণদেবকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং নানাবিধ হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বেশ্যাগুলোর কদর্য্য অভিনয় দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব শিহরিয়া উঠিলেন। তার পর "মা ব্রহ্মময়ী! মা আনন্দময়ী" বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিতে ডাকিতে —নব যৌবনা রূপসীদের মধ্যেই সহসা সমাধিস্থ হইলেন। সাধুর এই ভাব দেখিয়া—বেশ্যাগণ ভীত হইয়া পড়িল। নিকষ কালো মেঘের মত একটা গভীর অমঙ্গল ছায়া—তাহাদের ফুটন্ত সৌন্দর্য্য মলিন করিয়া দিল। তাহারা সাধুর চরণে পতিত হইয়া বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বেশ্যাদের মুখেই মথুর বাবু সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইলেন। আপনার মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া তাঁহারা মুখ লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল। রুষ্ট দেবতার সম্মুখে বিচার প্রার্থী মানুষের মত তিনি রামকৃষ্ণের সমীপে যোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাধুর প্রতি তাঁহার ভক্তি—শতগুণে বাড়িয়া গেল।

(৭)

রামকৃষ্ণদেব সখীভাবে সাধন করিবার জন্য—মথুর বাবুর অন্তঃপুরে স্ত্রীবেশে স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার মন—শুভ্র শিশির কণার মত স্বচ্ছ ছিল।

এইরূপে জ্ঞান ও ভক্তির নানা পথে ভ্রমণ করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—সকল ধর্ম্মমত ও সাধন প্রণালীর পরিণাম ফলই এক।

রামকৃষ্ণদেব উপদেশে ও জীবনে অসংখ্য ভক্তের কল্যাণ সাধন করিয়া তাহাদের মুক্তিপথের সহায় হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ শুনিবার জন্য, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য—রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থগণ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে—কেমন একটা সাধুতা ও ওজঃস্বীতা বর্ত্তমান ছিল—তাহা অতি পাষণ্ডের জড় হৃদয়েও বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিতে পারিত। তাহা যেন দেবতার শঙ্খধ্বনি—সে উপদেশ শুনিবার জন্য লোকে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিত। সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিতেন, তাঁহাদের মনে হইত—তন্দ্রাতুর ভারত অকস্মাৎ তাঁহার নির্ব্বাপিত কায়া আবার বুঝি জাগিয়া বসিয়াছে। অতীত দিবসের চির আচরিত কার্য্যের অভ্যাস—তাহার সমস্ত শক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

রামকৃষ্ণ দেবের আর একটি ভাব ছিল—ভারতের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব্ব। তিনি কখনও সাধু সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতেন না, কোন সাম্প্রদায়িক লক্ষণ তাঁহার শরীরে বা বেশে দেখা যাইত না। তিনি কখনও ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন, কখনও হরিদ্বারে যাইতেন, মসজিদ দেখিলেও প্রণাম করিতেন।

রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ জীবন্ত ছিল। সে উপদেশে বিখ্যাত নাটককার গিরিশ চন্দ্রের চিত্তের আবিলতা দূর হইয়াছিল। সে উপদেশ শুনিবার জন্য—কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি স্বনাম ধন্য মহাপুরুষগণ

—দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যাইতেন। পরম হংসদেব ভক্তদের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন। ভক্তেরাও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিত না। কখনও কখনও তিনি ভক্তদের বাটীতে অতিথি হইতেন। সে দিন সে বাটী কীর্ত্তন, নৃত্য ও হরিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

কেহ তাঁহার পদধূলি লইবার অবকাশ পাইত না, শিষ্যগণের মধ্যে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন।

রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, একজন বিদেশী বলিয়াছেন—"এতদিন পরে একটী মানুষের দেখা পাইয়াছি, তাঁর কাছে ধর্ম্মই সব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—তাঁহার কাছে বসিলে মানুষের সমস্ত কামনা বিশ্ব সকাশে নতমুখী হইয়া পড়ে! আত্ম মর্য্যাদার গৌরব—তাঁহাকে ভাস্বর করিয়া তুলিতে পারে নাই।"

নব বিধান সমাজের বিখ্যাত প্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন—"রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম কি? হিন্দু ধর্ম্ম; কিন্তু তাহা অদ্ভুত প্রকারের হিন্দু ধর্ম্ম। সাধু রামকৃষ্ণ কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈব নহেন, বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিক নহেন, অথচ তিনি এ সকলই! তিনি শিব, কৃষ্ণ, কালী, রাম—সকলেরই উপাসনা করেন, অথচ বেদান্ত মতেরও দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি এক জন পৌত্তলিকও বটেন, অথচ তিনি নিরাকার অদ্বীতিয়, পূর্ণ, অনন্ত ঈশ্বরের অনুরক্ত ধ্যাতা।"

রামকৃষ্ণদেব—এক স্থানে স্থির থাকিতেন না, নানা দেশ ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার মুখের একটী কথায়—লোকের মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইত। নর সেবা তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ ব্রত ছিল। ধনী, দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে সরল ব্যবহারই তাঁহাকে এই স্বার্থ পরতাপূর্ণ সংসারে "দেবত্ব" দান করিয়াছিল। কাহাকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না। মেথরাণী দেখিলে বলিতেন—"তুমি আমার মা! ছেলেবেলায়

মা স্বহস্তে মল মূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন, এখন সেই কাজ তুমি করিতেছ'—তুমি আমার মা! আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারি।"

(৮)

একবার রামকৃষ্ণদেব—শ্বশুর বাটী গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী তখন ষোড়শী। কিন্তু তিনি পত্নীকে প্রেম সম্ভাষণে অভিনন্দিত করেন নাই। মাতৃ সম্বোধন করিয়া যুবতী পত্নীর চরণ পূজা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের এই পত্নীও এক অসাধারণ রমণী। তিনি কখনও স্বামীর সাধনার পথের কণ্টক হন নাই। অতি অল্প বয়স হইতে—যেরূপ সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া, তিনি নারী চরিত্রের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহাকে "দেবী" না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার সেই পুণ্যস্মৃতিতে আজ সমস্ত ভারত গৌরবোজ্জল। সারদামণির মত মনস্বিনী রমণীর কথা প্রকাশ করিলেও পুণ্য, পাঠ করিলেও পুণ্য, তাই আমরা আভাষে সেই মহিমাময়ীর নামোল্লেখ করিলাম।

পরম হংস রামকৃষ্ণদেব ভারত জননীর পাদপদ্মে—একটী দুর্ল্লভ রত্ন উপহার দিয়া গিয়াছেন। সে রত্ন—স্বামী বিবকানন্দ।

(৯)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে (বঙ্গাব্দ ১২৯৩, ১লা ভাদ্র) মহাত্মা রামকৃষ্ণের নশ্বর লীলার অবসান হয়। বেলা দুই টার সময় মৃদঙ্গ করতাল বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে ভক্তগণ পরমহংস দেবের শব কাশী-পুরের উদ্যান বাটী হইতে জাহ্নবীর তীরে আনয়ন করেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে চিতা সজ্জিত হইল। প্রজ্জলিত চিতার উপর চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের নশ্বর দেহ ভষ্মীভূত হইয়া গেল।

রামকৃষ্ণ আর নাই। কিন্তু ভারত তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবে না। যাহা ব্যষ্টিভাবে ছড়াইয়াছিল, তাহার সমষ্টি করিয়া রামকৃষ্ণ যে বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য রাখিয়াছিলেন, তাঁহার এ ঋণ কে পরিশোধ করিবে? রামকৃষ্ণের জীবনী অনুশীলন করিলে মনে হয়—ত্রেতাযুগের "রাম" এবং দ্বাপরযুগের "কৃষ্ণ" এই দুই অবতারের চরিত্র সম্পদে ভূষিত হইয়াই—কলিযুগে তিনি "রামকৃষ্ণ" নামে সাধন রাজ্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ স্বামী

স্বামী-বিবেকানন্দ

(১)

ভারত—ধর্ম্মপ্রাণ মহাদেশ। এখানে যুদ্ধের নাম—"ধর্ম্মযুদ্ধ", রণ-ভূমির নাম—"ধর্ম্মক্ষেত্র," সংসার সঙ্গিনীর নাম--"ধর্ম্মপত্নী" ও "সহ-ধর্ম্মিণী"। বিষয়ার্থীর প্রবল উৎপীড়নে, বিদেশীর অমানুষিক অত্যাচারে ভারত বারম্বার পর্য্যুদস্ত হইয়াও আপনার ধর্ম্ম বিক্রয় করে নাই। এখনও শত শত যোগী ঋষি তপস্বী—হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে আত্ম গোপন করিয়া কৃপণের ধনের মত আপনার ধর্ম্মধন রক্ষা করিতেছেন। এখনও অনেক সিদ্ধ পুরুষ আছেন—লোকে যাঁহাদের নাম জানে না। জগতের কোলাহল, স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগীতা হইতে তফাতে থাকিয়া তাঁহারা সাধারণের অনুসরণের অতীত হইয়া আছেন! এই যে সকল সিদ্ধ পুরুষ—তাঁহারা কেবল আত্মমুক্তির অভিলাষী, জগতের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধও নাই। সমাজের ভাল মন্দের জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। তাঁহাদের জীবন—নিজের অসম্পূর্ণ কার্য্য সাধনের জন্য। কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীতে এক জন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যিনি আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম—'স্বামী-বিবেকানন্দ।'

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে—এক এক জন প্রেরিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সেই প্রেরিত পুরুষ। যদি "অবতার বাদে" বিশ্বাস করিতে হয়—তবে বিবেকানন্দ এই শতাব্দীর অবতার।

বিবেকানন্দ—কত শত উন্মার্গগামী যুবককে সংযম ও ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়াছেন। যাহারা আচার ভ্রষ্ট, উপেক্ষিত, ঘৃণীত—তাহাদের জন্য মুক্তি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতফেরতকে সমাজে স্থান দিয়াছেন।

এতদিন ইউরোপ—বিজিত পদানত ভারবাসীকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া, ভারতে আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিত, আমেরিকা, ভারতকে খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিত, কিন্তু বিবেকানন্দের প্রসাদে ভারতের ধর্ম্ম সপ্তসিন্ধু মন্থন করিয়া ইউরোপকে আক্রমণ করিয়াছে। বিবেকানন্দের আহ্বান আমেরিকা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছে! বাঙ্গালী বিদ্বেষী সাহেব হ্যাটকোট খুলিয়া গৈরিক বসন গ্রহণ করিয়াছে, বাইবেল ফেলিয়া "গীতা" ধরিয়াছে, যীশু ভুলিয়া "আর্য্য" সাজিয়াছে! এ সকল কথা যখন ভাবি, তখনই মনে হয়—কি অতুল অমৃতময়ী মহতী প্রতিভা লইয়াই স্বামী-জী এই চির অলস, চির নিষ্ক্রিয় অধম বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত অবতরণ করিয়াছিলেন! হায়! স্বার্থপর আমরা তাঁহাকে চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই।

"বিবেকানন্দ"—এই গুরুদত্ত নাম নিজের প্রতিষ্ঠাময় জীবনে তিনি যে সার্থক করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইহাই আমাদের সান্ত্বনা! চক্ষের জলের কালীতে লিখিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আজ আমরা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

(২)

১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ সোমবারে স্বামী বিবেকানন্দ, কলিকাতার সিমলা নামক স্থানে এক কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, ইনি হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন।

তখনও প্রভাত হয় নাই। রজনীর তামসিক যবনিকা ভেদ করিয়া উদয় তোরণে তপনের রম্যবর্ণ বিকাশ তখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই,

সেই দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণ পুণ্যময়ী উষার ক্রোড়ে, নিশাবসানে "শুক-তারার" মত বিবেকানন্দের আবির্ভাব! দত্তবাটীর অন্তঃপুরের মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া, তখন কেহই ভাবে নাই—এই সূতিকাগৃহের স্বর্ণরাগ একদিন বিশ্বের প্রাঙ্গণে অবতরণ করিবে! তথাপি সাধারণ শিশু হইতে সেই জাতমাত্র শিশুর যে যথেষ্ট মৌলিকতা ও বিশেষত্ব আছে, তাহা অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্র বাল্যে বড় দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু সে শৈশবচপলতায় সকলেই কৌতুক অনুভব করিত। বিদ্যালয়ে সকল বালক অপেক্ষা নরেন্দ্রের কৃতিত্ব অধিক ছিল। কুশাগ্র বুদ্ধি এবং অলোকসামান্য প্রতিভাগুণে তিনি শিক্ষকগণের প্রিয়-পাত্র ছিলেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ তর্ক শুনিয়া বয়স্ক ব্যক্তিরাও মুগ্ধ হইতেন।

নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এফ,এ পড়িবার জন্য তাঁহাকে "এসেম্ব্রি কলেজে" ভর্ত্তি করা হয়। এই সময় ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব নরেন্দ্রকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় ধর্ম্মজীবন গঠনের উপাদানগুলি তিনি ইংরাজী শিক্ষার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার দ্বন্দ্বচঞ্চল মন এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইয়া কখনও, তাঁহাকে "ব্রাহ্ম সমাজে" কখনও পাদ্রী সকাশে, আবার কখনওবা মৌলবী মস্‌জিদে লইয়া যাইত। বসন্তের পুষ্পবিলাসী মধুপের মত তিনি সকল সম্প্রদায়ের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নরেন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা গতিবিধি ছিল—"ব্রাহ্ম সমাজে।" ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের বক্তৃতা—নরেন্দ্রের ধর্ম্মজীবন গঠনের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। তাই পূর্ব্বতন সংস্কারের অন্ধবিশ্বাসে তাঁহার উপর কখনও প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে জগতের শিক্ষার জন্য তিনি যে হিন্দুর দার্শনিক মতকে আধুনিক বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া শিক্ষিত নরনারীর উপর

সহায়—প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের ছাত্রজীবনেই তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩)

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ ঘোর সংশয়বাদী। কোন ধর্ম্মেই তাঁহার আস্থা ছিল না, কোন ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহার সন্দেহ নিরশন করিতে পারেন নাই—কাজেই নরেন্দ্রনাথ সংশয়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ কুতার্কিকের বুদ্ধির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া সংশয়বাদী, কেহ বা স্বীয় অমার্জ্জিত বুদ্ধির জড়তার জন্য সংশয়বাদী। নরেন্দ্রনাথ এরূপ সংশয়বাদী ছিলেন না। সমস্ত ধর্ম্মমতগুলি তন্ন তন্নরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, শেষ মিমাংসা করিতে অক্ষম হইয়া নরেন্দ্রনাথ সংশয়বাদী হন, তাঁহার অন্তরে এমন একটি তীব্র ব্যাকুলতা ছিল—যে ব্যাকুলতা তাঁহার সুকুমার জীবনকে ভবিষ্যতে ঈশ্বরনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। এই আকুলতার জন্যই পরিণামে প্রভু রামকৃষ্ণের কৃপালাভ।

একদিন যাঁহাকে সমগ্র সভ্য জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহাদের অসংখ্য মতের মধ্যে আপনার ধর্ম্মমত যুক্তি-নির্ণীত করিয়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাঁহার যাবতীয় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি আয়ত্ত না করিলে চলিবে কেন?

নরেন্দ্র কিশোর বয়সে মৌলবী ব্রাহ্মপ্রচারক পাদ্রী ও সাধু সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"আপনারা কেহ কি কখনও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" উত্তরে শুনিতেন "না"। তাঁহার ব্যাকুল অন্তঃকরণ সে উত্তরে স্রোতের মুখে বেতস লতার মত নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িত। তিনি বাল্যকাল হইতেই সাধু সন্ন্যাসীর ভক্ত ছিলেন, সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার মনের দ্বিধা মিটিত না। এই সময় নরেন্দ্র কতকটা নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সন্দেহ বিপ্লবের চক্রব্যূহে পড়িয়া, শৈশব ও

যৌবনের সন্ধিক্ষণে শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে মহাত্মা রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নরেন্দ্র নাথের পরিচয় হইয়াছিল। নরেন্দ্রকে প্রথম দিন দেখিবামাত্রই পরমহংসদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ইহলোকের কর্ম্মযজ্ঞে এতদিনের পর তাঁহার যথার্থ উত্তর সাধক মিলিয়াছে।

এই কামদুহ কল্পদ্রুমের স্নিগ্ধ চরণচ্ছায়াতলে বসিয়াই নরেন্দ্রের দীক্ষা ও সাধনা।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া প্রভু রামকৃষ্ণদেব অন্যান্য ভক্তদের বলেন—

"এই ছেলেটিকে দেখ্‌ছ এখানে একরকম দুরন্ত ছেলে, যখন বাবার কাছে বসে, জুজুটী; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক, এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না, একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়; এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের কাজ কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।"

প্রভু রামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিচয়—আত্মায় আত্মায় পরিচয়। রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন। এ ভাল-বাসায় মন্দারের মধু মাখানি ছিল, আশীর্ব্বাদের নির্ম্মাল্য কুসুমের সৌরভ জড়িত ছিল। নরেন্দ্রের হৃদয় উদার উন্মুক্ত আকাশ, নরেন্দ্রের মন তত্ত্বানুসন্ধিৎসায় ব্যাকুল। নরেন্দ্রের প্রাণ, জীবদুঃখে দ্রবময়,—রামকৃষ্ণ দেব বুঝিয়াছিলেন, এই মৃন্ময়ের ভিতর চিন্ময়ের লীলা দেখিয়া একদিন নিখিল সংসার মহাশিক্ষা লাভ করিবে। নরেন্দ্রকে একদিন না দেখিলে পরমহংস দেব পাগল হইয়া উঠিতেন।

নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে অপ্সরার নূপুর সিঞ্জিতের আভাষ পাওয়া যাইত; দূর হইতে শুনিলে সহসা বামাকণ্ঠ বলিয়াই ভ্রম হইত। সেই কণ্ঠে যখন মায়ের নাম গীত হইত—তখন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরস্থিত পাষাণ প্রতিমায় কি এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় কে যেন প্রাণস্পন্দন আনিয়া

দিত। রামকৃষ্ণদেব তন্ময় হইয়া সেই জীবন্ত সঙ্গীত উপভোগ করিতেন, তাঁহার তপঃপূত কলেবরে অনির্ব্বচনীয় সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইত।

রামকৃষ্ণদেবের লীলা যতদিন মর্ত্ত্যে প্রকট ছিল, ততদিন নরেন্দ্রের ভক্তভাব শিষ্যের অবস্থা। এ মূর্ত্তি বড় করুণ—বড় মর্ম্মস্পর্শী! এ মূর্ত্তি বুকে টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে—যেন মনে হয় কত আপনার, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। নরেন্দ্রের মোহনীয় চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহার এই শিষ্যটীর নামকরণ করিয়াছিলেন "বিবেকানন্দ"। বাস্তবিক "বিবেকানন্দ স্বামী" এই নামটি শুনিলেই শ্রোতার মনে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও ভয়মিশ্রিত কেমন একটি ভাবের উদয় হয়। মনে হয় হিমাদ্রির অপেক্ষা উন্নত, মহাসমুদ্রের মত অতলস্পর্শ। সে উচ্চতার "নাগাল" পাওয়া যায় না, সে গভীরতার "থই" মাপা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। রামকৃষ্ণদেবের দীক্ষাগুণে আমাদের নরেন্দ্র-নাথ আজ জগজ্জয়ী; ইহার ধর্ম্মপতাকামূলে সমস্ত পৃথিবীবাসী সমবেত। রামকৃষ্ণদেবের সরল উপদেশগুলি দার্শনিক যুক্তি দ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

(৪)

বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রচার।—সে এক অপূর্ব্ব বস্তু! এই ধর্ম্মপ্রচারের সমস্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। ধর্ম্মজগতে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য্য "চিকাগোর" মহাসভায় বেদান্ত বক্তৃতা, উপনিষদ্, ধর্ম্মপ্রচার। এই বক্তৃতা দ্বারাই বিবেকান্দকে জগৎ সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছিল।

স্বামীজী ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন; এইজন্য কেহ কেহ স্বামীজীর জীবিত কালে তাঁহার কার্য্য "হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে" বলিয়া আপত্তি করিয়াছিল। তাঁহাদের মতে—ম্লেচ্ছ দেশে গমন হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে, কেননা ম্লেচ্ছ দেশে বাস করিতে

গেলে "অখাদ্য ভক্ষণ" অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। আপত্তিকারীগণ যদি একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেন—যে অখাদ্য ভক্ষণ ও ম্লেচ্ছ দেশে গমন সাধারণের পক্ষে দূষ্য হইতে পারে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে তাহা দূষ্য হইতে পারে না। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ জ্ঞানীদের পক্ষে নহে। যাহারা নির্ব্বিকার—তাঁহাদের আবার পাপপুণ্য কি?

একদিন স্বামীজীর ধর্ম্মপ্রচার ভেরী এসিয়া হইতে আমেরিকা, আমেরিকা হইতে ইউরোপ মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারের ফলে বিশ্বের কোটী কোটী নর নারী স্বামীজীর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজি যে বেদান্তের এত আদর—তাহার একমাত্র কারণ স্বামীজীর ধর্ম্ম প্রচার। তাঁহার জন্য পৃথিবী আজ বেদান্ত ধর্ম্মের নিকট নতশির। স্বামীজী যে যে স্থানে বক্তৃতা করিতেন, সেই সেই স্থলেই বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌরব বোধ করিতেন। স্বামীজীর আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কত যুবক যে আপনাদের মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ—বেলুড় মঠের মহোৎসবে আপনারা দেখিতে পাইবেন।

এই আরব্ধ ব্রত দীন সেবা। কন্খল হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া—আমেরিকা পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীতে

এই গল্পটী বিবেকানন্দ-ভক্ত কোন এক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি।

"একদিন স্বামীজী আহারে বসিবেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন মেথর বিষ্ঠাধার লইয়া চলিয়া যাইতেছে। স্বামীজী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুই এই বিষ্ঠার হাতে আমার ভাত মেখে দে?" স্বামীজীর আগ্রহাতিশয্যে মেথর তাহাই করে। স্বামীজী তখন সেই অন্ন অম্লানবদনে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। আহার সমাধা করিয়া বলিয়া উঠিলেন "এইবার আমি বিলাত যাইতে পারিব। ইহাতে আমার কোন পাপ হইবে না।"

পল্লীতে এই মহান আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া দেখা যাইতেছে। পরিণামে সমস্ত জগতের আকুল দৃষ্টি এই দীনসেবা কার্য্যে পতিত হইবে—তাহা আকাশ কুসুম নহে।

স্বামীজীর শিষ্যগণের মধ্যে সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ দেশ পশ্চি শিষ্যাগণের মধ্যে বিদুষী নিবেদিতা সর্ব্বপ্রধানা, বিবেকানন্দের সাধু চরিত্র ও স্বদেশ প্রীতির মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া দেবী নিবেদিতা—স্বদেশের সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, তপস্বিনী উমার বেশে ভারতের চরণে শরীর মন নিবেদন করিতে আসিয়া ছিলেন।

স্বামীজীর "বক্তৃতা" আলোচনা করিলে দেখা যায়—তাঁহার উৎসাহ, অধ্যবসায় জ্বলন্ত ছিল, তাঁহার প্রাণ সমগ্র জগতের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আশা গগনস্পর্শী, লক্ষ্য ভগবানের উপর ছিল। তাঁহার সহানুভূতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি সমস্ত জাতি নির্ব্বিশেষে করুণার মত বর্ষিত হইত।

(৫)

আমেরিকার চিকাগো নগরে এক বৃহতী সভা আহূত হয়। পৃথিবীর তাবদ্ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ এই সভায় সমবেত হয়েন। এরূপ বৃহতী ধর্ম্ম সভা, এরূপ ধর্ম্ম প্রচারক সম্মিলন জগতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। মান্দ্রাজ এসোসিয়েশনের অর্থ সাহায্যে স্বামীজী তথায় প্রেরিত হন। তথায় যাইয়া দেখেন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। স্বামীজীর মনে হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ উত্থিত হইল। হর্ষ—সেই অসাধারণ সভায় বক্তৃতা করিবেন ভাবিয়া। বিষাদ—পাছে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন বলিয়া। কি উপায়ে সেই সভায় বক্তৃতা করিতে অধিকার পাইবেন—তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পাথেয় নিঃশেষিত, সে দেশে কেহ ভিক্ষা দেয় না, কেহ ভিক্ষা করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। সকলেই ... —কেই বা ঋণ দিবে। দেশ বরফাবৃত, শীত অসহ্য, শীত নিবারণোপযোগী তাদৃশ গাত্র বস্ত্রেরও অভাব। সেই দুঃসময়ে মান্দ্রাজ বাসী

অর্থ সাহায্য করিয়া স্বামীজীকে রক্ষা করেন—ইহার জন্য বাঙ্গলা তাঁহাদের নিকট ঋণী।

সমুদ্রে নিমজ্জমান্ ব্যক্তি সন্মুখে কাষ্ঠখণ্ড দেখিতে পাইল, অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃক্ষ অরণ্যে আলোকরশ্মি দেখা দিল—স্বামীজীর আশার উদয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই চিকাগো সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজী দীন ভিখারীর মত মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। সেই প্রবাসে—সেই নিঃসহায় অবস্থায় স্বামীজী মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তি দূরে থাক, মুখের একটী সহানুভূতি সূচক আশ্বাস ও পাইলেন না। স্বামীজী চক্ষে আঁধার দেখিলেন, তাঁহার উৎসাহদীপ্ত মুখমণ্ডল হতাশে কালিমাময় হইল, তাঁহার গৌরবোন্নত বক্ষ সে মর্ম্মভেদী আঘাতে দমিয়া গেল। স্বামীজীর ধারণা ছিল ব্রাহ্মেরা স্বভাবতঃ উদার। এইবার সে ধারণা ঘুচিয়া গেল।

চিকাগো হইতে তিনি "কষ্টম" নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। "কষ্টম" একটী পল্লী। তথায় অল্পব্যয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে—ইহাই তাঁহার আশা। "কষ্টমের" এক বরফাবৃত পথে—স্বামীজী অনাথের মত পতিত; সে দৃশ্য এখনও দর্শন করিলে চক্ষু জলে ভরিয়া আসে! সে অবস্থা দেখিলে পাষাণে উৎস ছুটে।

"কষ্টমের" এক দয়াময়ী প্রৌঢ়া রমণী স্বামীজীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া নিজের গৃহে স্থান দিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় চিকাগোয় প্রবেশাধিকার এবং বক্তৃতা করিবার জন্য দশ মিনিট মাত্র সময় স্বামীজী পাইয়াছিলেন।

অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ সভাস্থ নর নারীকে সম্বোধন করিলেন—তখন সকলেই একযোগে করতালি দ্বারা সেই মহাত্মার অভিনন্দন করিলেন। সকল ধর্ম্ম প্রচারিকের বক্তৃতা শেষ হইলে স্বামীজী উঠিলেন।

সভা আরম্ভ হইল। জলদ গম্ভীর স্বরে স্বামীজী প্রথম বৈদিককালের কথা পাড়িলেন। শ্রোতারা নূতন কথা শুনিল। শ্রোতৃবৃন্দের বক্তৃতা শুনিবার তীব্র আকুলতা দেখিয়া স্বামীজীর বক্তৃতার সময় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। স্বামীজী ওজস্বিনী ভাষায় জগতের অপূর্ব্ব তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, জগৎ সমক্ষে হিন্দুর জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া গেল। তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত, শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্র পুত্তলিকাবৎ। সেই সহস্র সহস্র শ্রোতৃগণের—জয়গানের যশোমাল্য স্বামীজীর মস্তকের কিরীটি হইল। তাঁহার সমাদরের ইয়ত্তা রহিল না।

(৬)

স্বামীজী আজীবন ব্রহ্মচারী। তাঁহার মেঘধ্বনিবৎ গুরুগম্ভীর স্বর, প্রতিভাময় তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি সকলকেই মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশের কোন ধনবতী সুন্দরী যুবতী তাঁহার পাণি প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীজী আজীবন ব্রহ্মচারী—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি "ইহ জীবনে সংসারাশ্রমী হইবেন না" ইহা জানাইলেন। একটী অর্থশালিনী পাশ্চাত্য সুন্দরী—স্বামীজীর প্রেম লালসায়, নারী জন সুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন—"যদি আপনি আজীবন কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, এইরূপ সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন তবে কেন পুনঃ পুনঃ আমার প্রতি চাহিয়াছিলেন? আমি আমার প্রাণ পুষ্পাঞ্জলির মত আপনার চরণে ঢালিয়া দিতেছি, আপনি কেন লইবেন না?"

স্বামীজী হাসিতে হাসিতে উত্তর দেন—"আমি আমার ভারতীয় জননী ও ভগিনীগণকে দেখিয়াছি, আজ আবার আমেরিকা বাসিনী জননী ও ভগিনীগণকে দেখিতে ছিলাম, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহারই সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম। আমি লালসার দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাই নাই।"

স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তথা প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভারতের বহুস্থানে যে যে বক্তৃতা করেন, তাহাও "ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থে" সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত [illegible] জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালার গৌরব স্বরূপ [illegible] আছে। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু তত্ত্ব "উদ্বোধন" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

স্বামীজী প্রতিমাপূজক—সাকার বাদী; দেশ হিতকর সংস্কারের প্রবর্ত্তয়িতা তিনি সমাজ সংস্কারক—সমাজ বিপ্লবকারী নহেন। তিনি ব্রাহ্মণে জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে যেমন পরামর্শ দিতেন, শূদ্রে তদ্রূপ ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি করিতে বলিতেন—ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ প্রচার করিতেন না "ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। * * * ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণের উপর বড় রাগ * * * সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না।" * পাশ্চাত্যের কর্ম্মজীবনের সহিত প্রাচ্যের ধর্ম্ম জীবনের সমন্বয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।" †

স্বামীজী ৺রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শিষ্য। গুরুদেবের কালী ভক্তি স্বামীজীতেও কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন তিনি প্রভু রামকৃষ্ণ দেবকে নিবেদন করেন, "কয়দিন ত' মায়ের নাম জপ করিলাম কিন্তু দর্শন পাইলাম কই?" ‡ রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের উপরেও শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে শুনিয়াছি যে, "এই কালীই লীলাময়ি ব্রহ্ম।" বক্তৃতায় দেখিতে পাই—* * * "অন্য দেশের মহা মহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক সিঁটকাইয়া আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন।

(স্বামীজীর বক্তৃতা, ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ)।
(রামকৃষ্ণ কথামৃত)।

আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা স্থির হইয়া এইটী ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার বর্ত্তমান।"*

স্বামীজী জাতিনির্ব্বিশেষে জ্ঞান চর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু জাতিভেদ ধ্বংসকারী ছিলেন না। বিশুদ্ধি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই তাঁহার বাসনা ছিল। তবে জাতিভেদের বর্ত্তমান আকার তাঁহার মনঃপূত ছিল না। জাতি জন্ম ও গুণমূলক—এই দুইটি দিকই তাঁহার দৃষ্টি ছিল বাস্তবিক আমাদের সংহিতা ও পুরাণে—"জাতি, জন্ম ও গুণমূলক' বলিয়াই অভিহিত আছে, তবে জাত কর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়নাদি যাবতীয় সংস্কারই জন্ম মূলক জাতিরই অপেক্ষা করে, শিশুর পক্ষে জন্মমূলক জাতি ভিন্ন গুণমূলক জাতি নির্ণীত হইতে পারে না।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা হরিভক্তি পরায়নঃ"

জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার মত—"আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে (ভারতবর্ষে) ইহার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা নিমিত্ত আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে।"*

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিপ্রায়—"স্ব স্ব বর্ণকে নিম্ন করিয়া আহার বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না।†

* (ভারতে বিবেকানন্দ)।

* (ভারতে বিবেকানন্দ)।

† (কুম্ভকোন বক্তৃতা)।

তিনি আধুনিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী ছিলেন। ধর্ম্মের নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতেন না, যথা—"সহরের সব লোক মিলে যেখানে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলা গারদে পরিণত করুক।" *

আজকালি সংহিতা ও স্মৃতিকারগণের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়া কোন কোন সঙ্কীর্ণমনা শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদের উপর স্বামীজীর কি গভীর শ্রদ্ধা, ইঁহাদের মতের উপর কি গভীর বিশ্বাস ছিল তাহা তিনি একস্থানে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন—"এক্ষণে আমাদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটী আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন।"

বেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা – পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত বা তৎপদলেহী নব্য ইংরাজি শিক্ষিত বাবুদের মত ছিল না—"বেদ যখন লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। বেদ অপৌরুষেয়। * * * অনৈতিহাসিকতাই বেদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ।"

স্বামীজী স্থির জানিতেন যে, চিরাচরিত সনাতন প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া, শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান সমূহের হিত কর্ত্তব্যতা না মানিয়া, নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও স্থায়িত্বের আশা নাই। কালের শক্তি পাথরে তাহার রেখা থাকিবে না। অথবা শেষ একটী ক্ষুদ্র উপধর্ম্মে পরিণত হইবে। এই কারণে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহার আদর্শে সৃষ্ট আশ্রম বা মঠগুলির মধ্যে হিন্দুর প্রবেশের পক্ষে কোন আপত্তি নাই। যাঁহারা প্রবেশ করিবেন তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয় না, বা প্রচলিত আচার পদ্ধতিকে দূরে ফেলিয়া নূতন [illegible]র গ্রহণ করিতে হয় না।

* (ভারতে বিবেকানন্দ)।

(৮)

কোন কোন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতের সহিত হিন্দু সাধারণের অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে বর্ত্তমান শতাব্দীর একমাত্র ধর্ম্ম-প্রচারক, দেশের একমাত্র সংস্কারক—এ বিষয়ে হিন্দুর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। অধুনাতন ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে তিনি সংসার ত্যাগী। সংসারে স্ত্রী পুত্রের মায়ায় আবদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত লোক শিক্ষা দেওয়া চলে না। বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ সকলেই এই বিষয়ে প্রমাণ। ১৯০৯ বঙ্গাব্দে ২০শে আষাঢ় ভাগিরথী তীরে যে স্থানে এই মহাত্মার নশ্বর দেহত্যাগ ঘটে, সেই স্থানে প্রতিবৎসরেই মহা সমারোহে উৎসব হয়, স্থানটীর নাম বেলুড় মঠ।

ধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বামীজী—হৃদয়ে যে ভারতবর্ষের সমুজ্জ্বল মহান্ আদর্শ ধারণ করিয়া বীরের মত কর্ত্তব্য পথে চলিয়াছিলেন, সহস্র প্রতিবন্ধকতায় একদিনের জন্যও তাহা ম্লান হইয়া পড়ে নাই। বিবেকানন্দ স্বামী দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, দেহ, মন—সমস্তই নিবেদন করিয়াছিলেন। অতীতের অপূর্ব্ব জ্ঞান মাহাত্ম্য—ভবিষ্যতের উদীয়মান গৌরব—আমাদের মত অবিশ্বাসীকে বুঝাইবার জন্য, তিনি যে সরল নিষ্ঠা ও অক্লান্ত অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন,—সেই আদর্শ একাগ্রতা আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে দৃঢ়তর চালিত করুক। মঙ্গলের দৃষ্টান্ত কখনই ব্যর্থ হইবে না।

———

উদ্ধারণ দত্ত

শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে—সপ্তগ্রাম উন্নতির উত্তুঙ্গ শৈল শিখরে উন্নীত। তখন স্বচ্ছ সলিলা সরস্বতীর তরঙ্গরাশি বিক্ষুব্ধ করিয়া পণ্য-সম্ভারপূর্ণ পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যতরী সপ্তগ্রামের বন্দরে উপস্থিত হইত। নগরের সুরম্য হর্ম্ম্যমালা মণিময় মস্তক তুলিয়া কালসাক্ষী আকাশকে স্পর্দ্ধা দেখাইত। ধনীর বিলাসোদ্যানে পুষ্পময়ী বসন্তলক্ষ্মী ভ্রমরের তিলকাঞ্জন পরিয়া অরুণ প্রবাল-রাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিতেন। প্রকৃতির সংগ্রহে রচিত শ্যামায়মান ক্ষেত্রের নবীন শষ্পাঙ্কুর বালতপনের লোহিত কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। বটছায়ায় বসিয়া দূরদেশগামী পান্থকুল শীকর কণবাহী শীতল সমীরণ সেবন করিয়া অধ্বশ্রম নিবারণ করিত। রমণীর নূপুর নিক্কনের সহিত সারসের কলধ্বনি মিশিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যায় নদীতীর মধুরতর হইয়া উঠিত। মধ্যাহ্নের কনকবালুকায় ছুটাছুটি করিয়া পল্লী-বালকগণ কন্দুক ক্রীড়া করিত। বহুবিদেশীর কল্যাণে—সোণার বাঙ্গালার বিপুল ঐশ্বর্য্য-কাহিনী সুদূর য়ুরোপখণ্ডের বণিক কুলে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন পর্ত্তুগীজেরা আদর করিয়া সপ্তগ্রামের নাম রাখিয়াছিল—"পোর্টো পেকিনো"।

সেই সমুদ্রযাত্রার শত নিদর্শনে সুশোভিত, সহস্র সৌধমালায় গৌরবান্বিত সপ্তগ্রাম এখন দুর্গম জঙ্গলে পরিপূর্ণ! তাহার অতীত সমৃদ্ধি পৃথিবীর মাটীতে মুখ লুকাইয়াছে! গ্রাম্য শিশুর উৎফুল্ল আনন, কুল-নারীর হর্ষচঞ্চল নেত্র—গৃহস্থের প্রাঙ্গণে আর প্রসন্ন পদ্মের মত বিকশিত হইয়া উঠে না! কলনাদিনী সরস্বতী বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে সপ্তগ্রামের

পাদমূল আর নিরন্তর অভিষিক্ত করে না। নদী এখন শৈবালদলে সমাচ্ছন্ন, রবিকর-শুষ্ক ক্ষীণ পল্বলে পরিণত হইয়াছে! বাণিজ্য-জাহাজ আর বহু বিদেশের রত্নভাণ্ডার সপ্তগ্রামে বহন করিয়া আনে না! প্রশস্ত রাজপথ এখন ঘনবিন্যস্ত কণ্টকাকীর্ণ বেত্রবন—উল্কামুখী শিবার বিহার-ক্ষেত্র। সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ—এখন সুখসুপ্ত বিষধরের নিশ্বাসাগ্নি দীপিত, ভীষণ বন্যজন্তুর নিভৃত নিবাস! এখন সে ভগ্নাবশেষ দেখিলে মনে হয়—যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী! সুরসরিৎ সরস্বতী—নিজে মজিয়া সপ্তগ্রামকেও মজাইয়াছে!

কথাঞ্চিৎ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এখনও সপ্তগ্রামের গৌরবের কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সপ্তগ্রামে একদিন হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া এক রাজনৈতিক মহাজ্যোতিতে পরিণত হইয়াছিল।

সপ্তগ্রামের জঙ্গলের ভিতর আমরা কতকগুলি ভগ্নস্তূপ এবং একটী বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বিশাল শাল্মলী তরু দেখিয়াছি। বৃক্ষটী কণ্টকশূন্য—বোধ হয় যমরাজার আদেশে তদীয় অনুচরবর্গ—কত শত মহাপাপীর গাত্র এই তরুতে ঘর্ষণ করিয়া দিয়াছে—তাহাতেই তরু কলেবর মসৃণ হইয়াছে। এই শাল্মলী তরুটী সপ্তগ্রামের উত্থান ও পতন দুই-ই দর্শন করিয়াছে। ইহার মূলদেশে হিন্দুমুসলমানের কত বিস্ময় বিজড়িত বিলুপ্ত কাহিনী লুক্কায়িত রহিয়াছে!

সপ্তগ্রামের যখন সমৃদ্ধিশালী অবস্থা—তখন শ্রীকর দত্ত ব্যবসায় উপলক্ষে আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। প্রতিবাসী মণ্ডলীর রোগে সুশ্রূষা, স্বাস্থ্যে সান্ত্বনা, বিপদে প্রাণপাত করিয়া, শ্রীকর দত্ত সপ্তগ্রামে দেবতার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া রাজ-সরকারেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। পরোপকারী, সজ্জন, আশ্রিত প্রতিপালক, অনাথ-শরণ এবং ধার্ম্মিক-চূড়ামণি বলিয়া

সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। গৃহধর্ম্মে—তিনি মনোবৃত্তানুসারিণী মনোরমা ভার্য্যালাভ করিয়াছিলেন। দত্তবংশের সেই গৃহলক্ষ্মীর নাম—ভদ্রাবতী।

[২]

শ্রীকর দত্তের অর্থ ছিল, সুখ ছিল, যশঃ ছিল, সৌভাগ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজপ্রাসাদ তুল্য ভবন এক নিদারুণ শূন্যতা বক্ষে লইয়া দিবানিশি হাহাকার করিত। বংশধরের অভাবে দত্তদম্পতী বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। একজন সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই এক দেববালক শ্রীকর ও ভদ্রাবতীকে পিণ্ডলোপের আশঙ্কা ও ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। অচিরে স্বামী স্ত্রীর প্রেমসাধনার ফল ফলিল। ১৪০৩ শকে ভদ্রাবতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। শুভক্ষণে পিতামাতা শিশুর নাম রাখিলেন—"উদ্ধারণ।"

শ্রীকর দত্তের পরলোকপ্রাপ্তির পর—উদ্ধারণ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। পিতৃমাতৃ হৃদয়ের সমস্ত উৎকৃষ্ট উপাদান—উদ্ধারণের হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল। তিনি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। শত শত দীন দীনদরিদ্র তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত।

তখন হুসেন সা বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট। নবাব সরকারে উদ্ধারণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি এক বিশাল জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ জমীদারী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা কাটোয়ার সন্নিহিত—"উদ্ধারণ পুর" নামে বিখ্যাত।

[৩]

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তখন শান্তিপুরের নিত্যানন্দ ঠাকুর তাঁহার উত্তরসাধক হইয়া-

ছিলেন। বাঙ্গালায় তখন প্রেমের বান ডাকিয়াছিল। পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু, উচ্চ-নীচ, ধনী-দীন, পণ্ডিত-মূর্খ—সে প্রেমের বন্যায় সকলেই হাবুডুবু খাইয়াছিল।

সেই উদ্বেল প্রেমের বন্যা প্রবল উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া "নদে শান্তিপুর" পরিপ্লাবিত করিয়া সপ্তগ্রামেও ছুটিয়া আসিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর সেই শুভ মুহূর্ত্তে প্রেমভক্তির সাকার মূর্ত্তি—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পদরেখার সংস্পর্শে দত্তবাটী পবিত্র হইয়াছিল।

উদ্ধারণ দত্ত পরম ভক্ত ছিলেন। এইজন্য নিত্যানন্দ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। সপ্তগ্রামে আসিলে দত্তবাটীতেই তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইত। নিত্যানন্দের কৃপায় উদ্ধারণ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর শুভাগমন ঘটিলে দত্তগৃহে সমারোহের সীমা থাকিত না। ভক্তগণ একত্র হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। সে দিন সপ্তগ্রামে ভক্তির স্রোত বহিত, সমস্ত পল্লীতে এক বিরাট বিশাল আলোড়ন উপস্থিত হইত।

ক্রমে নিত্যানন্দের নিকট উদ্ধারণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। একনিষ্ঠতার গুণে তাঁহার প্রতি চৈতন্যচন্দ্রের অনুগ্রহ হইল। ভগবৎ কৃপায় উদ্ধারণের পবিত্র জীবনে অধ্যাত্ম ও পারমার্থিকতার প্রভাব দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, কীর্ত্তি, ধনগৌরব পদগৌরব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সম্পদের দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত থাকিলেও, তিনি সে সকল দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না। একমাত্র শ্রীমহাপ্রভুই মর্ত্ত্যধামের পরম সম্পদ, ইহা ভাবিয়া উদ্ধারণ অন্য সম্পদকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে চাহিলেন এই অনাসক্ত বিষয়ভোগী মহাপুরুষকে পাইয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

[৪]

শরতের পুণ্য আলোক দীপ্ত প্রভাতে একদা এক শঙ্খবণিক সপ্তগ্রামের রাজপথ দিয়া শঙ্খ বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। এমন সময় সে শুনিতে পাইল—কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে! শাঁখারী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—এক অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি পথ আলো করিয়া দণ্ডায়মানা। রবির কিরণ তাহার মল্লিকা-পুষ্প তুল্য শুভ্র বসনের উপর তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

শাঁখারী মুগ্ধের ন্যায় এই নারীমূর্ত্তির পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। তখন সেই চারুহাসিনী সুন্দরী আপনার মৃণাল করদুটী বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"বাছা! আমাকে এক জোড়া শাঁখা পরাইয়া দিবে কি?" শাঁখারী তাহার মাথার বোঝা নামাইয়া রমণীকে বলিল—"কোন্ জোড়া তোমার পছন্দ বাছিয়া লও মা!"

রমণী এক জোড়া শাঁখা দেখাইয়া দিলেন। শাঁখারী সেই শিরীষ-কুসুম সুকুমার কর প্রকোষ্ঠে শাঁখা পরাইয়া দিল। তারপর মূল্য চাহিল। রমণী বলিলেন—"আমার কাছে মূল্য নাই। তুমি ঐ বাড়ী যাও—তাঁকে গিয়া বল—আপনার কন্যা শাঁখা পরিয়াছে—তাহার মূল্য দিন। যদি তিনি তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা না দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও মাঝের ঘরের কুলুঙ্গীতে যে পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা আছে—আপনার কন্যা তাহাই আমাকে দিতে বলিয়াছে। তবুও যদি তিনি মূল্য না দেন,—তুমি ফিরিয়া আসিয়া এই স্থানে আমার নিকট মূল্য লইও। আমি এখন স্নান করিতে যাইতেছি।" রমণী চলিয়া গেল। সেই রাজহংসীর ন্যায় লীলায়িত পাদক্ষেপ দেখিতে দেখিতে শাঁখারীও দত্তগৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

[৫]

বাটীর দ্বারদেশে—স্নাতানুলিপ্ত তনু উদ্ধারণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

শাঁখারী তাঁহার সম্মুখে গিয়া সম্ভ্রমে মস্তক নত করিল; তারপর বলিল—"দত্ত মহাশয়! আপনার কন্যা পথের মাঝে একজোড়া শাঁখা কিনিয়াছেন, এবং আপনাকে তাহার মূল্য দিতে বলিয়াছেন। সেই জন্যই আমি আসিয়াছি।" দত্ত মহাশয় শঙ্খবণিকের কথায় অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কেননা তাঁহার পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না। তবে কে তাঁহার কন্যা পরিচয়ে শঙ্খবণিককে প্রতারণা করিল? তিনি শাঁখারীকে বারম্বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শাঁখারীও সমস্ত ঘটনা আমূল নিবেদন করিল। শেষে দত্ত মহাশয় বলিলেন—"যে মেয়েটী শাঁখা পরিয়াছে—তাহাকে দেখাইতে পার?" শাঁখারী স্বীকৃত হইল। শাঁখারীর কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য উদ্ধারণ মাঝের ঘরের কুলুঙ্গী অনুসন্ধান করিলেন, দেখিলেন—সত্যসত্যই সেখানে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। সেই পঞ্চমুদ্রা লইয়া উদ্ধারণ শাঁখারীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

অনন্তর উভয়ে—সরস্বতীর তীরে উপস্থিত হইলেন। শাঁখারী লজ্জায় পড়িল—পূর্ব্বদৃষ্টা বালা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সে সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল—কেহই রমণীর সন্ধান দিতে পারিল না। ভদ্রলোকের সম্মুখে মিথ্যাবাদী হইতে হইল ভাবিয়া শাঁখারী কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই—নীল সলিল রাশি আলোড়ন করিয়া নদীগর্ভ হইতে দুইখানি হস্ত উত্থিত হইল। উদ্ধারণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—সেই হাত দু'খানিতে শাঁখা পরান' রহিয়াছে। শাঁখারীর মুখে হর্ষের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। দত্তমহাশয় তাহাকে সেই পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলেন —"শঙ্খ বণিক! তুমি বড়ই ভাগ্যবান্, স্বয়ং জগজ্জননী আজ তোমার কাছে শাঁখা চাহিয়া পরিয়াছেন।"

[৫]

উদ্ধারণদত্ত সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে শুনিতে

পাওয়া যায়। তাঁহার "সংক্ষিপ্ত জীবনীতে" সে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

দত্তমহাশয় সুবর্ণ বণিক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দ উদ্ধারণ স্পৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পবিত্র জ্ঞানে ভোজন করিতেন। একদা নিত্যানন্দের সঙ্গে এক আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ উদ্ধারণের গৃহে অতিথি হ'ন। উদ্ধারণ নিত্যানন্দকে—ব্রাহ্মণের আহারের কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যানন্দ দত্তমহাশয়কে খিচুড়ী পাক করিতে বলেন।

ব্রাহ্মণ সরস্বতীতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—চুল্লীর উপর খেচরান্ন ফুটিতেছে, উদ্ধারণ—মাঝে মাঝে—কাটী দিয়া তাহা নাড়িতেছেন। বৈশ্য কুমারের স্পর্দ্ধা দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে রুষ্ট হইলেন—অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণের মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"কিহে দত্ত! যে হাঁড়ীর অন্ন ব্রাহ্মণে খাইবে, তুমি তাহা ছুঁইয়া ফেলিলে?" নিত্যানন্দের ইঙ্গিত বুঝিয়া উদ্ধারণ—সেই ভাতের কাঠি মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কাটী যে স্থানে পতিত হইল, সেই স্থানে সহসা একটী মাধবীলতার গাছ উৎপন্ন হইল। তখন, সেই ব্রাহ্মণ—উদ্ধারণের মহিমা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। উদ্ধারণের স্পৃষ্ট অন্ন—স্বর্গের অমৃত জ্ঞানে ব্রাহ্মণ মাথায় পাতিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণের ভাবান্তর দেখিয়া পারিপার্শ্বিক বৈষ্ণবগণ গাহিয়া উঠিলেন—

"গৌর প্রেমে জেতের বিচার নাই।
ডাক্‌ছে গোরা, আয়না তোরা—
সমাজ ছেড়ে, ভাই!
চণ্ডালকে করেন কো'লে আমাদের নিতাই!"

এই "মাধবী লতা"র বৃক্ষ, এখনো সপ্তগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তগণ ইহার মূলদেশ বেদীর মত করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

[৬]

এইরূপে উদ্ধারণের মহিমা সমগ্র বঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। উদ্ধারণকে দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে লোকে সপ্তগ্রামে ছুটিয়া আসিতে লাগিল তাঁহার কায়া দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস হইল—"উদ্ধারণ মানুষ নহেন ইনি বৃন্দাবনে—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ সখার মধ্যে এক সখা ছিলেন।"

উদ্ধারণ নিত্যানন্দের সঙ্গে বঙ্গদেশে গমন করিয়া—শান্তিময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তিনি কাহিতে বৈষ্ণ ছিলেন, এই প্রেমের ব্যাপারী সাজিয়া প্রেমের হাটে অনেক "বেচা কেনা" করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের অনেক ঘাটেই তাঁহার প্রেমের তরী ভিড়িয়াছিল।

নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণব সেবায় অর্পণ করিয়া উদ্ধারণ পরম ধন লাভের জন্য—নীলাচলে গমন করেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। ১৪৬০ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ৫৭ বৎসর বয়সে—বৃন্দাবন ধামে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব ঘটিয়াছিল। এখনো বংশীবটের কাছে—উহাঁর সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে। ভারতের কোটি কোটি নর নারী ঐ সমাধির পূজা করিয়া থাকে।

উদ্ধারণ চৈতন্য দেবের প্রকৃত সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানিতে পারা যায় না। ইনি অনেক বৈষ্ণব শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়নে ইহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কিন্তু ইহার স্বরচিত কোন পদাবলী এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

হুগলী খুঁটিয়া বাজার নিবাসী ৺বলরাম মল্লিক মহাশয়—শ্রীমদুদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য, বঙ্গের অতীত গৌরবের কেন্দ্র

গ্রামে একটী মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে—উক্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্ধারণের "মহোৎসব" মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত, নানা দিগ্‌দেশের ভক্তগণ আসিয়া উদ্ধারণ মন্দিরে সমবেত হইতেন। তখন মহা সঙ্কীর্ত্তনের "ধূলোটের" ধূলিপটল গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলরাম বাবুর অকাল মৃত্যুতে উৎসবের আনন্দস্রোতে যেন ভাটা পড়িয়াছে। এ বিষয়ে আমরা সুবর্ণ বণিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উদ্ধারণ সুবর্ণবণিক কুলোজ্জ্বলকারী মহাপুরুষ, এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার ভার—সুবর্ণবণিকদের এ কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান। দেবতা প্রতিষ্ঠার অক্ষয় পুণ্য লাভের জন্য সকলেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের অনতি দূরে—পুণ্যধাম সপ্তগ্রাম অবস্থিত। সপ্তগ্রামে দত্তঠাকুরের পবিত্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের সন্নিহিত "মাধবী মণ্ডপ" প্রত্যেক ভক্তেরই দর্শন যোগ্য।

উদ্ধারণের স্মৃতি সংরক্ষণের যিনি প্রধান উদ্যোগী—সেই স্বর্গীয় মহাত্মা বলরাম মল্লিকের বংশধরগণ [illegible] কীর্ত্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করুন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।
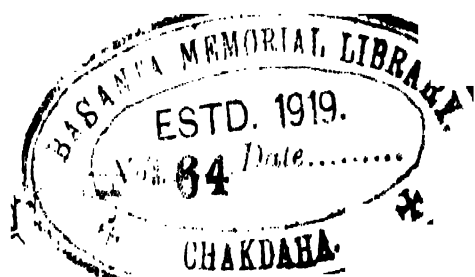
বাহির হইবে

জীবন-চিত্র সম্পাদকের বিরচিত

ক'নে-মা

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

যে সৎ-মা'র নাম শুনিলে বাঙ্গালীমাত্রেই শিহরিয়া উঠেন, যাঁহাদিগের রীতি নীতি, আচার-ব্যবহারের দোষগুণে, বঙ্গীয় সংসার স্বর্গের নন্দন-কানন বা মর্ত্তের বিভীষণ শ্মশানে পরিণত হয়, সেই সৎ-মা'র চিত্র ও চরিত্র লইয়া, বঙ্কু বাবু আপন অভিজ্ঞতার হৃদয়ের শোণিতধারা ঢালিয়া, "ক'নে-মা", লিখিতেছেন। গ্রন্থকারের রচনা সম্বন্ধে পাঠক সমীপে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

"জীবন-চিত্র" সম্পাদক প্রতিভাবান্ সুলেখক

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত

সচিত্র উপন্যাসাবলী

বঙ্গ সাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য ও সমাজ-চিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত, এ কথা আমাদিগের নিজস্ব নহে, দেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত সমাজ, হাকিম, মোক্তার, "বেঙ্গলী", "অমৃতবাজার", "হিন্দু পেট্রিয়ট", "হিতবাদী", "বসুমতী", "সময়" প্রভৃতি বিস্তর সংবাদপত্র সম্পাদকগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কি রচনা-নৈপুণ্যে, কি চরিত্র চিত্রে, কি ভাব-মাধুর্য্যে, কি ভাষার লালিত্যে বঙ্কুবাবুর উপন্যাস সর্ব্বতোভাবে নূতন ও চিত্তাকর্ষক। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকে সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি আছে।

কি কি পুস্তক বাহির হইয়াছে দেখুন!

কাকী-মা।

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

(৩য় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

এমন শিক্ষা দীক্ষাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রেমানুরাগোদ্দীপক উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, পিতা কন্যাকে পড়িতে দিন, সংসার সোণার হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পাঠিকার হৃদয়ও উন্নত হইবে। ম্যরে সাহেব, মিঃ টমসন, বড় ভাই গোপাল, ছোট গোবিন্দ, বড়বৌ মোহিনী, ছোট বৌ কমলা (কাকী-মা) ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শরচ্চন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টি অতি অপূর্ব্ব। ইহাতে ৫ খানি হাফটোন ছবি আছে। মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা ১৲ মাত্র, বোর্ডে বাঁধা ৸০ আনা।

সমালোচনা

(সারসংগ্রহ)

(স্থানাভাববশতঃ সকল অভিমত দেওয়া হইল না)

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" পত্রে বলেন ঃ—

"Kaki-ma"...is a story of one aspect of Bengali domestic life told with a good deal of ingenuity, delineating the triumph of virtue over vice. Babu Banku Behary Dhur, the young author knows the art of telling stories with grace and has acquitted himself well in the task. * * *

The Bengalee, 22nd September, 1907.

স্বনামখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা" বলেন ঃ—

"Kaki-ma"...A domestic novel by Babu Banku Behary Dhur, a young author of promise and reputation. The story is a powerful one, depicting virtue and vice in true colours. "Kaki-ma" is a novel which ought to find favour in the eyes of lovers of fiction.'

The Amrita Bazar Patrika, 8th October, 1907.

সুবিখ্যাত "হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক বলেন ঃ—

"Kaki-ma"...Written by Babu Banku Behary Dhur, * has been effectively told in a happy and charming style which does credit to the author. The language is chaste and easy, the plan natural and the characters have been very well drawn up and developed. * * *

The Hindu Parriot. 4th October 1907.

শিয়ালদহ কোর্টের প্রথিতযশা পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন ঃ—

One of the most unvarnished pictures of Hindu domestic life is presented in "Kaki-ma" * * *

The characters of "Gobinda," "Kamala," "Saratchandra" are ideal and deserve special mention. Other characters also are drawn from life and do great credit to the descriptive power of the author who evidently has the special gift of holding the mirror up to our domestic life. * * *

Sd. Chandi Das Ghose, M.A., B.L.

সুবিখ্যাত "ইণ্ডিয়ান মিরর" সম্পাদক বলেন ঃ—

"Kakirma "...is a domestic story written somewhat after "Swarnalata," It covers however a wider ground. "Swarnalata" is a painful suffering which a young man underwent with his wife and child in consequence of being made to live apart from his hen-pecked elder brother, "Kaki-ma" shows not only the evils of fraternal friction but also the advantages of the joint family system. The author has successfully shown that the moral law govern[illegible] world which it would be dangerous for one to disregard. * * *

Indian Mirror, Saturday 28th Jan., [illegible]

"বঙ্গভূমি" সম্পাদক বলেন ঃ—

* * * "কাকী-মা" ধৈর্য্য, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা বর্জ্জিত [illegible] নির্ম্মল দর্পণ, * * পড়িতে পড়িতে শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিবে, আবার হৃদয়ের [illegible] পরতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইবে।

বঙ্গভূমি, ১৪ই আশ্বিন, [illegible]৪।

"সময়" সম্পাদক বলেন ঃ—

সমালোচ্য "কাকী-মা" গ্রন্থ একখানি সামাজিক চিত্র। এই চিত্রটী সমাজের চক্ষে ধরিলে উপকারই হইবে। * * সমাজে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এই দুর্নীতির কি দোষ তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। * * * এরূপ গ্রন্থ সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে।

সময়, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

"বসুমতী" সম্পাদক বলেন ঃ—

"কাকী-মা"—* * * স্বর্ণলতা শ্রেণীর উপন্যাস—বঙ্গসাহিত্যে যত অধিক প্রচারিত হয়, সমাজের ততই মঙ্গল। আমরা এ পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

বসুমতী, ১৯শে পৌষ, ১৩১৪।

"হিতবাদী" সম্পাদক বলেন ঃ—

* * "কাকী মা"—গল্পটী ভাল, * * ছাপা ও কাগজ ভাল।

হিতবাদী, ২৪শে মাঘ, ১৩১৪।

"আশা" সম্পাদক বলেন ঃ—

"কাকী-মা"—তারকনাথের স্বর্ণলতার পর এরূপ গার্হস্থ্য জীবনের উপদেশ পূর্ণ পুস্তক এ দেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। * * ইহা পাঠে মহিলাগণের বিশেষ উপকার হইবে।

আশা, শ্রাবণ ও ভাদ্র, সংখ্যা, ১৩১৪।

হাওড়া জেলার মুখ পত্র "হাওড়া-হিতৈষী বলেন ঃ—

সমাজের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল সময়ে "কাকী-মা" অনেক উপকার সাধিবে। আমরা শুনিয়াছি একটি ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারে গ্রন্থবর্ণিত রূপ ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে এই পুস্তকখানি পড়িয়া ভাইয়েদের চক্ষু ফুটে, তাহারা বিরোধ মিটাইয়া দেন এবং পরস্পর পৃথক্ হইবার বাসনা ত্যাগ করেন। এই ঘটনাটিই "কাকী-মা" প্রণেতার শক্তি ও যোগ্যতা এবং তাঁহার গ্রন্থের সার্থকতা প্রমাণ করিতেছে।

হাওড়া হিতৈষী, ৪ঠা মাঘ, ১৩১৫।

ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে বলেন ঃ—

"এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র আদরণীয় আসন পাইবার যোগ্য। এখানি হিন্দুমাত্রেরই সুপাঠ্য উপন্যাস হইয়াছে ; বিশেষতঃ হিন্দু সংসারে অন্তঃপুরবাসিনী 'মা লক্ষ্মী'-দিগের হাতে যে এই বইখানি অতীব শোভন ও সুন্দর হইবে, তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বর্ণনা কৌশলে গ্রন্থকারের সমাজপ্রীতির আন্তরিকতাও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সংসারের নিখুঁত চিত্র প্রকটনে লেখকের বেশ হাত আছে।

সুবর্ণ-বণিক সমাজের একমাত্র মুখপত্র "সুবর্ণ-বণিক" সম্পাদক বলেন ঃ—

"গৌরী-দান" * শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত। গ্রন্থকার সামাজিক চিত্র অঙ্কণে সিদ্ধহস্ত। * * আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে প্রস্তুত যে, তাঁহার প্রয়াস ও উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, হিন্দু পরিবারের আদর্শ, হিন্দুর কর্ত্তব্য, হিন্দু মুসলমানের পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধন প্রভৃতি বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের ভাবুকতা ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। * *

সুবর্ণ-বণিক—৬ই ফাল্গুণ, ১৩১৭।

চুঁচুড়ার মুখপত্র "মহামায়া" সম্পাদক বলেন ঃ—

"গৌরী-দান" * * শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত—দেশের ও দশের প্রকৃত অবস্থার একখানি সুন্দর আলেখ্য, পরিবর্ত্তমান সংসারচক্রের স্বাভাবিক সজীব প্রতিমূর্ত্তি, ইদানীন্তন হিন্দু সমাজের নিখুঁত ফটো। * * নিত্য দৃষ্ট সহজ পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারের ঘটনার মধ্যে গ্রন্থকার পাঠকের জন্য এক পুরাতন অতীতের মধুর স্বপ্ন-জালে জড়িত সাধের নিকুঞ্জ প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। * * গৌরী-দানে নারীর নারীত্ব, বধূত্ব মাতৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রের একত্র সমাবেশে * * লেখক তাঁহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। * * * *

মহামায়া—২২শে চৈত্র, ১৩১৭।

ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক বলেন ঃ—

"PISHIMA" is a domestic novel from the pen of Babu Banku Behary Dhur, who has already achieved some distinction in the story telling line. As usual with the author, he has dealt with some social problems in the course of the story. One of these is the rather ticklish question of widow marriage. * *

"Pishima" after whom the novel is named is presented as an admirable examplar of the Hindu widow, whose selflessness and benevolent spirit endear her to all with whom she comes in contactur. Noni Gopal is a spended specimen of the educated youth of Bengal and Satcorie *alias* Kirtibash is philanthrophy personified. The Court scene is exceedingly touching, * * What strikes the reader most in persuing the book is the dramatic quickness with which the scenes of action change.

The chapters * * are so skilfully arranged as to keep the reader always on the alert. The style is simple and pleasant and calculated to keep up the interest of the reader from beginning to end.

Indian Mirror—8th Janv. 1913

সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় বলেন ঃ—

I have gone through * * "Pishima" with very great interest. It is a literary Bioscope through which one may look at a panorama of domestic life in present day Bengal. The films are large in number and varied in character and conneeted intimately as they are with one another. * * *.

The production is well suited for exhibition on the public stage.

Sd. Baikuntha Nath Bose.

সুবর্ণবণিক সম্পাদক বলেন ঃ—

* * আজকাল উপন্যাসের ছড়াছড়ি হইলেও খাঁটী স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস নাই বলিলেও হয়। বঙ্কুবাবুর উপন্যাসগুলি অসঙ্কোচে মাতৃরূপিণী গৃহলক্ষ্মী দিগের করকমলে অর্পন করা যাইতে পারে। "পিসী-মা'র আদর বহু বহু গৃহে হওয়া উচিত।

সুবর্ণবণিক, ২৩শে চৈত্র ১৩১৯ সাল।